সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

কারওয়ানে যিন্দেগী

(আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ)

[৫ম খণ্ড]

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দীন
কর্তৃক অনূদিত

(20) کاروانِ زندگی پنجم از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا محی الدین

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কারওয়ানে যিন্দেগী-৫ম খণ্ড
মুল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
মাওলানা মোঃ মহিউদ্দীন কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : 01822-806163, 01776-438110

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
যিলহাজ্ব, ১৪৩৭ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন
মাহফুজ কম্পিউটার

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৩২০.০০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91840-4-1

Karwaney Zindegee-5th Vol. : Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (Rh.) in Urdu and translated by Moulana Md. Mohiuddin, Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000. Cell : 01822-806163; 01776-438110 Price : Tk. 320.00- Only. U$: 8.00 Only.

উৎসর্গ

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে– যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

প্রকাশকের কথা

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিশ্বখ্যাত ও জননন্দিত এক মনীষী ও বরেণ্য ইসলামী দা'ঈ। মেধা ও মননের বহুমাত্রিকতা তাঁর আলোকিত জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী সাহিত্যিক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক ও সীরাত গবেষক হিসেবে গোটা দুনিয়ায় রয়েছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি। জীবদ্দশায় তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু এলাকা পরিভ্রমণ করেন। কেবল পর্যটন নয় বরং দাওয়াতী মেহনত, শিক্ষাবিষয়ক ও ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারে অংশগ্রহন ছিলো এসব সফরের উদ্দেশ্য। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণ ও জীবন অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র এক অমূল্য সম্পদ।

সাত খণ্ডে বিন্যস্ত কালোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটিতে রয়েছে নানা জাতি-গোষ্ঠির জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ এবং ইসলামী সভ্যতা ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের অনুপুঙ্খ ও আনন্দঘন পরিবেশনা। সর্বোপরি, বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উপস্থাপনার নৈপুন্যশৈলী পাঠককে বিস্মিত ও শেকড়সন্ধানী করে তোলে। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর প্রতিটি ছত্রে, প্রতি পাতায় লেখকের পাণ্ডিত্য ও সৃজন-সামর্থের অভিব্যক্তি লক্ষনীয়।

এ গ্রন্থটি বিশ্ববিশ্রুত আফ্রিকান পর্যটক ইব্‌ন বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮)-এর 'রিহ্‌লা' ও চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান (৩৩৭-৪২২) রচিত Memories of Eminent Monks-এর সমপর্যায়ের তো বটেই বরং নানা ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর আঙ্গিকে রচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রতিভাসিত করেছে। বাংলাদেশে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নদভী (রহ.)-এর খিলাফতপ্রাপ্ত প্রিয়ভাজন আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)-এর উদ্যোগ প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় তরজমা এটাই প্রথম। বেশ ক'জন বিজ্ঞ অনুবাদকের মাধ্যমে মার্জিত বাংলায় ভাষান্তর করে অনূদিত কপি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার শোকরিয়া আদায় করছি। হযরত নদভী রহ.-এর

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমাদের আয়াসাধ্যশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

অনেকের অনুরোধে বইটি দ্রুত প্রকাশের কারণে প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই প্রত্যাশা। আগামীতে আরো যত্নবান হয়ে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য, আপনাদের আন্তরিক সহোযোগিতা ও দোয়া প্রার্থী।

আমার বন্ধুবর অধ্যক্ষ অশোক তরু একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হযরত নদভী রহ.-এর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং উজ্জীবিত করেছে। জীবনের কঠিনতম সময়ে পাশে থেকে আমার বিশেষ অনুরোধে হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে সেগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে আমাকে কতৃজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল ও কামিয়াবি করুন। আমিন!

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী, ঢাকা

– মুহাম্মদ আবদুর রউফ

بسم الله الرحمن الرحيم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

Ref:

التاريخ: ۱۱ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے یہ معلوم کرکے بہت مسرت ہوئی کہ ڈھاکہ میں چند مخلص واہل علم حضرات نے دینی و اسلامی اور اصلاحی کتابوں کی تیاری اور اشاعت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے اس کے ذریعہ میری کتابیں بھی شائع ہوں گی، ان میں میری جن کتابوں کے ترجمہ کی ضرورت سمجھیں گے ترجمہ کرکے شائع کریں گے، ادارہ کا نام مجلس نشریات اسلام تجویز ہوا ہے، اور چاٹگام کے عالم دین مولانا سلطان ذوق صاحب ندوی اور ڈھاکہ کے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا سلمان صاحب اس ادارہ کے ذمہ دار ہیں، میں ان حضرات کو اجازت دیتا ہوں کہ میری جن کتابوں کو بہتر و مفید سمجھیں ترجمہ کرا سکتے ہیں اور شائع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے آمین

ابوالحسن علی ندوی
ندوۃ العلماء لکھنؤ

۱۱/۳/۱۴۱۸ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

أبو الحسن علي الحسني الندوي
ندوة العلماء - لكهنؤ - الهند

Ref:

التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤١٨هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি এ কথা জানতে পেরে অত্যাধিক আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকার কিছু মুখলেছ আহলে ইল্‌ম হযরত ধর্মীয় ও ইসলামী এবং সংশোধিত ও সংস্কারমূলক কিতাব ছাপানো ও প্রচারণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তার মাধ্যমে আমার রচিত কিতাবও প্রকাশ করবেন। তার মধ্যে আমার যে কিতাবগুলো অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করবেন, অনুবাদ করে তা প্রকাশ করবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' (Academy of Islamic Publications) স্থির হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সুলতান যওক নদভী সাহেব এবং ঢাকার মাওলানা ওমর আলী সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব ঐ সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমি ঐ হযরতদেরকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তাঁরা আমার যে কিতাব গুলো উপকারী মনে করবেন, সেগুলো তরজমা করে প্রকাশ করতে পারবেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের প্রচেষ্টায় বরকত দিন এবং মঙ্গল করুন। আমিন!

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
ভারত

১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ..... তারিখ.....

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী গ্রন্থের রচিয়তা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বাংলাদেশে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য একমাত্র 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে তাঁহার ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী তারিখের এক পত্র দ্বারা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' গ্রন্থগুলি প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স', ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে শর্তাধীনে অনুমতি প্রদান করায় 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও বাজারজাত করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত রূপ অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে গ্রন্থগুলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার অবৈধ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। কাজেই এই মর্মে সতর্ক করা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রচিত গ্রন্থগলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

সাধারণ সম্পাদক

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ..... তারিখ.....

সংশ্লিষ্ট মহলের জ্ঞাতার্থে

বিশ্বখ্যাত ইসলামী দাঈ, মণীষী ও আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বাংলাদেশ সফরের পূর্বেই তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাব 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এরপর অজ্ঞাত কারণে 'ইফাবা' কর্তৃপক্ষ তাঁর কিতাবগুলো প্রকাশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

হযরত আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর উদ্যোগে হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ও আমি মুহাম্মাদ সালমান 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করি । এ সংস্থার মাধ্যমে ৯০ দশকের শেষের দিকে হযরতের 'নবীয়ে রহমত', 'হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া', 'ইসলাম-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি' ও 'দাওয়াতের উপহার' নামক ৪টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলো বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর সম্পাদক ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্ত্বাধিকারী ও 'ঢাকা কলেজ'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর উপর হযরতের বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

একাডেমিক প্রকাশনা বাদ দিয়ে ২০০৬ সাল থেকে নিরলসভাবে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' সেই গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে এ যাবত প্রায় ৩৫টিরও অধিক বই বাংলাভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'নদওয়াতুল উলামা'-এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনী 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং সাত খণ্ডে রচিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনীমূলক আলেখ্য 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর দু'আ ও এজাযত লিখে দিতে পেরে নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পুস্তক প্রকাশ করে। এতে আখিরাতের নাজাত প্রাপ্তিই যে একমাত্র উদ্দেশ্য– তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা এটা জেনে আরো আনন্দিত যে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বইগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেবকে সভাপতি করে 'মানশুরিয়াত-ই-ইসলাম সোসাইটি' নামক ট্রাস্টের মাধ্যমে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' তার সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তি ইসলামী প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ- বিশেষ করে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের নিমিত্তে ওয়াক্‌ফ করে দেবেন। আই ইউ টি-এর সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ফজলে ইলাহী, বিচারপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও প্রফেসর ড. মোঃ নূর ইসলাম প্রমুখ উক্ত ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের অনুরোধে এ মহতী উদ্যোগের সাথী হতে পেরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করছি, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর এ নিঃস্বার্থ উদ্যোগ আল্লাহ্ কবুল করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাফেলা সুনামের সাথে এগিয়ে যাক। আমিন!

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'- এর পক্ষে

২৫.১২.১৫

(মুহাম্মাদ সালমান)

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chiep Editor: The Monthle Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية ببنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٢٥٨١٦٩٣-٠٣١-٨٨٠+ الفاكس والرقم الخاص: ٢٥٨١٦٨٧-٠٣١-٨٨٠+
جوال : ٣١٣٢٤٢-٠١٨١٩-٨٨٠+

التاريخ :

بنگلہ دیش میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتابوں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ مولانا کے سفر سے پہلے شروع ہوا، اس میں محب گرامی مرحوم پروفیسر محمد علی صاحب کی محنت اور مخلصانہ جدوجہد سب سے پیش پیش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن نے ترجمہ شروع کیا، لیکن مسلسل طباعت و ترجمہ کا کام جاری نہیں، اس پر مولانا نے افسوس کیا، پروفیسر محمد علی صاحب کے ساتھ وابستہ کر جناب پروفیسر عبد الرؤف صاحب (مالک محمدی لائبریری، بنگلہ بازار ڈھاکہ) نے بھی کافی کتابوں کا ترجمہ اور نشر کرایا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس دفعہ آپ نے کاروان زندگی (حضرت مولانا کی خود نوشت سوانح) کا ترجمہ کرا کے اشاعت کا کام شروع کیا، اس اہم کتاب کی سات جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کی حیات میں برکت عطا کرے، موصوف محترم ڈاکٹر اے ایف ایم خالد حسین کو لیکر کلمۂ دعائیہ کے لئے ڈھاکہ سے میرے گھر تک پہنچے، میں اس کے لئے شکر گزار ہوں،

محمد سلطان ذوق ندوی

[illegible]

٦/١١/١٥م

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthly Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٠٣١-٢٥٨١٦٩٣+٨٨ الفاكس والرقم الخاص: ٠٣١-٢٥٨١٦٨٧+٨٨
جوال : ٠١٨١٩-٣١٣٢٤٢+٨٨

التاريخ :

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দাঃ বাঃ)-এর অভিমত ও দু'আ

বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় তরজমা করার কাজ মাওলানার বাংলাদেশ সফরের আগেই শুরু হয়। এতে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ওমর আলীর মেহনত ও আন্তরিক প্রয়াস সবার আগে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন!

এরপর 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' অনুবাদের কাজ শুরু করে কিন্তু ধারাবাহিক মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে ছেদ পড়ে এবং তা বেশীদূর এগোয়নি। এ জন্য আল্লামা নদভী রহ.-এর আফসোস ছিলো। অধ্যাপক ওমর আলী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্ত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব হযরত মাওলানার বহু গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এটা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, এবারে তিনি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (হযরত মাওলানার আত্মজীবনী) অনুবাদ করিয়ে তা প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ সাত খণ্ডে বিন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তাওফিক দিন এবং হায়াতে বরকত দান করুন, আমিন! আমার স্নেহভাজন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে তিনি আমার বাসায় হাযির হন। এ জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

০৬.১১.২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

(মুহাম্মদ সুলতান যওক)

৬/১১/১৫ م

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন খান সাহেবের অভিমত ও দু'আ

বিগত শতাব্দীর বিশ্বসেরা প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন ও বরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বিশেষ আনন্দবোধ করছি। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' অর্থাৎ জীবনের কাফেলা নামক সাত খণ্ডে রচিত এ বইটি বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি দর্পণ বিশেষ। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি সঠিক চিত্রই আঁকেননি, একই সঙ্গে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় জীবনের একটি রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকব্যাপি হযরত আল্লামার কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো। পবিত্র মক্কাকেন্দ্রিক বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে অন্যূন দশ-বারোটি সম্মেলনে আমি হযরত আল্লামার সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়েছে।

সময়টা ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিশেষ সমস্যাসংকুল– ইরানের কথিত ইসলামী বিপ্লব এবং সউদী আরবসহ আরব বিশ্বের সাথে ইরানের বিপ্লবী কর্মকর্তাদের মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খুবই বিব্রতকর অবস্থা। এ সময় সঠিক পথের সন্ধানে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর প্রাজ্ঞ অভিমত ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়।

মাওলানা আলী মিয়া রহ. বিগত শতাব্দীর শেষ দিনটিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, আলী মিয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বিগত শতাব্দীর একজন বরণীয় মুজাদ্দেদ। তাই তাঁর জীবনসংগ্রামের বর্ণনার প্রতিটি ছত্রই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অনুকরণীয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' নামক গ্রন্থটি এই দিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অবশ্য পঠনীয় একটি মহাগ্রন্থ।

বাংলাভাষায় তাঁর সেই মহাগ্রন্থের অনুবাদ একটি নেয়ামত বিশেষ। আশা করি, বইটির সব কয়টি খণ্ড অনুবাদ করার তৌফিক আল্লাহ্‌পাক দান করবেন। আমিন!

মহীউদ্দিন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

তারিখঃ ২৪-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

مدرسة دار الرشاد ميربور ڈاکا بنغلاديش

মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ ডি-ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন ঃ ৮০১৩১৬৩, মোবা ঃ ০১৭১১-৯৭০৫৮৮, ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

Madrasah Darur Rashad
12/ D-E Mirpur, Pallabi, Dhaka-Bangladesh
Ph :8013163, Mob :01711-970588, 01552-356421

দারুর রাশাদ মাদরাসার মুহতামিম ও হযরত আলী নদভী রহ.-এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের দু'আ ও অভিমত

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করছি যে, আমার মুরশিদ ও পীর হযরত মাওলানা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আল্লামা সাইয়িদ আলী মিয়া নদভী রহ-এর জীবন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নির্দেশিকা উপস্থাপনের যে ধারা তিনি 'মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের মাধ্যমে সূচনা করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিলো তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ইব্নে বতুতার পরে মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন পরাশক্তিকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে হয়ত তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। জীবনের ধারা ও প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে মূলতঃ তিনি নিজের চিন্তা, দর্শন ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

তাঁর এই জীবনের কাফেলা দেশ ও মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ লালন, সংরক্ষণ ও বিস্তার জাতীয় কর্তব্য এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে তা পৌছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ আমাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করছি।

দু'আ করি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হোক এবং হযরতের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মুসলিম জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল উম্মাহ্র সংস্কার ও পুনর্জাগরণে কর্মসূচী গ্রহণ করুক। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের নেক মকছুদ কবুল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ সালমান
২৫.১২.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)

তারিখঃ ২৫-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

মুহতামিম, দারুর রাশাদ মাদরাসা

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এটি 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র ৫ম খণ্ড। আত্মজীবনীর ৪র্থ খণ্ডটিও লেখকের ক্ষমাপ্রার্থনার সাথে এবং কতিপয় বাধ্যবাধকতা; বরং বৈধ চাহিদা, দেশ ও সময়ের একাধিক ঘটনা, বাস্তবতা এবং সেসবের প্রতিক্রিয়াকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজনে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের দুঃসাহস দেখানো হয়েছে। এই খণ্ডটির ভূমিকায় লেখা হয়েছিল–

'ইতিহাসের বেশিরভাগ গ্রন্থই একটা ধরাবাঁধা নিয়মের অধীনে ঘটনাবলি লেখার ওপরই ক্ষান্ত করা হয়। এই হিসেবে সেগুলোকে 'গৎবাঁধা' ও 'পারিভাষিক' ইতিহাস বলা-ই বেশি সঙ্গত হবে। সেগুলোর অধ্যয়ন দ্বারা সেই যুগ ও পরিবেশের লোকদের হৃদয়ের স্পন্দন, মস্তিষ্কের দ্বিধা ও আত্মার কম্পন জানা সম্ভব হয় না। সেইসব সমস্যা, বিপদাপদ ও অনুভূতিশীল শঙ্কার ব্যাপারেও অবহিত হওয়া যায় না, যেগুলো সেই যুগ ও দেশের সচেতন ও বিবেকবান শ্রেণির ঘুমকে হারাম করে রেখেছিল এবং তাদের অনবরত অস্থিরতার মধ্যে ফেলে রেখেছিল। না তার কার্যবিবরণি পাওয়া যায় যে, সেই পরিস্থিতির তারা কীভাবে মোকাবেলা করেছেন এবং তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই গৎবাঁধা ইতিহাসগুলো শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও তৎকালের মানসিক, চারিত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিত্র অঙ্কনে অক্ষম। না সেগুলোর লেখকবৃন্দ তার দাবি করেছেন, না সেসবকে তাঁরা নিজেদের কর্তব্যের অংশ মনে করতেন।'

লেখক তারপর লিখেছেন–

'পুরনো যুগে হৃদয়ের এই স্পন্দন, মস্তিষ্কের এই দ্বিধা, আত্মার এই অস্থিরতার ও এই পরিস্থিতির মোকাবেলা কিংবা

প্রতিকারের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা হতো এবং কী প্রচেষ্টা চালানো হতো? এসবের যদি কিছুটা আন্দাজ হতে পারে, তা হলে তা এভাবে যে, সেকালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগুলোর সাথে বুযুর্গানে দীনের বাণীও পড়তে হবে, তাঁদের মজলিসগুলোর কথাবার্তা এবং তাদের চিন্তাচেতনা-দৃষ্টিভঙ্গিও জানতে হবে। যদি সেকালের কারও রোজনামচা কিংবা আত্মজীবনী পাওয়া যায়, তা-ও অধ্যয়ন করতে হবে। বুযুর্গানে দীন, সেই যুগ ও পরিবেশের অনুভূতিশীল, হৃদয়বান ও সাহসী চিন্তাবিদ ও লেখকদের পত্রাবলিরও ওপরও চোখ বোলাতে হবে। অনুরূপভাবে অনুভূতিশীল ও সত্যভাষী পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনিও পড়তে হবে, যেগুলোতে শুধু দর্শনীয় স্থানগুলোর ভ্রমণ আর নিজের মর্যাদা আর স্বাগত জানানোর বিবরণই থাকবে না; বরং সেই যুগ, দেশ ও নগরীর চিত্র এবং সেখানকার অধিবাসীদেরও চিত্রও ফুটে উঠতে হবে। এই সবকিছুর সম্মিলনেই কেবল সেই যুগ কিংবা পরিবেশের সঠিক ধারণা এবং তার চিত্র সামনে আসতে পারে, যেটি বিগত হয়ে গেছে এবং যেখানে জীবন তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, স্থিরতা, অস্থিরতা, পছন্দ-অপছন্দ, ঐক্য ও অনৈক্যের সাথে বিদ্যমান ছিল। এই সবগুলো বিষয় না বুঝে এবং তার সাথে সুবিচারমূলক আচরণ না দেখিয়ে কোনো যুগ কিংবা পরিবেশের ইতিহাস পরিপূর্ণ হতে পারে না।'

আর আমাদের এই যুগে এসবের সাথে এমন কিছু উপায়-উপকরণ যোগ করতে হবে, যেগুলো পুরনো যুগে ছিল না। সেগুলো হলো, পত্রপত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, জনসভা, ভাষণ-বক্তৃতা, ঘরোয়া আসর ইত্যাদি। কিন্তু প্রিয় পাঠকদের জানা আছে, জানার এই উপকরণগুলো বেশির ভাগ সময়ই নষ্ট হয়ে যায়।

এই বাস্তবতা ও প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র এই ৫ম খণ্ডটি লেখা এবং তার মাধ্যমে সেই সময়ের চিত্র উপস্থাপন করা বেশি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেটি ১৯৯০ সালের শেষ দুই মাস (নভেম্বর ও ডিসেম্বর) থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৩ সালে গিয়ে শেষ হচ্ছে। কারণ, এই

তিন বছরে ভারতে এবং ভারতে বাইরে এমনসব ঘটনা-দুর্ঘটনা, সমস্যা ও বিপদাপদের উদ্ভব হয়েছে, যেগুলো ইতিহাসে সংরক্ষিত থাকা একান্ত জরুরি। অন্যথায় আশঙ্কা ছিল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মই নয় শুধু; এই যুগ ও প্রজন্মের সদস্যবৃন্দ; বরং ঐতিহাসিক এবং লেখকশ্রেণিও এ-ব্যাপারে অনবহিত থাকবে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবনে, তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও স্বার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হবে। তাই সে-যুগের সঠিক চিত্র আঁকা (তার উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকগুলোর সাথে) আবশ্যক ছিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থনা ও লজ্জার সাথে বলতে চাই, এই কাজটি ইসলামি রাষ্ট্র, সভ্যতা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর ওপর তাতারিদের বর্বর হামলা, আরব দেশ ও পবিত্র স্থানগুলোর ওপর ক্রুশেডের নির্মম আক্রমণ; এমনকি ১৮৫৭ সালে ভারত উপমহাদেশের ওপর একটা বিদেশি ও বিধর্মী সম্প্রসারণবাদী শক্তির দখল এবং নির্মম ও প্রতিহিংসামূলক অভিযান, বংশ ও সংস্কৃতিবিধ্বংসী প্রচেষ্টাগুলোর সবাক; বরং কান্নাবিজড়িত রেকর্ড ইতিহাসের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না, যেগুলো তার পরে লেখা হয়েছে। এসব কারণেই আবশ্যক ছিল, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত এই তিন বছরের ইতিবৃত্ত এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর সঠিক চিত্র; বরং হৃদয়ের স্পন্দন ও অবস্থার চড়াই-উৎরাইগুলোও লিখিত আকারে সামনে চলে আসুক।

আমি এ-বিষয়ের ওপর একটি ইতিহাসগ্রন্থ লেখার মানসে 'কারওয়ানে যিন্দেগী' নামে নিজেরই জীবনচরিত লেখাকে প্রাধান্য দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছি–

'অনেক বিষয়বস্তু, ঘটনা, প্রতিষ্ঠান-আন্দোলন, ব্যক্তি-সংগঠন এমন যে, সেগুলোকে শুধু নিজের জীবনীতেই গ্রন্থিত করা যেতে পারে। যদি সেগুলোর উপর স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাত করা হয়, তা হলে প্রতিটির জন্য আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন। তদুপরি তার ইতিহাসসুলভ দায়িত্ব-কর্তব্য ও রচনাবিষয়ক রীতি-নীতি এমন, যা এমন অনেকগুলো বাস্তবতা ও সারকথা সামনে আসতে দেয় না, যা আত্মজীবনী ও নিজের লেখা জীবনচরিতে অনায়াসে আসতে পারে। এভাবে একজন

ব্যক্তির জীবনচরিত (যদি তিনি কল্পনার জগতে বাস না করেন এবং আল্লাহ তাকে পরিস্থিতি ও আশপাশ বুঝবার মতো অনুভূতি, তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ও অপরের সামনে উপস্থাপনের যোগ্যতা দান করেছেন) সে-যুগের সবাক প্রতিচ্ছবি হয়ে যায় এবং অনেক সময় তার দ্বারা একজন ঐতিহাসিক ও লেখক এমনসব কাজের কথা পেয়ে যান, যা গতানুগতিক ইতিহাস ও বর্ণাঢ্য জীবনীগুলোতে পাওয়া যায় না।'

এসব অজুহাত, স্বার্থ ও বৈধতার কারণসমূহ; বরং কর্তব্য পালনের নিমিত্ত বয়সের আধিক্য, স্বাস্থ্যের দুর্বলতা, নানান ব্যস্ততা ও একের-পর-এক সফরের প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র ৫ম খণ্ডটি লেখার দুঃসাহস দেখানো হয়েছে এবং তাকে পাঠক, লেখক, ঐতিহাসিক এবং দেশ, জাতি ও ধর্মের সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সামনে পেশ করছি এ-আশায় যে, এর মাধ্যমে হয়তো কিছু বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হবে, যেটি তাদের জন্য আপন-আপন কাজের ময়দানগুলোতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ
তাকিয়া কেলাঁ, রায়বেরেলি।
১৬. ৭. ১৪১৪ হিজরি
৩০. ১২. ১৯৯৩ ঈসায়ী

সূচিপত্র

সমাজ আমাদের অগ্নিগিরির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে /২৫
উপসাগরের যুদ্ধ ও সাদ্দাম হুসাইনের ভূমিকা /২৬
বাদশাহ ফাহ্‌দ ইবনে আবদুল আযীয-এর নামে
একটি নিষ্ঠাপূর্ণ চিঠি ও দাওয়াতি পত্র /৩১
বাদশাহ ফাহ্‌দ-এর নামে আমার পত্র /৩২
বাদশাহ ফাহ্‌দ-এর উত্তর ও আমার নামে তাঁর পত্র /৩৯
একটা গুরুতর দুর্ঘটনা /৪০
রাজিব গান্ধী হত্যার ঘটনা /৪২
উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ ও
কতগুলো দুর্বলতা, যেগুলো দূর করা জরুরি /৪২
নরসীমা রাও ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী /৪৬
রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ও তুর্কিস্তানে পরিবর্তনের আভাস /৫৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেস্টার-এর একটি ভাষণ /৫৬
আল্লাহর এক অলীর মৃত্যু /৫৭
ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা স্যাকুলারিজমের ওপরই
অটুট থাকতে পারে /৫৭
চার খলিফার ক্রমবিন্যাসে আল্লাহর হেকমত ও কুদরতের
বহিঃপ্রকাশ এবং হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর
পদক্ষেপে উম্মতের জন্য নির্দেশনা /৫৮
রাবেতা আদবে ইসলামীর সম্মেলন ভুপালে /৫৯
জামেয়া সালাফিয়া বেনারসের সীরাত কনফারেন্স /৬১
অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর দিল্লি সম্মেলন /৬২
কর্নাটক সফর ও পয়ামে ইনসানিয়াতের দুটি সম্মেলন /৬২
১৯৯২ সালের আগমন /৬৩
মুরাদাবাদের ধর্মীয় শিক্ষা কনফারেন্স /৬৪
মসজিদে আকসার নির্বাসিত ইমামের দারুল উলূম আগমন /৬৪
সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিছ মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমির মৃত্যু /৬৫
বিহার ও নেপাল সফর /৬৬
মাওলানা মুহাম্মাদ শামীম মক্কির মৃত্যু /৬৭
নবাব উবায়দুর রহমান খান শেরওয়ানির মৃত্যু /৬৮
একটি সম্মাননা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ /৬৮
এত্তেহাদে মিল্লাত কনফারেন্স বোম্বাইয়ে অংশগ্রহণ /৬৯

ইউপিতে বিজেপি ক্ষমতার আসনে /৭১
ইংল্যান্ড সফর, সেখানকার নানা ব্যস্ততা ও ভাষণ-বক্তৃতা /৭৭
মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য ও তার বৈপ্লবিক প্রভাব /৭৮
'ইসলামিক সেন্টার লন্ডন'-এ ভাষণ /৮৭
অনৈসলামিক সভ্যতা ও শাসনের কেন্দ্রগুলোতে
অবস্থানকারী মুসলমানদের দায়িত্ব /৮৬
জিয়াউর রহমান আনসারি সাহেবের মৃত্যু /৯৪
হাকীম আবদুল কাবী দরিয়াবাদির মৃত্যু /৯৪
রায়বেরেলিতে ইসলামি দাওয়াত ও চিন্তাবিষয়ক কনফারেন্স /৯৫
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় রাবেতা আদবে ইসলামীর
অষ্টম দোরোজা কনফারেন্স /৯৬
রামজন্মভূমি বিবাদের সংকটকাল /৯৭
আমার নামে নরসীমা রাওজির পত্র ও তার উত্তর /৯৮
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ /১০৩
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ /১০৪
একটা ভিত্তিহীন খবর ও অপবাদ আরোপ /১০৫
বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ভারতীয় ইতিহাসের
একটা সর্ববৃহৎ দুর্ঘটনা /১০৫
কেন্দ্রের একটি সম্পূরক পদক্ষেপ এবং বিজেপির
চারটি সরকারের পদচ্যুতি /১০৮
বোম্বাই, সুরাট ও মহারাষ্ট্রের ভয়াবহ দাঙ্গা এবং
জীবন ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি /১০৯
ক্রমবর্ধমান ঝড়ের বিরুদ্ধে জনসভা এবং আমার ভাষণ-বক্তৃতা /১১০
দেশ ও সমাজের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি নিপীড়ন ও হিংস্রতা /১১১
স্বাধীনতার সঠিক মর্ম ও উপকারিতা /১৩১
দিল্লি সফর, প্রধানমন্ত্রীর সাথে একাধিক সাক্ষাৎ এবং
পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যকরি পরিষদের বৈঠক /১৩৮
বোম্বাইয়ের ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ /১৪০
চন্দ্র শেখরের সত্যকথন /১৪২
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বোর্ডপ্রতিনিধিদলের পুনর্বার সাক্ষাৎ ও
স্মারকলিপি প্রদান /১৪২
আরেফ মুহাম্মাদ খান সাহেবের একটি বক্তব্য ও তার খণ্ডন /১৪৩
ল বোর্ডের কর্মনীতি প্রসঙ্গে /১৪৪
অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং
এবং একটি জরুরি পদক্ষেপ /১৪৫
কয়েকটা মৃত্যুর ঘটনা /১৪৭

কয়েকটি চয়ন ও ভাষণ /১৪৯
একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবেলা /১৪৯
জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষা /১৫৪
কংগ্রেসের সাধারণ সভা এবং তার মুলতবি হওয়া /১৬০
বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা /১৬১
পাটনা সফর ও পয়ামে ইনসানিয়াতের অসাধারণ সমাবেশ /১৭২
শাবাবুল ইসলামের সমাবেশে /১৭৩
পয়ামে ইনসানিয়াতের অসাধারণ ও ঐতিহাসিক সম্মেলন /১৭৪
আমার ভাষণ /১৭৬
পাটনার অপরাপর ব্যস্ততাসমূহ /১৮১
লাখনৌর মাওলানা আবদুশ শাকুর হলে শোহাদায়ে ইসলামের স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ /১৮৪
কয়েকটা তিক্ত বাস্তবতা ও উদ্বেগজনক ঘটনা /১৮৬
'মৌলবাদী' ও 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্বজনীন অভিযান /১৮৬
মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও চরিত্রনাশের অভিযান এবং ইসলামি শরীয়ার প্রতি অনাস্থা ও চিন্তাগত অস্থিরতার আন্দোলন /১৮৯
জীবনের দীর্ঘমত সফর /১৯২
দিল্লি থেকে ইস্তাম্বুল /১৯৬
ইস্তাম্বুলে /১৯৭
সাধারণ পরিষদের প্রথম বৈঠক /১৯৮
পাঁচ দিন লন্ডনে /২০৫
শিকাগোতে /২০৭
নিউইয়র্কে /২১১
পবিত্র হেজাযে /২১৩
আমার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একটি নির্ভুল ব্যাখ্যান /২১৮
রাজস্থানের জেপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলন /২২১
টুঙ্ক সফর /২৪০
একটা ফেতনা ও তার জবাব /২৪৩
সমরকন্দ ও বোখারা সফর /২৪৫
তাশকন্দে /২৪৮
বেশ কটি ঐতিহাসিক পরিদর্শন /৩৫১
উজবেকিস্তানের ওপর এক নজর /২৫৬
লাতুরের ভূমিকম্প২৫৫
লাখনৌয়ে অনুষ্ঠিত 'সর্বভারতীয় ধর্মীয় শিক্ষা কনভেনশন'২৫৭

নির্বাচন ও তার ফলাফল /২৬১
বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার জন্য দায়ীদের ব্যাপারে কয়েকজন আইনবিদের একটি সাক্ষ্য ও বিবৃতি /২৬৫
একটা গুরুতর বেদনাদায়ক ঘটনা /২৬৭
একটা কষ্টদায়ক বাস্তবতা ও তার নিরসনে সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা /২৬৯

কারওয়ানে যিন্দেগী

৫ম খণ্ড

সমাজ আমাদের অগ্নিগিরির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে

১৯৯০ সালের শেষ আর ১৯৯১ সালের আসি-আসি অবস্থা। কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, মাথার ওপর ঘূর্ণমান বিপদের ঘনঘটা ও অধঃপতনের লক্ষণগুলোতে পরিবর্তনের কোনো আভাস পাওয়া গেল না। কারণ, এই বিশাল দেশটিতে (যে কিনা অতীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল) পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তার সবচেয়ে বড় কারণটি ছিল, দেশ ও দশের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে বাঁচানোর কোনো চিন্তার অনুপস্থিতি। নিজের এতসব ইল্‌মি ও দীনি ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমি এই পরিস্থিতির বাস্তবানুগ পর্যালোচনা এবং দেশের বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ ও দায়িত্বশীলদের সতর্কীকরণ ও দৃষ্টি আকর্ষণের দায়বোধ থেকে আপন চিন্তাচেতনাকে বিমুখ রাখতে পারিনি।

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সশরীরে উক্ত সম্মেলনে যোগ দিতে পারিনি। তবে একটি নিবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যেটি স্নেহাস্পদ ডক্টর মুহাম্মাদ ইউনুস নিগরামি (চেয়ারম্যান উরদু একাডেমি লাখনৌ) সম্মেলনে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'আমাদের সমাজ অগ্নিগিরির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে'। আমি তার চারটি মৌলিক কারণ বর্ণনা করেছি এবং বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো দূর করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে।

১. গোষ্ঠিগত বিরোধ।

২. অন্যায়-অবিচার ও হানাহানি।

৩. অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মাঝে ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো লোকের অভাব। বিশেষ করে এ-ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের মাঠে না নামা এবং পরিস্থিতির মোকাবেলা না করা।

৪. যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা গ্রহণের প্রচেষ্টা এবং তার জন্য নীতি-নৈতিকতা, সততা ও আইনের তোয়াক্কা না করার মানসিকতা। সর্বোপরি সরকার গঠনের জন্য এমন একটি নির্বাচনব্যবস্থা, যেখানে যেকোনো নীতি-নৈতিকতাকে পেছনে ফেলে এবং দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

অবশেষে বলেছি, আমি কোনো প্রকার ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়াই বলছি, আমি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ছাত্র এবং সামান্য একজন লেখক। কিন্তু আমার জানা নেই, ভারতীয় সমাজ অতীতে কোনোদিন এমন সংকট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যেমনটা বর্তমানে (৩০-৩৫ বছরের মধ্যে) হয়েছে। বর্তমানে এই দেশটি মূল যে-সমস্যার শিকার, তা এক উরদু কবির এই কবিতা অনুসারে (যেটি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ খুব পছন্দ করতেন) এই–

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے

'আমার ভয় হলো, জীবন্ত হৃদয়টা যাবার না মরে যায়। কারণ, জীবন মানেই তোমার বেঁচে থাকা।'

উপসাগরের যুদ্ধ ও সাদ্দাম হুসাইনের ভূমিকা

আপন দেশ ও মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতি এভাবেই চলছিল, যার চিত্র ও সে-বিষয়ে আমার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো আমি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' ৪র্থ খণ্ডে উপস্থাপন করেছি। নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাগত অধঃপতন এবং নানা সংকট ও সমস্যা নিয়েই ভারতের ইসলামি জনগোষ্ঠীর গুটিকতক লোক মঞ্চ, দীনি ও ইসলাহি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এখনও মানবতার মর্যাদা, জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আহ্বান জানিয়ে আসছিল এবং অবিচার ও সংঘাত-হানাহানির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে ইসলামি দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে নয়– খোদ সেই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত আরব বিশ্বে (যেখান থেকে বিশ্ব কয়েকশো বছর পর এমন স্পষ্ট ও শক্তিশালী পন্থায় মানবতার মর্যাদা, সুবিচার ও সাম্যের বার্তা লাভ করেছিল, যা কিনা বিশ্বের ইতিহাসকে একটি নতুন মোড় ও মানবীয় বংশধারাকে একটি নতুন যুগ দান করেছিল) এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল, যা হিন্দুস্তানে ইসলামি জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিগুলোকে অবনমিত

করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুখগুলোকেও বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা সেদিন কথা বলার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ঘটনাটা হলো ১৯৯১ সালের ২রা আগস্ট ইরাকের (যে কিনা শুধু একটি আরব ও মুসলিম দেশই নয়– বরং ইসলামি খেলাফত, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এবং আধ্যাত্মিকতা ও উন্নত চরিত্রের গর্বের ধন পীর-মাশায়েখদের জন্মভূমি ও সমাধির মর্যাদায় ভূষিত) কুয়েত দখলের ঘটনা। সেদিন কুয়েতের সঙ্গে ইরাক ঠিক সেরূপ আচরণ করেছিল, যেমনটা করে শক্তিশালী কোনো বিজেতা ও লুটেরা দেশ এমন কোনো দেশের ওপর, যার ও তার মাঝে ধর্ম, ভাষা, সভ্যতা ও হৃদ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। সেইসঙ্গে এই আশঙ্কাও দানা বেঁধেছিল এবং কিছু-কিছু লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল যে, ইরাক পবিত্র হেজাযের দিকেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে এবং সৌদি সরকারের সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে।

এই শঙ্কা ও তার ফলাফলের ভয়াবহতা বিশেষ করে সেইসব অভিজ্ঞ ও সচেতন দীনি মহল অনুভব করেছিল, যারা আরব বিশ্বে জন্ম নেওয়া বিগত দিনের আন্দোলনগুলো, বিশেষ করে আরব জাতীয়তার (যা 'আল-বা'ছুল আরাবী' নামে পরিচিত) আন্দোলনের ইতিহাস, তার পেক্ষাপট, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তার উৎস সম্পর্কে অবহিত ছিল[১]। তারা আশঙ্কা অনুভব করছিলেন, (যা কিনা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং খ্রিস্টান নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবীদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট) এই পদক্ষেপ যদি সফল হয় এবং অব্যাহত থাকে, এই অভিযান ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও তার দাওয়াতের উৎস আরব দেশগুলোই নয়; বরং পবিত্র হেজায ও জাযীরাতুল আরবকে আরবের সেই জাহেলিয়াতের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করবে, যেখানে কুফর ও ঈমান, তাওহীদ ও বহুত্ববাদ এবং দীনে হানীফ (ইসলাম) ও খ্রিস্টবাদ-ইহুদিবাদের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আর এটাও অস্বাভাবিক হবে না যে, এই সাফল্যের পর তারা আরব জাহেলিয়াতের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও হিরোদের সামনে নিয়ে আসবে এবং তাদের নিয়ে গর্ব করার শিক্ষা দেবে। বিষয়টা এতদূরও গড়াতে পারে যে, মুসলমানদের হজ করার স্বাধীনতাও হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে এবং আল্লাহ না করুন, শুধু মিনা-আরাফাতই নয়; বরং খোদ পবিত্র মক্কায় আরবের প্রাচীন ইতিহাস ও জাহেলি যুগের মুছেযাওয়া

---

১. *বিস্তারিত জানতে লেখকের 'আরব কাওমপোরস্তী ইসলামী নুকতায়ে নযর সে খতরনাক কেউঁ?' গ্রন্থটি পড়ুন।*

স্মৃতিগুলোকে তারা সামনে নিয়ে আসবে। আর এমন ধারণা করা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল। কারণ, ইরাকের বাগদাদে সাদ্দাম হুসাইনের বিপুলসংখ্যক প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল এবং কুয়েতেও কোথাও-কোথাও এমনটা দেখা গেছে। কুয়েত থেকে আসা অনেকে বলেছে, ওখানে মসজিদগুলোর অবমাননা হয়েছে এবং নানারকম বাড়াবাড়ি ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। কাজেই এই অভিযানে সফল হলে সাদ্দাম হুসাইন পবিত্র মক্কা ও তার আশপাশে নিজের প্রতিকৃতি স্থাপন করে দেশটিকে জাহিলি যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেত এটাই স্বাভাবিক ছিল।

এ-ক্ষেত্রে আমি পাক্ষিক 'তা'মীরে হায়াত'-এ আমার বিস্তারিত মতামত তুলে ধরেছি। এখানে আমি তার কয়েকটি শিরোনাম তুলে ধরলাম। এর দ্বারা পাঠক বুঝতে পারবেন বিষয়টি কতখানি স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ ছিল এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিরোধিতার কারণ ও যৌক্তিকতা কী ছিল।

'জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবীরা'

'আরব জাতীয়তার আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যের খ্রিস্টানদের গভীর ষড়যন্ত্র'

'আরব জাতীয়তার বিরোধিতার মূল কারণ'

অতীতে ইসলামের সঙ্গে আরবের সম্পর্ক বিনষ্টের প্রচেষ্টাগুলোর ব্যর্থতা আরব জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা'

একটি নিবন্ধের নাম ছিল 'আরব মুহাম্মাদ থেকে আরব বিশ্ব' এই নিবন্ধটি আমি আল্লামা ইকবালের বাস্তবসম্মত ও ঈমান-আলোকিত দুটি চরণ দ্বারা শুরু করেছিলাম।

یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا اس امت کو وصال مصطفوی افتراق بولہبی

نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی

'এই জাতিকে আগেই রহস্য শেখানো হয়েছে, মুহাম্মাদ মুস্তাফার মিলন লাভ করো আর আবুলাহাবি চরিত্রকে পরিত্যাগ করো। এই জাতির অস্তিত্ব সীমান্ত-সীমানা দ্বারা অর্জিত হয়নি। আরব বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটেছে আরব মুহাম্মাদ থেকে।'

সে-সময়ে যখন ইরাকের কুয়েত আক্রমণ ও কুয়েত লুণ্ঠনের প্রতিবাদে ভারতের সেই দীনি অঙ্গনের পক্ষ থেকে সোচ্চার আওয়াজ তোলা হচ্ছিল, যার আরব বিশ্বের নানা আন্দোলন, গতিবিধি ও সমস্যাবলির সরাসরি অধ্যয়ন

ছিল এবং যার ওখানে বারবার ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছিল। লাখনৌতে 'মুসলিম ইন্‌টিলেকটিউয়্যাল্ ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল।

উক্ত সম্মেলনে আমি স্পষ্ট ভাষায় আমার মতামত ব্যক্ত করেছি এবং খোলাখুলিভাবে ইরাকের কুয়েত আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছি। আমি বলেছি, সাদ্দাম হুসাইনের কুয়েত আক্রমণের এই পদক্ষেপ সবচেয়ে বড় যে-ক্ষতিটা করেছে, তা হলো, সে ইসলামের আদর্শিক সুনাম ও মানবীয় আহ্বানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে, যার প্রতিকার কয়েকশো বছরেও সম্ভব হবে না। তার এই আচরণে মুসলমানদের মাথা লজ্জায় ঝুঁকে গেছে। এখন কোন মুখে তারা বিজাতিদের সমালোচনা করবে, যেখানে একই ধর্মের দাবিদার, একই ভাষাভাষী ও একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করেছে দেশটি দখল করে নিয়েছে, যেটি আয়তনে তার চেয়ে অনেক ছোট এবং ইতিহাসে যার বয়স একেবারে কম ও অখ্যাত। আমি আরও বলেছি, আমাদের এই উপমহাদেশের (ভারত ও পাকিস্তান) বড় একটা দুর্বলতা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার কথা বলে, তা হলে সে হিরো হয়ে যায় এবং তার বিগত দিনকার অন্যায়-অপকর্মের রেকর্ড মুছে দেওয়া হয়। আমাদের স্বভাব হলো, অন্যের বিরুদ্ধে উচ্চারিত বক্তব্যে যদি হুমকি বা যুদ্ধের ঘোষণা থাকে, তাহলে তা শুনে মুসলমান দেওয়ানা হয়ে যায়।[১]

আমি বলেছি, এই আক্রমণে সবচেয়ে বড় যে-ক্ষতিটা হয়েছে, তা হলো, এর ফলে ইসলামের দাওয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর একজন দাঈ হিসেবে এখন কঠিন হয়ে পড়েছে যে, সাহসিকতা ও দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে কাউকে বলব, কারও জীবন হরণ করা যাবে না, কারও ভূমি কিংবা সম্পদ দখল করা যাবে না।

জাযীরাতুল আরব হারামে আকবরও[২] এবং তার বিশেষ একটি মর্যাদাও আছে বটে। বড়ই লজ্জার কথা যে, ওখানে মিসাইলও নিক্ষেপ করা হয়েছে।

---

১. সাদ্দাম হুসাইন কারণে-অকারণে আমেরিকার ব্যাপারে অনেক সময় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আমেরিকার শত্রুতামূলক আচরণ এবং ইসরাইলের সমর্থন-সহযোগিতা ও তার ছত্রছায়ার ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী ষড়যন্ত্র মিশনে তার সম্পৃক্ততার প্রশ্নে আমেরিকার জন্য আমার মন ও মস্তিষ্কে কোনো কোমল জায়গা কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা নির্দোষ প্রমাণিত করার সামান্যতম অবকাশও নেই। এ-ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একদম পরিষ্কার ও আপসহীন। আমেরিকা সে-সময়ে (কমুনিজমের পতন ও রুশবিপ্লবের পর) মুসলিম বিশ্ব ও তার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে সবচেয়ে বেশি হুমকি মনে করত এবং সব জায়গার সৎ ও ভালো-ভালো নেতৃত্বকে ব্যর্থ করে দিত।

২. মানে ইজ্জত ও সম্মানের জায়গা এবং যেখানে ইসলামের শাসন, সমুন্নতি ও মুসলমানদের শান্তিময় বসতি ও উপাসনালয় আছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় বিপদডংকা বাজানো হয়েছে। ইরাক সেই দেশ, যেখানে ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতো ফকীহ ও মুজতাহিদ, শায়খ আবদুল কাদের জিলানি, মা'রূফ কারখি, বিশর হাফী ও জুনায়েদ বাগদাদির মতো আলেম ও অলীগণ ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন এবং আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগতকে আলোকিত করেছেন।

অনুমিত হচ্ছে, ক্রুশেডীয় খ্রিস্টান ও বিশ্বায়নবাদী ইহুদিরা বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের রণকৌশল বদলে ফেলেছে। তারা জাযীরাতুল আরব ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর ওপর সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও সামরিক শক্তি তাকে পদানত করার পরিবর্তে কৌশল গ্রহণ করেছে যে, তারা আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীদের, বিশেষ করে 'আল-বা'ছুল আরাবী'র[১] নেতাদের দ্বারা একাজ আঞ্জাম দেবে এবং তাদের জন্য হিরো হওয়ার ও আরব মুসলমানদের, বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যত আস্থা-ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার উপাদান ও পরিবেশ তৈরি করে দেবে, যার দ্বারা তারা ইসলামের এই কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করে, প্রভাব তৈরি করে আরবদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মহীনতা, জাহিলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম করবে এবং ধর্ম, বিশ্বাস ও কর্মে দুর্বলতা ও সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে এবং কুফর ও জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা-লজ্জা অনুভব করার মানসিকতা দূর করে দেবে; বরং জাহিলি যুগকে গৌরবময় যুগ ভাবতে শুরু করবে।

এই পরিকল্পনাটি খুবই স্পর্শকাতর, গোপন ও গভীর। একে বুঝতে হলে ইসলামি বিশ্ব ও আরব বিশ্বের বিগত দিনকার আন্দোলনগুলো, প্রচেষ্টাসমূহ ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং আরবি ভাষায় প্রকাশমান আধুনিক লিটারেচারগুলোর ওপর চোখ রাখা জরুরি, যার উপাদান (বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে) খুবই কম। আমাদের দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো একে অত গুরুত্ব দেয়নি।

---

১. *আল-বা'ছ পার্টির বড় মাপের একজন নেতা হলেন সিরিয়ার খ্রিস্টান নেতা মিশাইল গাফলাক। ১৯৫১-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দামেশক অবস্থানকালে আমি তার পরিচয় লাভ করেছি এবং তার চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমার কাছে প্রমাণিত, সাদ্দাম হুসাইন 'আল-বা'ছুল আরাবি'র সমর্থক-অনুসারী-ই নন-তার মুখপাত্র এবং নেতাও।*

বাদশাহ্ ফাহ্দ ইবনে আবদুল আযীয-এর নামে একটি নিষ্ঠাপূর্ণ চিঠি ও দাওয়াতি পত্র

দীনের একজন দাঈ, একজন নিঃস্বার্থ কর্মী, চিন্তাশীল ও দরদী মানুষের (যার ফলে শুধু সত্যের প্রচার, মুসলমানদের কল্যাণসাধন, ইসলামি শিক্ষা এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনের স্পৃহা এবং كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ (তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে আল্লাহর স্বাক্ষীস্বরূপ[১]) আল্লাহপাকের এই নির্দেশের ওপর আমল করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।) পক্ষে এমন কর্মনীতি অবলম্বন করার কোনোই সুযোগ নেই, যেখানে কোনো একজন ব্যক্তিত্ব কিংবা একটি সমাজ বা দেশই কেবল আলোচনা ও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং দাওয়াত কেবলই একমুখী হয়ে যাবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইরাকের কর্মনীতি, সাদ্দাম হুসাইনের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও ছোট একটি আরব রাষ্ট্রের (কুয়েত) ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এবং প্রতিবাদ-সমালোচনার পাশাপাশি (যেটি আমার ব্যক্তিগত পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ-সময়কার একটি দীনি কর্তব্য বলে মনে হচ্ছিল) আমি প্রয়োজন বোধ করলাম, সৌদি আরবের রাষ্ট্রপ্রধানকে (মহান আল্লাহ যাঁকে মক্কা-মদীনার অভিভাকত্ব ও সেবা-সুরক্ষার সুযোগদানে ধন্য করেছেন এবং ইসলামি আদর্শ-চরিত্র ও শাসনব্যবস্থার নমুনা উপস্থাপনের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করেছেন) নিঃস্বার্থভাবে একটি নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতি পত্র পাঠাব, যাতে তাঁকে সময়ের নাজুকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, ইখলাস, আল্লাহমুখিতা, রাষ্ট্র ও সমাজকে যথাসাধ্য একটি আদর্শ ইসলামি সমাজে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি এবং সেসব দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো দূর করার প্রচেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, যেগুলো আল্লাহ সাহায্যের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সর্বোপরি আল্লাহর সঙ্গে নিজের ও এই দেশটির (আল্লাহ তাঁকে যার দায়িত্বশীল বানিয়েছেন) লেনদেন পরিষ্কার করার কথা স্মরণ করিয়ে দেব এবং এ-ক্ষেত্রে খলীফায়ে রাশেদ সাইয়িদুনা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নমুনাগুলো আমি তাঁর সামনে উপস্থাপন করব।

---

১. *সূরা নিসা : ১৩৫*

আমি মহামান্য বাদশাহর পদমর্যাদা ও তাঁর অনেকগুলো গুণের কথা মাথায় রেখে তাঁর নামে পত্র লিখলাম এবং পত্রখানা বিশেষভাবে তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলাম। তিনি আমার পত্রখানা গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করলেন এবং নিজের স্বাক্ষরসহ অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় এবং বাস্তবানুগ ধারায় উত্তরপত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সৌদি দূতাবাস বিশেষ গুরুত্বসহকারে বাদশাহ ফাহ্দের এই উত্তরপত্র আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এখানে আমি উভয় পত্রের অনুবাদ তুলে ধরলাম, যার দ্বারা অনুমান করা যাবে, আমি আমার দাওয়াতি ও দীনি কর্তব্য কতখানি নিরপেক্ষ ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছি। তাওফীক দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই শরণাপন্ন হই।

বাদশাহ ফাহ্দ-এর নামে আমার পত্র

মহামান্য খাদিমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ ফাহ্দ ইবনে আবদুল আযীয!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি ভালো আছেন। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব যে-কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার, বিশেষত জাযীরাতুল আরব ও হারামাইন শরীফাইন এবং সাধারণত অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র যেসব চ্যালেঞ্জ ও হুমকির মুখোমুখি, সেসব সংকট ও সমস্যার অনুভূতি থেকে বাধ্য হয়ে আমি এই পত্রখানা এবং আমার লিখিত আরও কিছু গ্রন্থ আপনার সমীপে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। এই নিষ্ঠাপূর্ণ আবেদনপত্রটি আমি এমন এক ব্যক্তিত্বের নামে লিখছি, আমার মতে যিনি এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার এবং এর প্রতিকার বিধানের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা রাখেন। যদি সম্ভব হতো, তা হলে আমি আমার অস্থির ও বেচইন হৃদয়টা এবং ব্যাকুলতার অনুভূতি থেকে ব্যথায় চুরহওয়া মস্তিষ্কটা এই নিষ্ঠাপূর্ণ চিঠির পাতাগুলোর ওপর খুলে রেখে দিতাম। যদি কলমের কালির বদলে কলিজার রক্ত আর চোখের অশ্রু দ্বারা এই চিঠি লেখা সম্ভব হতো আর আমি সশরীরে উপস্থিত হয়ে মুখের ভাষায় মনের কথাগুলো ব্যক্ত করা এ-

সময়ে সম্ভব হতো, তা হলে এসব করতেও আমি বিলম্ব করতাম না।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন এবং এমন কিছু সমস্যা প্রতিবন্ধক যে, স্বয়ং উপস্থিত হতে আমি অপারগ। তাই মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং পত্রপ্রেরকের বিচক্ষণতার ওপর আস্থা রেখে এই পত্রখানা লিখছি। এ-সময়কার নাজুক পরিস্থিতি আর সময়ের সঙ্গিনতার দাবি সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত। সর্বোপরি আমি আপনার কাছে কী প্রত্যাশা রাখতে পারি, সে ব্যাপারেও আপনি অনবহিত নন।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব সাধারণত এবং জাযীরাতুল আরব ও পবিত্র মক্কা-মদীনা বিশেষত এমন এক কঠিন ও চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করছে, যার মোকাবেলা এবং সমাধানের চেষ্টায় না একটি মুহূর্তও বিলম্ব করার সুযোগ আছে, না সম্ভাব্য কোনো একটি পন্থা এড়িয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা আছে। পরিস্থিতি এতখানিই কঠিন যে, তার চিত্র পবিত্র কুরআনের আয়াত كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে আছ ঝাড়ফুক করার লোক?)[১] অপেক্ষা আর কেউ আঁকতে পারবে না।

আমি আপনার মূল্যবান সময় ও দায়িত্বের কথা চিন্তা করে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করছি। আপনার বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, ইসলামের সঠিক পরিচয়, কুরআন অধ্যয়ন, হাদীছের জ্ঞান, সীরাতে রাসূল, বিভিন্ন জাতি ও সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে আপনার যে-জ্ঞান আছে, তাতে এর বেশি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

১. কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা এবং জগতের উত্থান-পতনের ইতিহাসের আলোকে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ও উপকারী বিষয় হলো আল্লাহর সঙ্গে সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ

১. *সূরা কিয়ামা : ২৭, ২৮*

আচরণ করা, তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যথাসম্ভব সংশোধন, সমাজ থেকে অন্যায়-অপরাধ, আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিতকারী কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবন থেকে অলসতা-উদাসীনতা দূর করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এর বাস্তব সাক্ষী। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র সীরাত, খুলাফায়ে রাশেদীন, ইসলামের অনুগত বান্দাগণ ও আল্লাহর অনুসারী রাজা-বাদশাহগণের জীবনে এর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মোটকথা, আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া উম্মাহর সংশোধন, অন্যায়-অপরাধ দূর করা, আল্লাহর রহমতের অধিকারী হওয়া, বিপদাপদ ও সমস্যা-সংকটের সময় জাতি ও সমাজকে মন্দ ফলাফল থেকে নিরাপদ রাখার সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা, সাধারণ উপায়-উপকরণ, সামরিক শক্তি কিংবা বড় কোনো শক্তির সমর্থন যার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, বর্তমানে সবগুলো মুসলিম দেশ ও জাতির মাঝে এমন দুটি শূন্যতা পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো মুসলমানদের অস্তিত্ব, ইসলামি দাওয়াতের উন্নতি-অগ্রগতি, মানুষের হৃদয় ও বিবেককে বশীভূত করা বরং এই দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে, এই শূন্যত মুসলমানদের মাঝে ধর্মত্যাগ, বিশ্বাসে বিকৃতি ও বিপর্যয়ের শঙ্কা তৈরি করে দিয়েছে। তাই এখনই এই শূন্যতাগুলো পূরণ করা আবশ্যক।

প্রথম মৌলিক শূন্যতা হলো এমন একটি আদর্শ সমাজের অনুপস্থিতি, যেটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় এবং বিশ্বাস ও চরিত্র থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষামালার আয়না, মানুষ সেই পরিবেশে শান্তি অনুভব করবে, ঈমানি সৌরভ তার প্রাণশক্তিকে সুরভিত করবে,

প্রকৃত সৌভাগ্যের সঙ্গে পরিচিত হবে, অনুভূত হবে, এই সমাজ সুখ ও আনন্দের বাগিচা এবং এমন একটি জান্নাত, যেখানে ইসলামই হবে সকলের মাথার তাজ, মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত, আদালত থেকে শুরু করে বাড়িঘর পর্যন্ত এবং বোধবিশ্বাস থেকে শুরু করে লেনদেন পর্যন্ত সবখানে ইসলামের শাসন ও তার ছাপ থাকবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এমন আদর্শ সমাজ একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি ও রূপকথায় পরিণত হয়ে আছে, যার চিত্র কিতাবের পাতায় দেখা যায় শুধু। এখন এমন একটি সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা শুধু ইসলামেরই জন্য নয়– গোটা জগতের জন্য প্রথম ও মৌলিক প্রয়োজন।

এটি একটি উজ্জ্বল বাস্তবতা যে, সৌদি সরকারই এমন একটি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার সবচেয়ে বেশি যোগ্য ও ক্ষমতাবান। কারণ, এই অঞ্চলটির মূল উপাদানই ইসলামি দাওয়াত দ্বারা তৈরী। এর প্রতিপালনও হয়েছে এমনই একটি পরিবেশে। মহান আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সব সময়ই তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে। তদুপরি মহান আল্লাহ স্রেফ নিজ অনুগ্রহে এই পবিত্র মাটি ও হারামাইন শরীফাইনের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানের মর্যাদাও তাকেই দান করেছেন। হজের বদৌলতে প্রতি বছর পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে মুসলমানরা এখানে আসে। সেজন্য গোটা মুসলিম জাতি সৌদি সরকারের পানে তাকিয়ে আছে।

৩. মুসলিম বিশ্বের আরেকটি শূন্যতা হলো এমন একটি শক্তিশালী ও মুমিনসুলভ দাওয়াত ও নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, যার মাঝে পৌরুষের উপাদান, উন্নত দৃষ্টি, উন্নত সাহস ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে সেই পরাশক্তিগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ানোর যোগ্যতা ও শক্তি থাকবে, যারা কোনো প্রকার বৈধতা ও অধিকার ছাড়াই বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে রেখেছে এবং যারা ইসলামি দেশ ও মুসলিম জাতিগুলোর ভাগ্যের মালিক হয়ে বসেছে। পাশাপাশি এই ইসলামি নেতৃত্ব ঈছার, (নিজের ওপর অপরকে প্রধান্য দেওয়ার গুণ) ত্যাগ, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রাণ, ধৈর্য ও

দৃঢ়তার চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি তার মাঝে থাকবে সময়ের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো সমস্যার মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও শক্তি।

কারণ, মানুষের একটি সহজাত বিষয় হলো, তারা শক্ত ঈমান, অনুপম সাহস-বীরত্ব ও সাহসী পদক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এই চরিত্রের মানুষগুলোর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে যায়। বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়াও (যদিও হয় তা অন্তঃসারশূন্য স্লোগান আর প্রপাগাণ্ডার জন্য) মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর ক্রিয়া করে এবং মানুষের আস্থা ও সমর্থন জোগাতে সক্ষম হয়। ইসলামি বলয়ের এমন শক্তিটি যদি ভ্রান্ত চিন্তার অধিকারী বা ইসলামবিরোধী হয় এবং কোনো নাস্তিকতামূলক চিন্তাধারা বা দর্শন কিংবা কোনো খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক থাকে, (যেমন ইরাকের বা'ছ পার্টি) তা হলে এটি সাধারণ মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে তোলে। অনেক সময় তারা নাস্তিকতার শিকার হয়ে যায়। কারণ, সাধারণত মানুষ (বিশেষ করে সেই তরুণ ও যুবক শ্রেণি, যারা সেই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত) প্রত্যেক সেই ব্যক্তির গরম-গরম বক্তব্যকে স্বাগত জানায়, যারা বীরত্বের সঙ্গে উক্ত ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায় যদিও তা হয় অন্তঃসারশূন্য স্লোগান কিংবা নিছক মৌখিক জমা-খরচ। এ বিষয়গুলো তাদের বিশ্বাসকেও প্রভাবিত করে। বলা বাহুল্য, কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থা আপন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ের শূন্যতা একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এমন অবস্থা বেশি দিন অব্যাহত থাকতে পারে না। এই শূন্যতা পূরণ করা জরুরি।

অনুরূপ বড়-বড় শক্তিগুলো যেভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে এবং মুসলিম দেশগুলোর

রাজনীতি ও নেতৃত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে, তাদের শক্তি ও প্রভাব থেকে বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত মুসলিম যুবকদের দূরে রাখা এবং ইসলামবিরোধী ও অমুসলিম নেতাদের পরিবর্তে নিষ্ঠাবান, দীনদার ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী শাসক-নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের ঝোঁক সৃষ্টি করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সৌদি আরব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও শির্ক-বিদ'আত থেকে পবিত্র এবং সঠিক ইসলামি বিশ্বাসের ধারক। সেইসঙ্গে মহান আল্লাহ তাকে হারামাইন শরীফাইনের সেবা ও অভিভাবকত্বের মর্যাদাও দান করেছেন। তাই সে-ই এই মৌলিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে। আর আপনার মতো ব্যক্তিত্ব – আল্লাহ যাঁকে দেশ ও পদমর্যাদা উভয় নেয়ামতেই ধন্য করেছেন – এই কাজটি আঞ্জাম দিতে সক্ষম। কারণ, আপনার বংশের পুরনো ও নতুন ইতিহাস প্রমাণ করছে, এই বংশ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে জানে, তারা আল্লাহর কিতাবকে আইনের উৎস বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণে যত্নশীল।

মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি বর্তমানে এমন এক ব্যক্তির ওপর নিবদ্ধ, যিনি সাইয়িদুনা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, যিনি হিজরি প্রথম শতকের শেষের দিকে আড়াই বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে নিষ্ঠা, প্রত্যয়দীপ্ত সিদ্ধান্ত, দুনিয়াবিমুখতা, সরল জীবন, উন্নত চরিত্র ও দৃঢ়তার গুণে গুণান্বিত হয়ে বৃহত্তর ইসলামি সমাজকে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন এবং একটি রাষ্ট্রকে কীভাবে সুশাসন দিতে হয়, কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত করতে হয়, কীভাবে একটি দেশের জনগণকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হয়, কীভাবে একটি বিলাসী জাতিকে পরানুকরণ থেকে বের করে ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি জীবনচরিত্র ধারণ করাতে হয় এবং পরজীবনকে ইহজীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়, তার নমুনা উপস্থাপন

করেছেন। এই অভিযানে তিনি শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন।

মুসলিম বিশ্বের জন্য আরেকজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেন বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি, যিনি হিজরি ষষ্ঠ শতকে ক্রুশেডারদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন এবং শুধু নিজের গভীর ও শক্তিশালী ঈমান, নিষ্কম্প বিশ্বাস, জিহাদের অসাধারণ স্পৃহা, নিজের পবিত্র ইসলামি চরিত্র, সরল-শাদা জীবন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনকে পুনরুদ্ধার এবং বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্র, পবিত্র ভূমি ও আরব দেশগুলোকে শত্রুমুক্ত করার কাজে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

হারামাইন শরীফাইনের মহামান্য সেবক!

আমার মনে হয়, মহান আল্লাহ আপনাকে এই ধারার অসাধারণ কীর্তি আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত করেছেন। কারণ, আপনার প্রতিপালন হয়েছে ইসলামের দোলনায় আর বড় হয়েছেন বীর পুরুষদের মাটিতে ও সিংহচরিত্রের মানুষদের দেশে। যদি দৃঢ় প্রত্যয়, শক্ত প্রতিজ্ঞা আর আল্লাহর তাওফীক সঙ্গ দেয়, তাহলে এটি কঠিন কোনো কাজ নয়। এই কাজটি যেদিন আঞ্জাম পাবে, সেই দিনটি হবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে একটি আনন্দের দিন। সেদিন কল্যাণ ও সৌভাগ্য আপনার পায়ে চুমো খাবে।

আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সৌদ পরিবারের কল্যাণ কামনায়

আবুল হাসান আলী নদবি
১৭ জুমাদাল উলা ১৪১১
৬ ডিসেম্বর ১৯৯১

বাদশাহ্ ফাহ্দ-এর উত্তর ও আমার নামে তাঁর পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি ভালো আছেন।

আপনার পত্র পেয়েছি, যেখানে আপনি মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা, বিপদ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আপনার নিষ্ঠাপূর্ণ অনুভূতি ও চেতনার কথা ব্যক্ত করেছেন। সেইসঙ্গে আপনি সৌদি আরব ও আমার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছেন এবং অনেক প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করেছেন, তার জন্য আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কুরআন, সুন্নাহ ও বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনচরিতের আলোকে গোটা দুনিয়ায় ইসলামের সমুন্নতির পথে মুসলমানদের যে-সেবার প্রতিশ্রুতি সৌদি সরকার ঘোষণা করে রেখেছে, সেই পলিসির ওপর আমি শতভাগ অটল থাকব এবং ইনশাআল্লাহ এর জন্য সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করব না।

আমার পুরোপুরিই অনুভূতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও পবিত্র সীরাত থেকে নির্দেশনা গ্রহণ না করব, খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত, মহান তাবেয়ীন ও উম্মতের সাধুসজ্জন ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামি ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিবর্গের কর্মনীতিকে আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দেশ প্রকৃত ইসলামি জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে না এবং সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে মুসলমানরা যে-বিপদ ও সমস্যা-সংকটের সম্মুখিন, প্রকৃতপক্ষে এসব হলো পরীক্ষা যে, আমরা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় প্রতিরোধের দায়িত্ব কতখানি পালন করছি।

এমনি এক কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করছি। আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে আশা পোষণ

করছি, মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যে-বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটি তিনি পূরণ করবেন এবং শত্রুদের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে এই উম্মতকে সত্যের পথে দৃঢ় ও অটল রাখবেন।

মহান আল্লাহ আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ভাই
ফাহ্‌দ ইবনে আবদুল আযীয আলে সউদ
বাদশাহ, সৌদি আরব।
১২ শাবান ১৪১১
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

একটা গুরুতর দুর্ঘটনা

২০ মার্চ ১৯৯১ ও ৪ রমযান ১৪১১। রাতে লাখনৌ থেকে রায়বেরেলির এক বন্ধুর কাছে টেলিফোনে সংবাদ এল, ৩ রমযান মোতাবেক ১৯ মার্চ ঠিক তারাবিহর নামাযের মধ্যখানে বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা ও তার মহাসচিব মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রহমানি ইনতিকাল করেছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। সেটি এখানে তুলে ধরছি।

'এই সংবাদটি আমার ওপর বজ্রের মতো আপতিত হয়েছে যে, বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা ও তার মহাসচিব মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রহমানি ইনতিকাল করেছেন।

মাওলানার মৃত্যুতে ইমারাতে শারইয়্যা বিহার ও উড়িষ্যার মতো সক্রিয়, প্রভাবশালী ও বরকতময় সংগঠন (যার নজির পাওয়া খুবই কঠিন) এবং এই দুই প্রদেশের দীনি ও জাতীয় নেতৃত্বে এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি হলো, যার প্রতিকার বাহ্যত কঠিন বলে মনে হচ্ছে। শুধু তা-ই

নয়– ভারতের দীনি, জাতীয় ও চিন্তানৈতিক নেতৃত্বে এমন একটি শূন্যতা তৈরি হয়ে গেল, যোগ্যতার এই আকাল যুগে যা পূরণ করা বলতে গেলে অসম্ভব। মাওলানার ব্যক্তিত্ব শুধু নিজ প্রদেশে কিংবা শুধু ভারতেই পরিচিত ছিল না; বরং তিনি এ যুগের মুসলিম বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর মাঝে জ্ঞান, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, ইচ্ছাশক্তি, যেকোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, ভারসাম্যের মতো এমন কতগুলো গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো একসঙ্গে একজন মানুষের মাঝে পাওয়া একটি কঠিন ও দুর্লভ ব্যাপার, যার ফলাফল এই ছিল যে, মহান আল্লাহ তাঁর দ্বারা একাধিক দীনি ও জাতীয় ঐতিহাসিক কাজ নিয়েছেন, যার নজির পাওয়া কঠিন। এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং মরহুমের রূহের মাগফেরাত ও জান্নাতে উঁচু মর্যাদার দু'আ করছি। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন মাওলানার রেখেযাওয়া কাজগুলো যথারীতি অব্যাহত রাখার মতো যোগ্য লোক তৈরি করে দেন। তাঁর মৃত্যুতে শূন্যহওয়া জায়গাটি যথাযথভাবে পূরণ করে দেন।'

মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব মরহুমের অনেকগুলো গুণের মধ্যে দুটি গুণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সমকালীন আলেমে দীন ও দীনি সংগঠনগুলোর মধ্যে ইসলাম ও বিশেষ করে ইসলামের পারিবারিক আইনের হেফাযত প্রশ্নে তাঁর সবচেয়ে বেশি অনুভূতি ছিল এবং একাজে তিনিই সবচেয়ে বেশি চেতনা লালন করতেন। অপর বৈশিষ্ট্য হলো, নানা মেজাজ, নানা চিন্তা ও নানা যোগ্যতার লোকদের সঙ্গে নিয়ে চলার তাঁর মাঝে এমন একটি যোগ্যতা ছিল, যার নজির পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

রাজিব গান্ধী হত্যার ঘটনা

১৯৯১ সালের ২১ মে হঠাৎ সংবাদ এল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। এটা ছিল গান্ধীপরিবারের তৃতীয় দুর্ঘটনা। এই বেদনাময় আকস্মিক সংবাদে মনে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশঙ্কা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি আরও একটি বিশেষ কারণে আমি

প্রচণ্ডরূপে ব্যথিত হয়েছি। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সুবাদে মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ফলে খুব কাছে থেকে আমি তাঁর ভদ্রতাসুলভ কর্মনীতি, বাস্তববাদিতা ও নৈতিক সাহসের প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ কানে আসার সাথে-সাথে তাঁর এই গুণগুলোর কথা মনে পড়ে গেল এবং অন্তরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট-এর রায়ের বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেন্টে নতুন করে 'তালাকাপ্রাপ্তা বিল' পাস করিয়েছিলেন, যেটি ছিল মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ও ভারতীয় মুসলমানদের দাবির অনুরূপ। এই বিল পাস করিয়ে তিনি যে-আন্তরিকতা, উদারতা, বাস্তববাদিতা ও নৈতিক সাহসের স্বাক্ষর রেখেছেন, তার দৃষ্টান্ত (যেটি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্পদায়ের চিন্তা-চেতনা ও ইংরেজি-হিন্দী প্রচারমাধ্যমের প্রপাগাণ্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত, যেন এই বিল পাস হওয়া ছিল দেশের ওপর কোনো বৈদেশিক আক্রমণ কিংবা প্রচণ্ড বজ্রপাতের নামান্তর) ভারতের ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে।

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা দরকার। তাহলো, আমি এ-বিষয়টি গুরুত্বসহকারে মাথায় রেখেছি এবং যথাযথভাবে পালনও করেছি যে, রাজিবজির সঙ্গে আমি কখনও একা দেখা করব না। মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে একত্রে দেখা করব। কারণ, তিনি বেশি অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার জানাশোনা অনেক। আরও একটি বিষয় আমরা দুজনে মিলে স্থির করে নিয়েছিলাম যে, আমরা যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করব, তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষের বিধান আর পার্সোনাল ল' বোর্ডসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া দেশের অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করব না। তাতে একটি উপকার এই হয়েছিল যে, রাজিব গান্ধী নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, আমরা কোনো রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার কিংবা সাধারণ নেতৃত্বের প্রদর্শনি করছি না। এটি তাঁরই দূরদর্শিতা ছিল যে, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, এরা কোনো রাজনৈতিক নেতা নন এবং ধর্মীয় অনুভূতি, ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ এদের আমার কাছে নিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক লিডার নন– এরা ধর্মীয় নেতা।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ ও কতগুলো দুর্বলতা, যেগুলো দূর করা জরুরি

ইরাকের কুয়েত আক্রমণ ও দেশটি দখল করে নেওয়ার প্রতিধ্বনি (অধিকাংশ জায়গায় অসমর্থন ও প্রতিবাদের সঙ্গে) আরব ও মুসলিম

দেশগুলোতে শোনা গেল। তারই ওপর ভিত্তি করে মিশর সরকারের আওকাফ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদ ১৯৯১ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল কায়রোতে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল, যেখানে উপসাগরীয় যুদ্ধ ও তার থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও ফলাফলের বাস্তবসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ঠিক করার কথা ছিল। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমিও আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকটি কারণে আমি নিজে না গিয়ে একটি সুবিস্তারিত নিবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো, সে-সময়ে আমার স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। আরেকটি হলো, ওই সময় আমি নানা কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম, যার ফলে সময় বের করা দুষ্কর ছিল।

আরও একটি কারণ ছিল। তা হলো, ১৯৫১ সালে দীর্ঘ একটা সময় আমি কায়রো অবস্থান করেছিলাম, যার পরিধি ছিল প্রায় পাঁচ মাস। তারপর আর আমার মিশর যাওয়া হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে মিশরে আমার গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রচার ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং ওখানকার দীনি অঙ্গনগুলোতে এর গ্রহণযোগ্যতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম, এখন আবার গেলে ওখানে আমাকে কঠিন ব্যস্ততা ও কর্তব্য পালনের সম্মুখিন হতে হবে। অনেক ফরমায়েশ ও চাহিদা আমাকে পূরণ করতে হবে এবং বিভিন্ন সংগঠন, আন্দোলন ও সাংবাদিক মহলের মনোরঞ্জন ও প্রশান্তির উপাদান জোগাতে হবে। কিন্তু না আমার এখনকার স্বাস্থ্য এত কিছু করার ক্ষমতা রাখে, না বয়স ও মেজাজ।

আর সেজন্যই আমি নিজে না গিয়ে একটি সুবিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য লিখে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত ও ন্যায়ানুগ পর্যালোচনা থাকবে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং সেই ত্রুটিগুলো দূর করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, যেগুলো এধরনের পদক্ষেপকে সব সময় প্ররোচিত করতে এবং তার জন্য পথ সুগম করতে প্রস্তুত থাকে।

আমি এই দীর্ঘ ও সুস্পষ্ট নিবন্ধে সেই ত্রুটি ও ছিদ্রগুলোর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি, যেগুলোর উপস্থিতি যেকোনো কালে ও যেকোনো দেশে এ-রকম ট্রাজেডির জন্ম দিতে পারে, যার একটা নমুনা ইরাকের কুয়েত আক্রমণ। সেইসঙ্গে এই স্বীকৃতিও প্রদান করেছি যে, এসব বাস্তবতার ওপর চিন্তা-গবেষণা করার এবং মুসলিম বিশ্বকে, বিশেষ করে আরব বিশ্বকে এধরনের ট্রাজেডি থেকে রক্ষা করার জন্য মিশরই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

কারণ, ইসলাম ও আরব দেশগুলোর ইতিহাসে বড়-বড় নাজুক সময়ে এই দেশটিই ইসলামের সম্মান ও মুসলমানদের সুরক্ষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। আর তারই ওপর ভিত্তি করে একে كِنَانَةُ الْإِسْلَامِ (ইসলামের তূণীর)-এর মতো গৌরবময় অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।

সেসবের মধ্যে ইতিহাসের দুটি নাজুকতর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হলো ক্রুশেড যুদ্ধের সময় বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং সব কটি পবিত্র স্থান, এমনকি পবিত্র মক্কা-মদীনা পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রধান সেনাপতি ও তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োজিত মিশরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবির মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের পুনরুদ্ধার এবং গোটা আরবের ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে আসা পরোক্ষভাবে মিশরেরই কীর্তিমালার অন্তর্ভুক্ত।[১] দ্বিতীয়টি হলো, তাতার আক্রমণের সময় যখন মুসলিম বিশ্বের পা উপড়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন অবস্থা এতটাই শোচনীয় রূপ ধারণ করেছিল যে, প্রবাদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, 'যেকোনো কথা বিশ্বাস করতে পার; কিন্তু একথা বিশ্বাস করো না যে, তাতারিরা কোথাও পরাজয় বরণ করেছে'। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে মিশরেরই শাসক আল-মালিকুল মুযাফফর সাইফুদ্দীন এই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনাটিকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং তাতারিদের ৬৫৯ হিজরির ২৫ রমযান জালুত নামক স্থানে প্রথমবারের মতো পরাজিত করেন। সেখানে তাতারিদের গণহারে হত্যা করা হলো। মুসলমানরা তাদের অতি অনায়াসে ধরে ফেলছিল এবং লুণ্ঠন করছিল।[২] এই ঘটনার পরও আল-মালিকুয যাহির একাধিকবার তাদের পরাজিত করেন এবং সমগ্র শাম থেকে তাদের বিতাড়িত করেন।

মিশরের মানবীয় মনস্তত্ত্বের খাতিরে এই ভূমিকার পর আমি সেই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছি, যেগুলো এ-ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচনা জোগায় এবং অনেক সময় সমর্থন ও সহযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ঘটে। তার কয়েকটা ত্রুটি ও দুর্বলতা আমি এখানে তুলে ধরলাম।

১. জ্বালাময়ী স্লোগান, উচ্চকিত দাবি ও জাদুময় প্রতিশ্রুতিতে (স্লোগানদাতা ও দাবিদারদের চিন্তাচেতনা, বোধবিশ্বাস ও

---

১. *বিস্তারিত জানতে লেন পোল-এর 'সালাদীন' (সুলতান সালাহুদ্দীন) পৃষ্ঠা ৮৯ পড়ুন*
২. *বিস্তাতি জানতে পড়ুন 'আল-কামিল লি-ইবনিল আছীর' পৃষ্ঠা ১২*

তাদের অতীত চরিত্র, লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড বিবেচনা না করে) ধোঁকা খাওয়ার মেজাজ ও স্বতন্ত্র যোগ্যতা।

২. বৃহৎ কোনো শক্তির হুমকি-ধমকি ও মিথ্যা প্রদর্শনিতে এতখানি প্রভাবিত হওয়া যে, হুঁশ-জ্ঞানকে শিকেয় তুলে রাখা এবং বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা।[১]

৩. মুসলিম দেশগুলোতে ইতিবাচক সক্রিয় ও শক্তিশালী দীনি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও দক্ষ নেতৃত্বে পরিচালনার প্রতি মনোযোগ দেওয়াও জরুরি। কোনো দেশে যদি এমন কোনো সংগঠন বিদ্যমান থাকে, তা হলে তাকে হুমকি মনে করা এবং তাকে নির্মূল বা দুর্বল বানানো চেষ্টা না করে তাকে মূল্যায়ন ও সাহস জোগানো দরকার। কারণ, ইসলামি সমাজ গঠন ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এমন একটি ইসলামি দাওয়াতি সংগঠন ও আন্দোলন খুবই উপকারী প্রমাণিত হতে পারে, যদি কিনা সে সাহসী ও দূরদর্শী হয়।[২]

৪. ইসলামই আরবের ভিত্তি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব বিশ্বের প্রাণ ও তার নেতা, ঈমানি শক্তিই আরব দেশগুলোর আসল শক্তি, যে কিনা ইতিহাসে অসাধারণ কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে।

৫. যথাসম্ভব বিলাসী জীবন থেকে দূরে থাকতে হবে। উন্নতি ও সভ্যতা চর্চায় বাড়াবাড়ি ও এমন আচার-চরিত্র থেকে বিরত থাকতে হবে, যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দ এবং আল্লাহর সাহায্যের পথে প্রতিবন্ধক।[৩]

---

১. আমি এর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও বর্ণনা করেছি। তা হলো, এই জাতিটির মাঝে দীর্ঘ দিন যাবত এমন একটি শক্তি ও সাহসী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, যার মাঝে জিহাদের প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল আছে, বিশ্বনেতৃত্বের পদ ও দায়িত্বপালনের অনুভূতি আছে এবং প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের বড়-বড় শক্তিগুলোর প্রতি তার কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই।

২. একথা বলে আমি কোনো-কোনো শক্তিশালী ইসলামি সংগঠনকে (যেমন– এখওয়ানুল মুসলিমীন) নির্মূল করার সেই ভুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছি, মিশর থেকে (জামাল আবদুন নাসের ও আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে) যার সূচনা হয়েছে, যাতে আজও কোনো পরিবর্তন আসেনি।

৩. নিবন্ধে আরব দেশ ও ইসলামের ইতিহাসের সূত্রে এর অনেকগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করেছি এবং বলেছি, কুরআনের ভাষায় 'বাতার' ও 'তারফ' -এর জীবনে এমন বহু বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং অনেক রাজা-বাদশাহর পতন ঘটেছে।

৬. বর্তমান পেক্ষাপট আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজনীতা স্পষ্ট করে তুলেছে যে, আরব ও অন্যান্য ইসলামি দেশ-জাতিগুলোর নিজস্ব একটি প্রভাবশালী ও সক্রিয় সংগঠন থাকা দরকার, যে তাদের আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে এবং পর্যায়ক্রমে একটি ইসলামি জাতিসঙ্ঘের রূপ লাভ করবে।

আমি এই নিবন্ধটি লিখে পাঠিয়ে দিলাম, যেটি ওই সম্মেলনে উপস্থাপ করা হয়েছিল এবং সম্ভবত পাঠ করেও শোনানো হয়েছিল।

নরসীমা রাও ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী

১৯৯১ সালের ১৭ জুন কংগ্রেস সভাপতি নরসীমা রাও ভারতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর স্থায়ী নিবাস হায়দারাবাদ। একাধি অভিজ্ঞজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তিনি উছমানিয়া ইউনিভার্সি হায়দারাবাদ থেকে শিক্ষা সমাপণ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যমতে তিনি উরদু ফারসির বেশ ভালো জানেন। উরদু ভাষায় তিনি অবলীলায় কথা বলতে পারেন।

আমার একটি নিয়ম আছে, যখন যিনি ভারতের প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহ করেন, তখন আমি তাঁকে কিছু প্রস্তাবনা ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে থাকি সেই ধারা অনুসারে আমি ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই নতুন প্রধানমন্ত্রী নরসীম রাও-এর কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখি। এখানে আমি সেই পত্রখানা হুবহু তুলে ধরলাম। কারণ, উক্ত তার মাধ্যমে শুধু পত্র লেখকেরই চিন্তাধারা ও বাস্তব পরিস্থিতির চিত্র ও নানা শঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে না, বরং দেশেরও সেই চিত্রটি সামনে চলে আসছে, যেটি তখন ও তার পরে অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তী সময়েও অবিচ্ছিন্নভাবে বহাল আছে।

মহামান্য জনাব নরসীমা রাও!

প্রধানমন্ত্রী, ভারত।

আদাব জ্ঞাপন ও কল্যাণ কামনার পর সর্বপ্রথম দেশ, জাতি ও মানবতার সেবা এবং মাতৃভূমির সুরক্ষার উজ্জ্বল ও ব্যাপক সম্ভাবনার মাঝে আপনার প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার জন্য আমি আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আগাম ক্ষমা চেয়ে নিয়ে একথাটিও বলতে ভুলব

না যে, এই দায়িত্ব আপনি এমন একটি সময়ে কাঁধে তুলে নিয়েছেন, যখন দেশ 'লাঞ্ছনার অতল খাদে' পড়ে গেছে।

আমাদের এই দেশটি বর্তমানে এমন একটি পরিস্থির সম্মুখিন, যেমনটা কোনো একটি দেশের শত বছরে অন্তত একবার হলেও হতে হয়। এ-ক্ষেত্রে আমি সবার আগে (একজন ধর্মীয় মানুষ হিসেবে) আপনাকে নিবেদন জানাব, আপনাকে সেই খোদার সাহায্য ও নির্দেশনার প্রয়োজন আছে, যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাদের জন্য পিতামাতার জন্যও বেশি মায়াশীল এবং তিনি ক্ষমতাবান ও শক্তিধর। তারপর যে-বিষয়গুলোর প্রয়োজন, সেগুলো হলো, নিষ্ঠা, সত্যিকার দেশপ্রেম, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ঐক্য ও সহযোগিতা।

এই নাজুক মুহূর্তে আমি ধর্ম, নৈতিকতা এবং ইতিহাস ও রাজনীতির একজন ব্যাপক অধ্যয়নকারী লেখক ও এমন একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে (যার এসব প্রস্তাবনা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে বড় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুবাদে কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত কিংবা দলগত স্বার্থের কোনো অভিলাষ নেই) আপনার সমীপে নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ পন্থায় কিছু পরামর্শ ও বাস্তবতা তুলে ধরার দুঃসাহস প্রদর্শন করছি। আশা করি, নিজের মূল্যবান সময় থেকে সামান্য সময় বের করে আমার এই পত্রখানার ওপর অভিভাবকসুলভ চোখ বোলাবেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা ব্যক্ত করার জন্য আমি উরদু ভাষাকে এজন্য প্রাধান্য দিয়েছি যে, আমি জানতে পেরেছি, উরদুর সঙ্গে আপনার ভালো সম্পর্ক আছে এবং আপনি অবলীলায় এই ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারেন। আর আমিও সবচেয়ে বেশি সহজে ও অবলীলায় এই ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারি।

এই মুহূর্তে আমি আপনার মূল্যবান সময় দেশের কোনো খণ্ডিত বিষয় বা ভারতের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলমানদের) অভিযোগ ও প্রয়োজনাদির আলোচনায় ব্যয় করব না। এখন আমি আপনার সমীপে যা-কিছু উপস্থাপন করব, সবই হবে ভারতের সাধারণ স্বার্থ ও মৌলিক বিষয়সংক্রান্ত।

প্রথম কথাটি হলো, আমাদের এই দেশটির অস্তিত্ব, উন্নতি, মর্যাদা, দৃঢ়তা এবং তার সমসাময়িক বিশ্ব, ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নিজের যথাযথ কীর্তি আঞ্জাম দিতে সঠিক, নিরাপদ, সম্মানজনক ও ঝুঁকিমুক্ত পথ একমাত্র সেটি, যেটি স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ বিজ্ঞ, দূরদর্শী ও দুঃসাহসী নেতৃবর্গ, যেমন– গান্ধীজি, পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও তাঁদের সহচরগণ স্থির করেছিলেন। আর তা হলো, সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষতা, সঠিক গণতন্ত্র ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ তা যতই দীর্ঘ কঠিন হোক-না কেন। এই পথ ছাড়া আর যেটিই অবলম্বন করা হোক, তার দ্বারা যদিও সাময়িকভাবে সফলতা অর্জিত হোক, দেশের জন্য তা হবে ধ্বংসাত্মক এবং সেই ত্যাগ ও কুরবানি বিনষ্টের শামিল, মুক্তিযুদ্ধের সময় যা কার্যকর হয়েছিল। আর তা দেশটিকে এমনসব সমস্যার মাঝে নিপতিত করবে, যার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ধর্ম, মানবীয় ইতিহাস, দর্শন ও নৈতিকতার একজন ছাত্র হওয়ার সুবাদে আমি সবার আগে যে-কথাটি বলতে চাই এবং আমি আশঙ্কা করছি, সম্ভবত আর কেউ – যার ওপর রাজনৈতিক চিন্তা প্রবল – কথাটি বলবে না; তা হলো, এই দেশটির জন্য দুটা শঙ্কা খুবই উদ্বেগজনক এবং আপনার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের হকদার। একটা হলো অত্যাচার-নির্যাতনের প্রবণতা, মানুষের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার মূল্যহীনতা, (চাই তার সম্পর্ক যেকোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে হোক) বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উঁচু-নীচু

বৈষম্যের মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে। এ-ধরনের দাঙ্গা-সহিংসতায় বংশের-পর-বংশ ও বসতির-পর-বসতি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সামান্য আর্থিক স্বার্থের পথ ধরে মানুষের জীবন হরণ করা, সহিংস অপরাধ ও পরের ওপর অন্যায়মূলক আচরণ দেশের মৌলিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকার সর্বশেষ; কিন্তু সবচেয়ে বেশি লজ্জাজনক অপরাধ হলো যৌতুক। যৌতুক সমাজের জন্য মারাত্মক এক অভিশাপ। যৌতুক না আনার অপরাধে নববধূকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, বিষ খাইয়ে হত্যা করা হচ্ছে এবং নারীর ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই প্রবণতার অবসান ঘটানো খুবই জরুরি।

যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে, তাদের পক্ষে এ বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ যে, এই বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, যিনি মানুষকে মায়ের চেয়েও বেশি স্নেহ করেন, আমাদের এসব কর্মকাণ্ডে তিনি সন্তুষ্ট নন। এই চরিত্রকে তিনি বেশি দিন সহ্য করবেন না। এর ফলে হাজারো প্রচেষ্টা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও দেশ উন্নতি করতে পারে না। এমন একটা সমাজ বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত আছে যে, এর চেয়েও কম স্তরের জুলুম ও সহিংসতার কারণে বড়-বড় রাজত্ব ও সভ্যতা – এককালে যাদের সুনাম, সুখ্যাতির, ক্ষমতা ও প্রভাবের অন্ত ছিল না – ধ্বংস হয়ে গেছে। দূরদর্শিতা, বাস্তববাদিতা গভীর রাজনীতির দাবি হলো, এই অপরাধপ্রবণতাকে এখনই বন্ধ করা দরকার। আপনার অসাধারণ মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বিষয়গুলোর সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি। আর সেজন্যই এ ব্যাপারে আর বেশি কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

তৃতীয় যে-বিষয়টির প্রতি এখনই দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং যেটি কিনা বড় বেশি উদ্বেগজনক, সেটি হলো, চরিত্র ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি (Corruption), যা কিনা এমন

একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার কারণে অনেক ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী সরকারের পতন ঘটেছে এবং তারা একটা পুরানো উপাখ্যানে পরিণত হয়ে আছে। এই পরিস্থিতির প্রতি এখনই দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। রাজনৈতিক বিষয়াবলি ও নির্বাচনি অভিযানের চেয়েও এর বিরুদ্ধে বেশি ঝড়গতির অভিযান পরিচালনা করা দরকার। এর জন্য গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় যাওয়া জরুরি। কঠোর আইন, শিক্ষামূলক শাস্তি ও প্রচারমাধ্যম (Public Media) দ্বারা কাজ নেওয়া এবং প্রশাসনের (Administration) কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় 'না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশি'।

এই ধারাবাহিকতায় আরেকটি বিষয় হলো হিন্দু পুনর্জাগরণ (Hindu Revavalism) আন্দোলন, হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, আরএসএস, সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতার ব্যাপারে সরকারের নমনীয় অবস্থান। সরকারের এই নীতির দ্বারা সাময়িকের জন্য কিছু উপকারিতা কিংবা তাৎক্ষণিক কিছু পেরেশানি থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও এরা এবং সরকারের এই নীতি দেশটিকে ধ্বংসের হাতে দেওয়ারই নামান্তর। এই চরিত্র ও এই নীতি শেষ পর্যন্ত দেশটিকে নিয়েই তবে ডুববে। গান্ধিজি এই বাস্তবতাটি বেশ ভালো করেই বুঝতেন যে, সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রথমে দেশের প্রধান দুটি অংশের (হিন্দু ও মুসলিম) মাঝে ক্রিয়া করবে। তারপর এটি ধর্মীয় বিরোধ, শ্রেণিগত বৈষম্য, বংশগত, ভাষাগত, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক বিরোধের আকারে প্রকাশ পাবে। আর যখন এই কাজগুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন এটি দাবানলের মতো দেশ ও দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের গ্রাস করে ফেলবে এবং দেশটিকে ধ্বংস করে দেবে।

এমন সহিংস পুনর্জাগরণ (Aggressive Revavalism) এদেশের ইতিহাসে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। এ ক্ষেত্রে আপনি সরকারি রিপোর্ট, দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার

বাহ্যিক টিপটপ, উন্নয়ন এসব দেখবেন না। দেশের সাধারণ নাগরিক, মধ্যম সারির জনতা ও সেই লোকদের জিজ্ঞেস করুন, যাদের আদালত, সরকারি অফিস, রেলওয়ে, বিমান সার্ভিস, থানা-পুলিশ, টেলিফোন, হাসপাতাল, ঠিকাদারি ও নানা বিভাগে যেতে হয়। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোথাও ঘুস ছাড়া সামান্য একটু কাজও হয় না। সরকারি অফিসে সরকারের বেতনভোগী লোকদের দ্বারা কাজ করাতে হলে টাকা দিতে হয়। ঘুস ছাড়া একটি ফাইলও নড়ে না। টাকা ছাড়লে যেকোনো কাজ করানো যায়, যেকোনো অপরাধীকে ছাড়িয়ে আনা যায়, যেকোনো নিরপরাধ ভদ্র লোককে ফাঁসানো যায়, যেকোনো ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত বের করানো যায়, যেকোনো জায়গায় দাঙ্গা বাঁধানো যায়। এমনকি দেশের গোপন তথ্যও বিক্রি করা যায়। ভেজাল ছাড়া ওষুধ পাওয়া যায় না। ঘুস ছাড়া সরকারি চিকিৎসা সহযোগিতা পাওয়া যায় না, রোগীদের জন্য সরকার যে-আয়োজন করে রেখেছে, তা যথাযথ পাওনাদারের কোনো কাজে আসছে না। ওষুধ ও খাদ্যপণ্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ভেজাল ছাড়া কোনো খাদ্যপণ্য পাওয়া যায় না। রেলওয়ে ও বিমান সার্ভিসে ঘুসের বাজার এতটাই গরম হয়ে গেছে যে, সরকার দৈনিক কয়েক লাখ কোটি টাকার লোকসান গুনছে। এসবের মূলে আছে অর্থের মাত্রাতিরিক্ত মোহ, মন থেকে আল্লাহর ভয় বের হয়ে যাওয়া, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, দেশের স্বার্থকে সবার ওপর প্রাধান্য দেওয়া ও দেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা ও চেতনা শেষ হয়ে যাওয়া।

এসব কারণে দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির পরও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনযাত্রা থমকে গেছে। সর্বোপরি লজ্জা ও ব্যর্থতার ব্যাপার হলো, এত কিছুর পরও দেশের সাধারণ মানুষ ইংরেজ আমলের কথা মনে করছে এবং তাদের ফিরে আসা কামনা করছে। প্রশাসন যখন চৌকস ছিল। তখন

রেলগাড়ি যখন সময়মতো ছাড়ত, সময়মতো এসে পৌঁছত। হাসপাতালগুলো শান্তি, আনন্দ ও সেবার ঠিকানা ছিল। ছাত্ররা তাদের চেষ্টা ও যোগ্যতায় পাশ করত। চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি যোগ্যতা ও অধিকারের ভিত্তিতে হতো। এখন এসব স্বপ্ন আর কল্পনামাত্র।

এই তিনটি বিষয় তাৎক্ষণিক দৃষ্টি দেওয়ার যোগ্য এবং এগুলোরই ওপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্র সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই যে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী হলো নির্বাচনপদ্ধতি, ভোটারদের সন্তুষ্ট রাখা, নির্বাচন কমিশনের রাজনীতিকদের অনুগত হওয়া এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের এমনসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান যে, তারা যত ভুল-অন্যায়ই করুন-না কেন, সবই মাফ এবং পার্লামেন্টের সদস্যপদ এমন একটি স্বর্ণপক্ষি কিংবা আদি কালের রূপকথার পাখি 'হুমা' যে, এই পাখি যার মাথার ওপর বসবে, সে-ই রাজত্ব পেয়ে যাবে।

অবশেষে একজন ধর্মীয় মানুষ, বিশ্বের ইতিহাস, পুরাতন ও নতুন রাজনীতির ছাত্র ও লেখক হিসেবে আরও একটি কথা বলতে চাই যে, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, সবচেয়ে বড় রাজনীতি হলো 'নিষ্ঠা'। অবশেষে এই নিষ্ঠারই জয় হয় এবং নিষ্ঠার ধারক-বাহকরাই সফল হয়। এটিই সেই অস্ত্র, যে শত্রুকে বন্ধু আর বন্ধুকে নিবেদিত বানায়। আর শেষে সফলতা ছিনিয়ে আনে। এটিই মানুষের সেই গুণ, যে মায়ের মমতায়, নবী-রাসূল ও অলী-দরবেশদের আন্তরিকতায় এবং নিজেকে ও আত্মীয়-পরিজনকে ভুলে গিয়ে দেশের জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারীদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। আর আজও ভারতের মতো বিরাট দেশ নানা ধর্ম ও নানা জনগোষ্ঠীর মিশ্র সমাজকে এই 'নিষ্ঠা'-ই বাঁচাতে পারে। আপনার কাছে আমার এটিই কামনা। এটিই এখন জাতির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মানবীয় চরিত্র ও সত্যিকার দেশপ্রেমের ভিত্তি হলো জনসম্পৃক্ততা (Mass Contact)। আপনি জনসম্পৃক্ততা গড়ে তুলুন। গণমানুষকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবতার মর্যাদা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের কথা বলুন। একে আপনি একটি আন্দোলনের রূপ দান করুন। এই আন্দোলন প্রচেষ্টাকে আপনি শহর-নগর থেকে শুরু করে গ্রামে-গ্রামে এমনকি ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন এবং এর পেছনে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করুন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ পরস্পরের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও কুধারণা তৈরি করে। আমাদের মাঝে এই বিষ বিদেশি শাসকরা পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। এক ইংরেজ লেখক Elliot লিখেছেন, 'আমি এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে এমন কিছু উপাদান জুড়ে দিয়েছি যে, এখন আর হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ে কখনও মিল হবে না।' তারপর সংকীর্ণমনা ও বিভ্রান্তকারী ইতিহাস লেখকরা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীরা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই কাজটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে এবং তারা এর আলোকেই পথ চলছে। তারই ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম ও শিক্ষিত শ্রেণির মস্তিষ্ক ভারতের প্রাক্তন শাসক, বরং দেশের সর্ববৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানদের ব্যাপারে ভুল ধারণা, বরং শত্রুতামূলক চেতনা লালন করে। সাম্প্রদায়িকতার এই বিষ তাদের গোটা জীবন ও চরিত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষাসিলেবাসকে এখনই সংশোধন করা প্রয়োজন। আপনি সিলেবাসের ইতিহাস বিষয়ের বই ও নিবন্ধগুলো এমন উপাদানগুলো বের করে দিন। এ ছাড়া স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মনের নতুন প্রজন্ম গড়তে পারে না, এই দেশের জন্য যাদের খুবই প্রয়োজন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম, এমনকি গণমাধ্যমগুলোও (Pablic Media) সংবাদ পরিবেশন ও পর্যালোচনায় বেশিরভাগ সময় দায়িত্বহীন নীতি অবলম্বন করে। তাদের কারণে সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়; এমনকি

অনেক সময় বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং আস্থা ও নৈকট্য অর্জনের পরিবর্তে ঘৃণা, দূরত্ব ও প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়। তারা তিলকে তাল বানায়, তালকে তিল বানায় এবং জাতির সামনে ঘটনার একতরফা চিত্র পরিবেশন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেস ও মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর সঠিক ব্যবহার হবে না এবং দেশের জনগোষ্ঠীর নানা শ্রেণির এই দূরত্ব ও পরস্পরের ব্যাপারে কুধারণার অবসান হবে না।

ইংরেজরা যেহেতু সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসে এ দেশ শাসন করছিল, যার কোনো অধিকার তাদের ছিল না এবং এ দেশের জনগণের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা একমাত্র ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব ছিল, তাই তারা পুলিশের আদলে একটি বাহিনী দাঁড় করিয়ে নিয়েছিল, যারা ভয়ভীতি দেখিয়ে জনগণকে তাদের পক্ষে ধরে রাখবে এবং তাদের মান-সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তারা এই বাহিনীটির নৈতিক প্রশিক্ষণ থেকেই বিমুখ থাকেনি, বরং তাকে নৈতিকতার বিপরীতে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং এমন একটা চরিত্রকে সফলতার মানদণ্ড স্থির করে দিয়েছিল, যাকে প্রত্যেক ভদ্র ও সম্মানিত মানুষ ভয় করে চলে।

কিন্তু এখন খোদ ভারতীয় লোকেরাই দেশটির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এখন তো আর বিদেশ থেকে এসে কেউ আমাদের শাসন করে না। কাজেই এখন এদের মানবীয় নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। এদের মাঝে সেবা, সহযোগিতা ও সমবেদনার মানসিকতা ও চেতনা তৈরি করা আবশ্যক। দেশের পুলিশ বাহিনীকে একটি ভদ্র, জনদরদী ও আপন দেশের জনগণের সেবকরূপে তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে তাদের ব্যাপারে জনগণের ধারণা ও মূল্যায়ন বদলে যায় এবং তাদেরকে নিজেদের পাহারাদার ও সহযোগী মনে করে। তাদের মাঝে এমন চরিত্র গড়ে তোলা দরকার, যাতে তারা

গোষ্ঠীকে আপন, কোনো গোষ্ঠীকে পর না ভেবে সবাইকে সমান ভাবতে শিখে। তারা কোনো অন্যায় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অপরাধের পক্ষ না নিয়ে বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত প্রাচীর গড়ে তোলে।

সেইসঙ্গে মুসলমানদের পার্সোনাল আইনে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ও এমন কোনো পদক্ষেপ বা আইন রচনা থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে, যাকে মুসলমানরা তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ ও ভারতের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার ও স্বাধীনতার হরণ মনে করতে বাধ্য হয়। রাজিব গান্ধীর শাসনামলে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষের ব্যাপারে দেশের সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছিল, যার প্রতিবাদে মুসলমানরা এমন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যার নজির ভারতের স্বাধীনতার পর এ-পর্যন্ত আর দেখা যায়নি। সেই পরিস্থিতিতে রাজিবজি বাস্তবসম্মত ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের দাবি ও চাহিদা অনুসারে পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে এমন একটি বিল পাশ করিয়েছিলেন, যেটি ছিল ইসলামি শরীয়তের পুরোপুরি অনুকূল এবং তাতে সুপ্রিম কোর্টের রায় রহিত হয়ে গিয়েছিল।

আপনার কাছে আমার নিষ্ঠাপূর্ণ আবেদন, আগামীতেও যেন কোনো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় এমন কোনো ভুল না হয়, যার ফলে ভারতের মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে।

অবশেষে আমি আপনাকে আবারও আদাব জানাচ্ছি। আপনার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আপনার একান্ত হিতকামী
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবি
লাখনৌ
১লা জুলাই ১৯৯১

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ও তুর্কিস্তানে পরিবর্তনের আভাস

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং এই আশাবাদ ও আলামত দেখা গেল যে, যে-তুর্কিস্তান আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারি, হেদায়ার রচয়িতা যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম মুরগিনানি ও সেলসেলায়ে নকশবন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ-এর মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের জন্ম দিয়েছিল, সেই দেশটি ফের স্বাধীনতার শ্বাস নিতে যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেস্টার-এর একটি ভাষণ

সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)-এর মিটিং থেকে অবসর হওয়ার পর (আমি যার সভাপতি আর মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে হাসান নদবি ব্যবস্থাপনা সদস্য) আমি ও আমার সফরসঙ্গী স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবিকে লেস্টারে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমরা ১৯৯১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ওখানকার একটি সমাবেশে – যেখানে বিপুলসংখ্যক আলেমে দীন, দাঈ ও গবেষক উপস্থিত ছিলেন – অংশগ্রহণ করি। কারী সাহেব তাঁর কেরাতে সূরা ইবরাহীম-এর এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা দেন? ভালো কথার উপমা ভালো একটা গাছের মতো, যার মূল সুদৃঢ় এবং যারা শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।)

মনে হলো, মহান আল্লাহ এই অযোগ্য বক্তার জন্য সরাসরি তাঁর পক্ষ থেকে এই আয়াতটি নির্বাচনের তাওফীক দান করলেন এবং আমি – যে কিনা শূন্যমস্তিষ্ক ছিল – বক্তৃতার জন্য উঁচু মানের একটি বিষয়বস্তু ও নির্দেশনা পেয়ে গেলাম। আমি প্রথমে আরবিতে এবং পরে উরদুতে এই আয়াতের আলোকে

বিস্তারিত আলোচনা করলাম, যার শিরোনাম ছিল 'সত্য দীন ও ইসলামের দাওয়াত একটি আকাশচুম্বী ও সতেজ বৃক্ষ'।

আল্লাহর এক অলীর মৃত্যু

৩রা রবিউছছানী ১৪১২ হিজরি, মোতাবেক ১২ অক্টোবর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। ভুপালে (যেখানে আমি রাবেতা আদাবে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদানের জন্য গিয়েছিলাম) হঠাৎ টেলিফোনে সংবাদ এল, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব ফুলপুরি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইনি হযরত মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদির সেলসেলার একজন পীর ছিলেন। ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি রূহানি ও দীনি শূন্যতা তৈরি হয়ে গেল, যা কিনা এই যোগ্যতার আকালযুগে পূরণ করা অনেক কঠিন হবে। অবশ্য পাশাপাশি মনে একটি প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তিও এল যে, এই সপ্তাহখানেক আগে আমি জনাকতক সঙ্গী-সাথীসহ এলাহাবাদ গিয়ে (যেখানে তিনি অবস্থানরত ছিলেন) তাঁকে দেখে এসেছি এবং হযরতের বিশেষ দু'আ ও দৃষ্টি দ্বারা ধন্য হয়েছি।[১]

ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা স্যাকুলারিজমের ওপরই অটুট থাকতে পারে

১৯৯১ সালের ৬ অক্টোবর 'মুসলিম ইন্‌টিলেকটিউয়্যাল্ ফোরাম'-এর ব্যবস্থাপনায় লাখনৌতে আমার সভাপতিত্বে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ভারতের বিমানমন্ত্রী মিস্টার মধু রাও সিন্ধিয়া অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানকার ভাষণে আমি স্যাকুলারিজমকে (অমুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র ভারতের প্রেক্ষাপটে) এমন একটি উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করেছি, যেটি সাপ-বিচ্ছু ও বিষাক্ত পোকামাকড়দের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আমি এক বিত্তশালী ব্যক্তির গল্প শুনিয়েছি যে, তার একটি সুবিশাল বাগান ছিল। মৃত্যুর সময় ছেলেকে অসিয়ত করে গেলেন, তুমি এই বাগানে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পার, যেকোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে পার। কিন্তু ওই গাছটা যথাস্থানে থাকতে দিয়ো। তিনি এর কোনো কারণ বর্ণনা করেননি।

---

১. মাওলানার জীবনচরিত ও যোগ্যতার ইতিবৃত্ত ও তাঁর রচিত গ্রন্থ 'এরফানে মহব্বত'-এর বিস্তারিত আলোচনা আমার গ্রন্থ 'পুরানে চেরাগ' তৃতীয় খণ্ডে দেখা যেতে পারে।

শীতের মওসুম এল। ফুলের গাছ ও চারাগুলোর পাতা ঝরে একদম ম্রিয়মান হয়ে গেল। ছেলে ঝেড়েমুছে সব পরিষ্কার করে ফেলল। ওই উদ্ভিদটিও উপড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গর্ত থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এল এবং তাকে দংশন করল। পরে জানা গেল, এই উদ্ভিদটির বৈশিষ্ট্যই ছিল, এটি যেখানে থাকে, সেখানে সাপ আসে না।

আমাদের দেশের ব্যাপারটিও ঠিক এ-রকমই। যদি স্যাকুলারিজমের উদ্ভিদটি এখান থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে উগ্রতা ও ধর্মীয় উন্মাদনার অজগর বেরিয়ে আসবে এবং সে কাউকেই কোনো খাতির করবে না।

আমি একথাও বলেছি যে, ইতিহাসকে উল্টো পথে হাঁটানো খুবই বিপজ্জনক হবে। ইতিহাস হলো একটা ঘুমন্ত সিংহ। যদি একে জাগিয়ে তোলা হয় আর যদি এ জেগে যায়, তাহলে দু-হাজার বছর পর্যন্ত আর কোনো দিকে তাকানোর ফোরসত পাওয়া যাবে না এবং সময়ে-সময়ে দেশে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেগুলো বিলুপ্ত করার কাজেই সমস্ত শক্তি ও দেশের সবটুকু উপাদান-উপকরণ শেষ হয়ে যাবে।

এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিস্টার গোলাম নবী আযাদ. মিস্টার সালমান খুরশিদ ও মধু রাও সিন্ধিয়াও আমার বক্তব্যের সমর্থনে বক্তৃতা করেছেন।

চার খলিফার ক্রমবিন্যাসে আল্লাহর হেকমত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর পদক্ষেপে উম্মতের জন্য নির্দেশনা

১৫ মুহাররম ১৪১২ হিজরি মোতাবেক ২৮ জুলাই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ লাখনৌর আবদুশ শাকুর হলে সেই সভাগুলোর সর্বশেষ অধিবেশন ছিল, যেগুলো প্রতি বছর মুহাররম মাসে 'শুহাদায়ে ইসলাম' শিরোনামে দারুল মুবাল্লিগীন লাখনৌ-এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আমি নিরপেক্ষ ইতিহাস অধ্যয়নের ফলাফল ও একটি নতুন ধারার চিন্তার আহ্বান উপস্থাপন করেছি। সেটি হলো, ইসলামের চার খলীফা যে-বিন্যাসে খেলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন, তা শুধু আকস্মিক ঘটনা কিংবা চেষ্টা-চাহিদার ফলাফল ছিল না। বরং সেটি ছিল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সুপরিকল্পিত বিন্যাসেরই প্রতিফলন। প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী খলীফা আপন-আপন সময়কার দাবি ও চাহিদাগুলো পূরণ করেছেন এবং ইসলামের হেফাযত,

ইসলামকে শক্তি জোগানো ও উম্মাহর নেতৃত্ব ও বিজয়ের সেই কীর্তিগুলোই তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন, যেগুলো সেসময়ে জরুরি ছিল এবং যার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সেই খলীফা-ই ছিলেন, যিনি তখন খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন এবং যার কোনো বিকল্প ছিল না।

তারপর হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর প্রত্যেকে যখন যে-পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিটি পদক্ষেপই উম্মাহর স্বার্থে ছিল এবং তাঁদের যাঁর-যাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের অনুকূল ছিল।

রাবেতা আদবে ইসলামীর সম্মেলন ভুপালে

রাবেতা আদবে ইসলামীর সপ্তম শিক্ষা আলোচনা সভা ৫-৭ রবিউছছানী মোতাবেক ১৩-১৫ অক্টোবর ১৯৯১ ভুপালে দারুল উলূম তাজুল মাসাজিদ-এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দাওয়াতি ও ইসলাহি সাহিত্য বিষয়ের ওপর ভুপাল, লাখনৌ, আলীগড়, দিল্লি, সুরাত, আওরঙ্গবাদ, কলিকাট, হায়দারাবাদ, এলাহাবাদ, বেনারস, পুনা ও নাগপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যকেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিবন্ধ পাঠ করেন। হেজায থেকে রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি হিসেবে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে নাসের আল-উবুদী এই সম্মেলনে অংশগ্রহেণর জন্য আগমন করেন। দারুল উলূম তাজুল মাসাজিদ-এর দায়িত্বশীল, শিক্ষকমণ্ডলী ও মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান খান সাহেব মরহুমের পরিবারের সম্মানিত সদস্যবর্গ যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন এবং সম্মেলনকে সফল করে তোলার কাজে পুরোপুরি চেষ্টা করেন।

আমি আমার ভাষণে اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ (তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা দেন? ভালো কথার উপমা ভালো একটা গাছের মতো, যার মূল সুদৃঢ় এবং যারা শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত) এই আয়াত দ্বারা দলিল প্রদান করে বলেছি, সাহিত্যের প্রশংসামূলক বিপ্লব, অসাধারণ ক্রিয়া ও স্থায়িত্বের জন্য দরদ, প্রস্তুতি, স্পৃহা ও নিষ্ঠা জরুরি। আমি বলেছি, কাব্যচর্চা হোক কিংবা ভাষণ, গ্রন্থ রচনা হোক কিংবা অন্য কোনো ধরনের সাহিত্য; এগুলোতে বাক্য তো খুবই পাওয়া যাবে; কিন্তু বাক্যের সঙ্গে 'তায়্যেবা' (ভালো) পাওয়া যাবে না। 'ভালো বাক্য'র উপমার জন্য জগতে অগণিত সৃষ্টি ছিল। কিন্তু পবিত্র কুরআন একে গাছের সঙ্গে উপমা দিয়ে এর ব্যাপক উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, যার ফলে বড়-বড় আলেমে দীন ও

সুস্থ চিন্তার মানুষ জন্ম নিয়েছেন এবং যতসব মন্দ, অজ্ঞতামূলক প্রথা-প্রচলনের অবসান ঘটেছে। আজও কালেমার ঘোষণা-ই আমাদের এখানে সমবেত করেছে। আর এটিই আমাদের জন্য সবচেয়ে শক্ত ও সুদৃঢ় বন্ধন।

আমি আরও বলেছি, আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি আছে, এ-যুগের দাঈদের জবান ও বয়ানের প্রয়োজন নেই। জবানের সংশোধনকে যারা পেশাদারি বিষয় ভেবে উপেক্ষা করেন, আমি তাদের উদ্দেশে হযরত হাসান বসরি, আবদুল কাদের জিলানি, শায়খ মুজাদ্দিদ সারহিন্দি শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরি প্রমুখের দৃষ্টান্ত উপস্থান করতে চাই।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী-প্রতিনিধিবর্গ এবং বিভিন্ন মাদরাসার ওস্তাদগণও যার-যার চিন্তাপ্রসূত সারগর্ভ নিবন্ধ পাঠ করেন। অবশেষে সভাপতির ভাষণে আমি বলেছি–

> 'এটিও ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ধাঁধা যে, যে-শ্রেণিটির সবচেয়ে বেশি সচেতন, উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, সেই শ্রেণিটিই চরম উদাসীনতা ও হীনম্মন্যতা প্রদর্শন করে নিজেকে বর্ণ ও নকশার মাঝে আটকে ফেলেছে। যে-লোকগুলোর হৃদয় ও বিবেক সৌন্দর্য ও যোগ্যতা দ্বারা সাজানো থাকার কথা ছিল, তারা-ই সাহিত্যকে গোটাকতক পরিভাষা আর সীমিত কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়েছে।'

ভুপালের রাবেতা আদবে ইসলামীর সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে আমি (কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, যাদের মাঝে রাবেতা আলমে ইসলামীর যুগ্ম মহাসচিব ও আমার পুরাতন বন্ধু শায়খ মুহাম্মাদ নাসের আল-উবুদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) অন্ধ্রর উদ্দেশে রওনা হলাম। এখানে আমার সুপ্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী, নদওয়াতুল উলামার সরকারী পরিচালক মৌলভী কাজী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদবির বাড়ি এবং এটি একটি ঐতিহাসিক নগরী। মৌলভী আবুল বারাকাত নদবি ফারুকির (যেসময় তিনি জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার ছাত্র ছিলেন আর উবুদি সাহেব ছিলেন ওখানকার রেজিস্টারার) তত্ত্বাবধানে একটি আরবি দ্বীনি মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছিল। উবুদি সাহেবকে এই মাদরাসাটি দেখানোর পরিকল্পনা ছিল আবার মন্ডু ভ্রমণ করানোরও ইচ্ছা ছিল, যেটি ভারতের সবচেয়ে বেশি সবুজ পাহাড় এবং ঐতিহাসিক ও ইসলামি স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চল, একটি প্রাচীন মুসলিম রাজ্যের (খিলজি

রাজাদের) রাজধানী, তরিকতের বেশ কটি ধারার বড়-বড় শায়খ, পীর ও আলেমের কেন্দ্র ছিল। আমাদের এই সফর আশানুরূপ আনন্দদায়ক ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

জামেয়া সালাফিয়া বেনারসের সীরাত কনফারেন্স

২৭ ও ২৮ অক্টোবর ১৯৯১ জামেয়া সালাফিয়া (মারকাযি দারুল উলূম) বেনারসের উদ্যোগে একটি সীরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি চিন্তা করলাম, এই কনফারেন্সে (সৌদি সরকার ও আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের সুবাদে) মিশর ও হেজায থেকে অনেক আলেমে দীন আগমন করবেন। ফলে আমি আমার নিবন্ধটি আরবিতে প্রস্তুত করলাম, যার শিরোনামের সারমর্ম ছিল, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার সবচেয়ে বড় কীর্তি ও তাঁর বিদ্যাগত ও বৈপ্লবিক বিশেষ প্রচেষ্টা হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির পরিচয় লাভ এবং দীনের গুঢ়তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম একমাত্র নবুওত। এ ছাড়া অন্য সকল উপায় ও উপকরণ সংশয়পূর্ণ ও অনুমাননির্ভর।

শায়খুল ইসলাম বড় একটি কাজের কথা বলেছেন, যার মূল্যায়ন দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণই করতে পারেন। তাহলো, ইউনানি দর্শনের অধিকতর জোর নেতিবাচকের ওপর। এই দর্শন যখন নেতিবাচকের আলোচনায় আসে, তখন বিস্তৃত ময়দান সামনে মেলে ধরে। আর যখন ইতিবাচকের আলোচনা ওঠে, তখন এক-দুটি শব্দ বলেই চুপ হয়ে যায়। আল্লাহর গুণাবলি ও কার্যাবলির ব্যাপারে তাদের এটাই দৃষ্টিভঙ্গি। জগতের সৃষ্টিকর্তা ইনি নন, ইনি নন, ইনি নন। তিনি কে এবং কেমন? এই প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হয়, তখন এখানে তারা এক-দুটি কথা বলেই থেমে যান। অথচ জীবন চলে ইতিবাচকের ওপর– নেতিবাচকের ওপর নয়। তার বিপরীতে আসমানি কিতাবাদি ও নবীদের বক্তব্যে নেতিবাচক হলো সংক্ষিপ্ত আর ইতিবাচক বিস্তারিত। নেতিবাচকের প্রসঙ্গ এল আর বলে দিল ليس كمثله شيئ (তাঁর মতো আর কোনো বস্তু নেই)। তার বিপরীতে পবিত্র কুরআন ইতিবাচক আলোচনায় পরিপূর্ণ। কুরআন বলেছে–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

'আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর নাম আছে; তাঁকে তোমরা এসব নামে ডাকো।'

আক্ষেপের বিষয় হলো, কিছু প্রতিবন্ধকতা আর সময়ের স্বল্পতার কারণে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন তুর্কি ও তাঁর সহকারী ওস্তাদ আবদুল হালীম আবীস ব্যতীত আর কোনো আরব স্কলার আসতে পারেননি। বেনারসের বিপুলসংখ্যক মুসলমানের অংশগ্রহণের কারণে রাতে আমি 'পয়ামে ইনসানিয়াতে'র ওপর একটি ভাষণ দিয়েছি, যেটি সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর দিল্লি সম্মেলন

২৩ ও ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর দশম বার্ষিক সম্মেলন জামেয়া নগর উখলাতে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আমি সুবিস্তৃত ভাষণ প্রদান করি, যেটি ছিল সভাপতির ভাষণ। এই ভাষণটি পরে আলাদা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাষণে আমি একক পারিবারিক আইনের প্রয়োজনীতার ওপর যেসব বাড়াবাড়ি চলছে এবং অদূরদর্শিতামূলক জোর দেওয়া হচ্ছে, তার সমালোচনা করেছি এবং এ বিষয়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইন বিশেষজ্ঞ বোর্ড হেমার-এর আইনদর্শনের একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ তুলে ধরেছি, যেটি প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট।

> 'কোনো আইনব্যবস্থার প্রতি, যার লক্ষ্য জীবনে সমতা সৃষ্টি করা; যদি জনগণের বড় একটি দলের মাঝে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি, তখন বিষয়টি সরকারের জন্য বিব্রতকর ও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জনগণ সেই আইন বেশি দিন সহ্য করতে পারে না, যাকে তারা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অসহনীয় মনে করে। যে-সরকার এরূপ আইনব্যবস্থাকে বহাল রাখতে হঠকারিতার আশ্রয় নেয়, তাকে এই আইন প্রয়োগ করতে অনেক সমস্যা ও কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়। এ-কারণেই যে-শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেটি অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।'

কর্নাটক সফর ও পয়ামে ইনসানিয়াতের দুটি সম্মেলন

কর্নাটক রাজ্যে ভটকল নামক স্থানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এটি অনেকগুলো দীনি, বংশগত, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে

গোটা এলাকায় বিশেষ মর্যাদার ধারক। সেখানে এখনও পর্যন্ত অনেকগুলো আরব বংশোদ্ভূত পরিবারের নানা বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট আছে। দীর্ঘদিন যাবত নদওয়াতুল উলামার পৃষ্ঠপোষকতায় জামেয়া ইসলামিয়া নামে সেখানে একটি দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে, যার সব কজন শিক্ষকই নদওয়াতুল উলামার ছাত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আমার বন্ধু মুহতারাম মুহিউদ্দীন মুনীরি সাহেব (যিনি বিগত দিনে বোম্বাইয়ের খাদেমুল হুজ্জাজ-এর একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন) এখন তার পরিচালক। আমি আমার একনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কবারই ওখানে সফর করেছি এবং ওখানে আমি যেসব ভাষণ প্রদান করেছি, সেগুলোর সংকলন আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯১ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে ওখানে আমাকে আবারও সফর করতে হলো। সে-সময় 'পয়ামে ইনসানিয়াত-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হলো। একটি নভেম্বরের ২৯ তারিখে ভটকলে, অপরটি ডিসেম্বরের ১ তারিখে মঙ্গেলোরে। এই দুটি সম্মেলনই বেশ সফল হয়। বিশেষ করে ভটকলের সম্মেলনে ব্যাপক লোকসমাগম ঘটে এবং এটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত হয়। স্থানীয় জনগণের বক্তব্য হলো, এখানে এর আগে কখনও কোনো সম্মেলনে এত অমুসলিম অংশগ্রহণ করেনি। ওখানকার সর্ববৃহৎ মন্দিরের পূজারি হেগরে মহারাজও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যারা আশ্রম থেকে খুব কমই বের হন। মানুষের ধারণা, এই সম্মেলনে পঞ্চাশ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেছে। আমার উরদু বয়ান আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে শোনানোর ফলে শ্রোতাদের মাঝে বেশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গেলোরের সম্মেলনে কৃষ্ণ মিশনের স্বামী ছাড়াও ক্যাথলিক ধারার জার্মান বংশোদ্ভূত পাদরি সাহেবও ছিলেন। পুরোটা হল শিক্ষিত, সমাজসচেতন ও সুশীল শ্রেণির লোকাদের দ্বারা কানায়-কানায় পরিপূর্ণ ছিল। বাইরের চত্বরটা পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল।

১৯৯২ সালের আগমন

এখান থেকেই ১৯৯২ সালের সূচনা, যেটি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে (বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য) ১৮৫৭ সালের সাথে মিল খায়। এ-বছর এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে, যেগুলো স্বাধীন, বহু ধর্ম ও নানা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিন্দুস্তানের পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহুসংখ্যক জটিল সমস্যা

তৈরি করবে, বিদেশে হিন্দুস্তানের নিরাপত্তা, আপসকামী চরিত্র এবং তার দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী নেতৃবৃন্দ এবং তার স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানিদের তৎপরতায় সন্দেহ সৃষ্টি করবে। পঞ্জিকার এই পাতাটি যখন উলটাই, তখন কানে পাতা উলটানোর হালকা আওয়াজের সাথে একটি অদৃশ্য গুঞ্জনও শুনতে পাই :

اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی

'এবার বুকে হাত দিয়ে বসে থাকো; পালা এবার আমার।'

মুরাদাবাদের ধর্মীয় শিক্ষা কনফারেন্স

১২ জানুয়ারি ১৯৯২ 'আনজুমানে তা'লীমাতে দীন মুরাদাবাদ'-এর উদ্যোগে একটি দীনি শিক্ষা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে আমি ছাড়াও (দীনি তা'লীমি কাউন্সিল-এর সভাপতিও আমি) মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়-এর প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর শ্রদ্ধেয় সাইয়িদ হামেদও অংশগ্রহণ করেছেন। আমি সভাপতির ছাপানো ভাষণটি আদ্যোপান্ত পাঠ করি। এই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মুরাদাবাদের বাসিন্দাদের মধ্যে মাদরাসায়ে আরাবিয়া মুরাদাবাদ-এর প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুআযুল ইসলাম সম্ভলি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ ইকরাম বারী সাহেবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনি তা'লীমি কাউন্সিল-এর সেক্রেটারি ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশি সে-সময় সৌদি আরব ছিলেন। সে-কারণে তিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

মসজিদে আকসার নির্বাসিত ইমামের দারুল উলূম আগমন

২২ শাবান ১৪১২ হিজরি; মোতাবেক ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ হঠাৎ জানতে পারলাম, মসজিদে আকসার সাবেক ইমাম ও খতীব এবং ফিলিস্তিনি আন্দোলনের সক্রিয় নেতা ডক্টর মুহাম্মাদ সিয়াম দারুল উলূম আসছেন। দারুল উলূমে তাঁকে তাঁর মর্যাদা অনুপাতে স্বাগত জানানো হলো। মুসলমানগণ দারুল উলূমের সুপরিসর মসজিদে পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মাগরিবের নামায আদায় করল। বিপুলসংখ্যক আমজনতার সমাবেশ ঘটে গেল। নামাযের পর তিনি জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমি বললাম, হযরতের এখানে আগমন ও এই মসজিদে নামায পড়া বাইতুল মুকাদ্দাসের বসন্ত ও রহমতের বাতাসের একটি ঝাপটা। ডক্টর সিয়াম অত্যন্ত

জোরালো কণ্ঠে ভাষণ দিলেন। তিনি ফিলিস্তিনি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। ফিলিস্তিন থেকে বহিস্কারের পর এখন তিনি সুদানে অবস্থান করছেন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

নামাযের আগে নদওয়াতুল উলামার সুবিশাল লনে রাবেতা আদবে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জবাবি ভাষণে তিনি আমাকে, সাইয়িদ কুতুব ও মাওলানা মওদুদীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং এদের চিন্তারীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন। তখন আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর (মক্কা মুআজ্জমার) হলে ইয়াসির আরাফাত-এর উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক যে-ভাষণটি দিয়েছিলাম, তার রেকর্ড শোনানো হয়। এই ভাষণে আমি জনাব আরাফাতকে সালাহুদ্দীন আইউবির মতো শুধু খাঁটি মুসলমানদের ওপর আস্থা রাখতে, ঈমানি চেতনা, শাহাদাতের বাসনা ও আল্লাহর বাণীর সমুন্নতির লক্ষ্যে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছি এবং বলেছি, শুধু এরই মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান ও মসজিদের আকসার পুনরুদ্ধার হতে পারে। আর এটি-ই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

'শত্রুর সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও, তা হলে তারাও তো কষ্ট পায় যেমন তোমরা কষ্ট পাও। অথচ, তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা রাখ, যার আশা তারা রাখে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১]

এই ভাষণের পর 'জমিয়াতুশ শুব্বানুল মুসলিমীন'-এর চেয়ারম্যান মৌলভী সাইয়িদ সালমান হুসাইনি নদবি স্বাগত ভাষণ দান করেন এবং মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে নদবির সম্মানিত অতিথিকে কতগুলো বই উপহার দেন।

সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিছ মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমির মৃত্যু

১১ রমযানুল মুবারক ১৪১২ হিজরি, ১৭ মার্চ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। এদিন হঠাৎ করে সুবিজ্ঞ মুহাদ্দিছ মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমি মৃত্যুর সংবাদ

১. *সূরা নিসা : ১০৪*

এল। শোকভাষণে আমি বলেছি, মাওলানার মৃত্যুতে দীনি শিক্ষায়; বিশেষ করে হাদীছশাস্ত্রে যে-বিরাট ক্ষতিটা হলো এবং যে-শূন্যতা তৈরি হলো, তার বাস্তবতা অন্য অনেকের তুলনায় আমি বেশি অনুভব করছি। কারণ, শুধু উপমহাদেশই নয়– আরববিশ্ব ও ইসলামের বিভিন্ন কেন্দ্রের দীনি শিক্ষাচর্চার ব্যাপারে আমার সম্যক ধারণা আছে এবং ওখানকার বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, লেখক ও গবেষকদের ব্যাপারে অনেকের চেয়ে আমার জানাশোনা বেশি। সারা বিশ্বে হাদীছশাস্ত্র যে-পরিমাণ অধঃপতনের শিকার এবং এই শাস্ত্রটির চর্চায় যে-ধস নেমে এসেছে, তা খুবই দুঃখজনক। এ-ক্ষেত্রে এমনিতেই শূন্যতা বিরাজ করছিল। মাওলানার মৃত্যুতে এই শূন্যতাটা আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে বিশুদ্ধ হাদীছ-বর্ণনা আর ফিক্‌হে হানাফীর মাঝে সমন্বয় সাধন, হানাফি মাযহাব হাদীছের খেলাফ নয় বলে প্রমাণ উপস্থাপন, ইমাম আবুহানীফা ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিছক অনুমান ও নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতেন না; বরং তাদের গবেষণার সূত্র ও উৎস ছিল কুরআন-হাদীছই; এবিষয়গুলোর প্রমাণ উপস্থাপনে মাওলানার দক্ষতা ছিল উপমাহীন। তাঁর মৃত্যুতে বিশেষ করে এ বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্যতা তৈরি হয়ে গেল। এই শূন্যতা পূরণ হওয়া বাহ্যিক বিচারে খুবই দুষ্কর মনে হচ্ছে।

বিহার ও নেপাল সফর

১৯৯২ সালের ১লা মার্চ ইমারাতে শারইয়্যাহ বিহার ও মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর আমন্ত্রণে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার তাফসীর ও হাদীছের ওস্তাদ মাওলানা বুরহানুদ্দীনের সঙ্গে পাটনা সফরে গেলাম। ওখানে ডক্টর আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের বাড়িতে অবস্থান নিলাম। এদিন পাটনার গান্ধী মাঠে 'সমাজ সংশোধন' বিষয়ের ওপর বিশাল এক জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। এই শিরোনামে এবং এই বিষয়ের ওপর এর আগে এত বড় কোনো সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। অন্তত ১৫-২০ হাজার লোকের সমাগম ঘটেছিল। জনতা গভীর মনোযোগসহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করে। এই সমাবেশে আমি, মাওলানা কাজী মুজাহিদুল ইসলাম ও মাওলানা বুরহানুদ্দীন বক্তৃতা করি।

পাটনা থেকে আসানসোল গেলাম। সেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সভায় ভাষণ দিলাম। তারপর সেখান থেকে লাখনৌ ফিরে এলাম।

১৯৯২ সালের ৩রা মে এবং ১৪১২ হিজরির শেষের দিকে খানকায়ে রহমানী মোঙ্গেরের জামেয়ার একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে যোগদানের

জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ অলী রহমানি সাহেবের আমন্ত্রণে এবং এই দীনি প্রতিষ্ঠানটির সাথে পুরনো সম্পর্কের সুবাদে মোঙ্গের যেতে হলো। সেখান থেকে অবসর হয়ে এক দিনের জন্য ভাগলপুরে মৌলভী শরফ আলী সাহেব নদবির বাড়িতে (সে-সময় তিনি হজে ছিলেন) অবস্থান নিলাম এবং ওখানে সমাজ সংশোধন বিষয়ের ওপর বিরাট একটি সমাবেশ এবং বিশিষ্টজনদের নিয়ে পয়ামে ইনসানিয়াতের একটি ঘরোয়া বৈঠকের প্রোগ্রাম ছিল। পরদিন নেপালের উদ্দেশে রওনা হলাম, যেখানে যিলকদের ১২ এবং মের ৫ তারিখে দারুল উলূম নূরুল ইসলাম জলপাপুরের এক সমাবেশে যোগদানের কথা। মাদরাসাটি জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শিক্ষা সমাপণকারী মৌলভী আউয়ুব সাহেব অপরাপর কয়েকজন নদবি আলেম (মৌলভী আব্বাস নদবি ও মৌলভী হায়দার নদবি প্রমুখ)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে আমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও আশপাশের এলাকাগুলোর সর্বসাধারণের এক সমাবেশে ভাষণ প্রদান করি। আক্ষেপের ব্যাপার হলো, সময়ের স্বল্পতা, দেশের পরিস্থিতি ও নানা কারণে নেপালের আর কোনো জায়গায় আমার যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাত্র একটা রাত ওখানে অবস্থান করে পরদিনই কটিহারের পথে রেলযোগে লাখনৌ ফিরে এলাম। দারুল উলূম নূরুল ইসলাম-এ স্নেহাস্পদ মৌলভী কারী রশীদুল হাসান (মরহুম নবাব সাইয়িদ সিদ্দীকুল হাসান খানের নাতি)-এর ওপর আমার চোখ পড়ে, যে কিনা আগেই করাচি থেকে এখানে এসে অবস্থান করছিল।

মাওলানা মুহাম্মাদ শামীম মক্কির মৃত্যু

মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমির মৃত্যুর দিনকতক আগে ১৪১২ হিজরির শাবান মাসের শেষের দিকে খুবসম্ভব ১৯৯২ সালের ১ লা মার্চ আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেটা হলো মাদরাসা সাওলাতিয়া, মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব কিরানবির বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ মাওলানা মুহাম্মাদ সালীম সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ শামীম মক্কির মৃত্যুর ঘটনা। আমি তখন পাটনায় ছিলাম। ওখান থেকেই আমি শোকবার্তার তার পাঠিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়গুলো, তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল। মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন এবং মাদরাসাটিকে সব ধরনের সমস্যা ও আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

নবাব উবায়দুর রহমান খান শেরওয়ানির মৃত্যু

১৯৯২ সালের ৫ কিংবা ৭ মে হঠাৎ শ্রদ্ধেয় নবাব উবায়দুর রহমান খান শেরওয়ানির মৃতুর সংবাদ এল। মনে হলো, নিজেরই পরিবারের একজন মমতাময় ও মুরুব্বিস্থানীয় বুযুর্গ ব্যক্তির ইহলোক ত্যাগের ঘটনা ঘটে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পিতা কালের গৌরব নবাব সদর ইয়ার জঙ্গ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানির কথা মনে পড়ে হৃদয়ের মাঝে যেন হুল ফোটাতে লাগল। তাঁর বহুমুখী যোগ্যতা, স্নেহ-মমতা, নদওয়াতুল উলামা ও আব্বাজি মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই সাহেবের সঙ্গে তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ও সুভদ্রোচিত সম্পর্ক এবং নদওয়া ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাগত, শিক্ষাগত ও আত্মিক সম্পর্কের স্মৃতিগুলো যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠেছিল। নবাব উবায়দুর রহমান খান শেরওয়ানি এই সম্পর্কগুলোকে বুকের সঙ্গে আগলে রেখেছিলেন। আপন পিতারই মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে, তার সেবকদের সাথে; বিশেষ করে আমার সাথে পরিবারের একজন মুরুব্বীর মতো সম্পর্ক রেখেছেন। দারুল মুসান্নিফীন আজমগড় ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজের মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা করতেন। আমি যখনই আলীগড় যেতাম, সব সময় হাবীব মনযিলে (নবাব সাহেবের বাড়ি) উপস্থিত হলে নিজেকে খুবই প্রীত ও ধন্য মনে হতো এবং পুরনো স্মৃতিগুলো তাজা হতো। মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং তাঁর পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যগুলো অটুট রাখুন।

একই সময়ে আমার একনিষ্ঠ বন্ধু স্বনামধন্য আরবি কবি, কবিতার ভাষায় আল্লাহর রাসূলের গুণকীর্তনকারী ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী পরম শ্রদ্ধেয় ওমর বাহাউদ্দীন আল-আমীরীও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধিকবার লাখনৌও এসেছিলেন এবং এখানে, মদীনায় ও রিয়াদে রাবেতা আদবে ইসলামীর বিভিন্ন প্রোগ্রামে পরম আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।

একটি সম্মাননা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ

আমি আমার নিজবাড়ি বেরেলিতে ছিলাম। এ সময় ১৯৯২ সালের জানুয়ারির ২০ অথবা ২১ তারিখে ডেপুটি কমিশনারের এক চাপরাশি ঈশার নামাযের সময় এসে আমাকে জানাল, প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি আমাদের এখানে আসবার কষ্টটুকু

স্বীকার করুন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। সময়টা ছিল রাত। আমার কিছু ওজরও ছিল। আমি বললাম, কাল নটার সময় আসতে পারব। এখন যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরদিন ওখান থেকে আর কোনো সংবাদ এল না।

তার দু-তিন দিন পর ২৪ তারিখে আমি কানপুর গেলাম। ওখানে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিতব্য একটি পত্রিকার উদ্বোধনি সভায় অংশগ্রহণের কথা ছিল। সভা দিনের বেলা শহরের একটি হলে অনুষ্ঠিত হলো এবং পত্রিকার অফিসে রাতের খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। হঠাৎ ওখানে শহরের পুলিশ অফিসারের পক্ষ থেকে একব্যক্তি এসে বলল, প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করুন। আমাদের মেজবান বললেন, আপনি বলে দিন, আমাদের এখানে টেলিফোন আছে; আলাপ এখানে বসেই হতে পারে। বাহককে তা-ই বলে দেওয়া হলো এবং টেলিফোন নম্বরও দিয়ে দেওয়া হলো। মিনিটকয়েক পরই প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন এল। তিনি বললেন, সরকার আপনাকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করতে চাচ্ছে; আপনি এটি গ্রহণ করে নিন। এতে সরকারের রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ নেই। উত্তরে আমি বললাম, এ-ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এটি আমার নীতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কথাটি তিনি পরম শ্রদ্ধা ও ভদ্রতার সাথে কয়েকবারই পুনর্বক্ত করলেন। কিন্তু আমি প্রতিবারই একই উত্তর দিলাম। অবশেষে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং টেলিফোন লাইন কেটে গেল।[১]

এত্তেহাদে মিল্লাত কনফারেন্স বোম্বাইয়ে অংশগ্রহণ

লাখনৌ-এর এক বৈঠকে মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম সাহেব এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করলেন, যেটি মুসলমানদের যেসব জাতীয় সমস্যা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোকে সরকারের সামনে উপস্থাপন করে সমাধান বের করে আনতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া উদ্ভূত জাতীয় সমস্যাবলির মোকাবেলার দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায়, তারা এই সংগঠনের ব্যানারে সেগুলোকে অত্যন্ত কার্যকররূপে এমনভাবে জাতির সম্মুখে পেশ করবেন যে, তাকে জাতির ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ, তার প্রকৃত চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব মনে করা হবে। সর্বোপরি এই সংগঠন সামগ্রিক নেতৃত্ব, নির্দেশনা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য

---

১. এর আগে চন্দ্রশেখরজিও তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এক পত্রের মাধ্যমে এই সম্মাননা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমিও পত্রের মাধ্যমেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, যেটি তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে মে মাসে দিল্লিতে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করলাম।

কারণ, মজলিসে মুশাওয়ারাতের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের ফলে আমি একটি শূন্যতা অনুভব করছিলাম। চিন্তা করলাম, আমরা বড়-বড় অনেকগুলো সমস্যায় জর্জরিত। দেখটাও বিশাল। আর পরিস্থিতিও দ্রুত পরিবর্তনশীল। এমতাবস্থায় কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। মনে চিন্তা এল, 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' আর এত্তেহাদে মিল্লাত কনফারেন্স' (যার ফলস্বরূপ মিল্লী কাউন্সিল' অস্তিত্বে এসেছে) এই দুটির মাঝে কোনো বৈপরীত্ব বা রাজনৈতিক বিরোধ হবে না। আমি তাতে অংশগ্রহণে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিলাম। তবে পরামর্শ দিলাম, এই কনফারেন্স দিল্লির পরিবর্তে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হোক। তা হলে অন্তর্নিহিত আবেদন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বেলায়ই নয়; স্থান ও অবস্থানের দিক থেকেও দুটি সংগঠনের মাঝে কোনো সংঘাত অনুভূত হবে না।

মুজাহিদুল ইসলাম সাহেব তাঁর বিশেষ সহকর্মী ডক্টর মনযুর আলম সাহেব ও অপরাপর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার পর আমার পরামর্শ গ্রহণ করে নিলেন এবং আমাকে একটি নির্দেশনামূলক ও মৌলিক নিবন্ধ লেখার ফরমায়েশ করলেন। আমি একটি শর্তে ফরমায়েশটি গ্রহণ করে নিলাম যে, এটি সভাপতির ভাষণ হবে না। আর আমিও সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারব না। কেননা, আমি মজলিসে মুশাওয়ারাতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। আর এখনও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করিনি। তারা আমার শর্তগুলো মেনে নিলেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯২ সালের ২৩ ও ২৪ মে 'এত্তেহাদে মিল্লাত কনফারেন্স' নামে বিশাল একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। আমি 'দেশ ও জাতি উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে' শিরোনামের নিবন্ধটি পাঠ করলাম। কিন্তু তার প্রধান শিরোনামে ভুলবশত 'সভাপতির ভাষণ' ছাপা হয়েছিল। আমি কাজী সাহেবকে বলে এটি প্রত্যাহার করিয়ে নিলাম। সভাপতির জন্য বাঙ্গালোরের আমীরে শরীয়ত ও জামেয়া সাবীলুর রাশাদ-এর মুহতামিম মুফতী আবুসসাউদ সাহেব নির্বাচিত হলেন। তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন।

এই নিবন্ধে আমি নীতিগত ও আত্মসমালোচনার ধারায় দেশ ও জাতি উভয়ের সমস্যা, শঙ্কা, দুর্বলতা অদূরদর্শিতার পরিসংখ্যান বের করার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও ইতিবাচক ধারায় পরামর্শ দিয়েছি।

ইউপিতে বিজেপি ক্ষমতার আসনে

১৯৯১ সালের ২৪ জুন ভারতীয় জনতা পার্টি (যাকে সংক্ষেপে 'বিজেপি' বলা হয়) নির্বাচনে জয়লাভ করে ইউপিতে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে, ইউপি প্রদেশটি তার নানা বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন ইতিহাস, অসাধারণ মেধা, স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ এবং নেতৃত্বের নানা যোগ্যতার ধারক-বাহক হওয়ার সুবাদে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১ সালে রাজিব গান্ধী ও চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত হিন্দুস্তানকে অনবরত প্রধানমন্ত্রী সরবরাহ করে আসছে এবং এখনও অবধি তার হিন্দুস্তানের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণ এবং তার ভবিষ্যৎ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ওপর প্রভাব বিস্তারের এক ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতা রয়েছে। এ-কারণেই এখানে কোনো দলের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সরকার পরিচালনা, মানসগঠন আইন প্রণয়নের মাধ্যমগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করার ঘটনাকে ভাসা চোখে দেখা হয় না এবং একে অন্য কোনো প্রদেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে তুলনা করা হয় না। এর দ্বারা দেশের বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও নতুন প্রজন্মের মান-মানসিকতার ওপর গভীর ও বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারের ভবিষদ্বাণী করা যেতে পারে। বিশেষ করে তখন, যখন ক্ষমতাসীন দলটির ভবিষ্যৎ, শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সংখ্যাগরিষ্টদের ধর্মের সমুন্নতি, নির্দেশনা, ধর্মীয় উপাসনালয় ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থানগুলোর ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা, বিশ্বাস, প্রত্যয় ও পরিকল্পনার ধারক হয়। যেমনটা বিজেপির নেতাদের ভাষণ-বক্তৃতা, ঘোষণাবলি, ম্যানিফেস্টো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়।

এ-কারণেই এই দলটির ক্ষমতায় আসাকে ভারতের কোনো প্রদেশে কোনো অ-কংগ্রেসি পার্টির নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসা ও সরকার গঠনের ওপর অনুমান করা যাবে না। যে-দেশে সরকার নির্বাচন দ্বার গড়ে আবার নির্বাচন দ্বারা-ই ভাঙে, সেই দেশে বিজেপির ক্ষমতায় আসাকে কোনো নিয়মের ঘটনা বা অন্তবর্তীকালীন ব্যাপার মনে করা যাবে না। একে একটিমাত্র প্রদেশ ইউপিতেই নয়; বরং গোটা দেশে একটা নতুন ঝড় এবং

একটি নতুন মানসিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা-ই ব্যাখ্যা করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ভূ-কাঁপানিয়া ঘটনাটি আলোচনায় আনবার আগে আমি সেইসব খুঁটিনাটি ঘটনা, বৈঠক, ভাষণ-বক্তৃতা, সফর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর আলোচনা উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করছি, যেগুলো ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল, যাতে এগুলো উত্তর প্রদেশ; বরং গোটা দেশের একটা নতুন ঝড় কিংবা ভূকম্পনের ছবি আঁকার কাজে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

বিজেপির ক্ষমতায় আসার আগে ইউপিতে মোলায়েম সিং ইয়াদুজি মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যিনি দলের নেতা ছিলেন। মোলায়েম সিং ইয়াদুজি ক্ষমতায় এসে যতগুলো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সবগুলোর সঙ্গে একমত যদি না-ও হই এবং তার কর্মকৌশল ও রাজনীতিতে প্রশ্ন তোলার সুযোগ যদিও বিদ্যমান, তারপরও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি অনেকগুলো প্রশংসনীয় ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে অযোধ্যার বাবরি মসজিদকে রক্ষা করা, তার ওপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ (তার মধ্যে সেনাবাহিনী ও পুলিশের মাধ্যমে তাদের আক্রমণ ও অভিযানকে ব্যর্থ করে দেওয়ার পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) এবং ইউপির বাইরে থেকে; বিশেষভাবে বিহারের দিক থেকে আসা আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার পদক্ষেপ, যেখানে তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদজিকে সহযোগিতা করেছিলেন। তারপর তিনি নিজের নানা ঘোষণা ও জনসভাগুলোতেও মসজিদটি যথাস্থানে বহাল থাকা এবং সংখ্যাগরিষ্টদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতার প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। অস্বীকার করা ঠিক হবে না যে, নিরেট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার থেকে কিছু অরাজনৈতিক কর্মকৌশল কিংবা আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কোনো নেতা কিংবা মুখ্যমন্ত্রী শতভাগ সঠিক কাজ করবেন এবং সময়ের দাবিগুলোকে কৌশলে পূরণ করে দেবেন এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, দীর্ঘদিন যাবত অন্তত উত্তরপ্রদেশ এমন মুক্তমনা, অসাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘুবৎসল মুখ্যমন্ত্রী পায়নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোলায়েম সিং ইয়াদুজি আর প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং-এর মাঝে যে-সহযোগিতা ও পারস্পরিক যে-আস্থা থাকা দরকার ছিল, তা (কিছু প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও দলগত

কারণে) গড়ে ওঠেনি। বাবরি মসজিদ ইস্যুতে ১৯৯০ সালে দিল্লিতে ভিপি সিং-এর সাথে আমার বৈঠক ও মতবিনিময় হয়েছিল। সেখানে আমি এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি এটা করব।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সমমনা চার নেতা– ভিপি সিংজি, চন্দ্রশেখরজি, লালুপ্রসাদ ও মোলায়েম সিংজির যা-যা করা দরকার ছিল, সেসব তারা করতে পারেননি। দরকার ছিল, সাম্প্রদায়িকতা, সহিংসতার ঝোঁক এবং আইনের মূলনীতির (গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অহিংসা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে-ঝড় উঠছিল, তাকে দমন করতে এবং দেশটিকে তার থেকে নিরাপদ রাখতে এই চার নেতা তাদের দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় তৈরি করে সুপরিকল্পিতভাবে পুরোপুরি সাহসিকতার সাথে মাঠে নামা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজেদের ও দলগুলোর খুঁটিনাটি বিরোধগুলোকে উপেক্ষা করে চলা। কিন্তু তাঁরা তা করতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতার এই ক্রম ধেয়ে আসা ঝড় ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্তকার সেই সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কীর্তিমালার ওপর পানি ছিটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল, যেগুলো স্বাধীনতার শীর্ষস্থানীয় বাস্তববাদী, দূরদর্শী ও নিঃস্বার্থ নেতারা আঞ্জাম দিয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নিতে পারত, যার ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অহিংসার নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার গণসম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, দলটি আন্দোলনের পরিবর্তে স্রেফ প্রশাসন পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। আমরা সবাই জানি, প্রশাসনের বিরুদ্ধে সব সময়ই অভিযোগ (যৌক্তিক বা অযৌক্তিক) থাকে। সে কোনো আন্দোলন, চিন্তার পরিবর্তন ও জনসাধারণের মন-মানস গঠনে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। তারই ফলে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বিজেপি ক্ষমতায় এল এবং সরকার গঠন করে নিল।

ক্ষমতায় আসার পরপরই বিজেপি উত্তর প্রদেশকে; বরং গোটা ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবে বলে বারবারই প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল। বলল, এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের শাসনতন্ত্র চলবে। শুধু তা-ই নয়; তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা এবং আরও সামনে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা দিল, পৌরানিকতাও তাদেরটাই অনুসৃত হবে। এর জন্য ভারতের একটি নতুন ইতিহাস রচনা করা হবে। সেখানে মুসলমানদের বহিরাগত হানাদার ও লুটেরা প্রমাণিত করা

হবে, যারা মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ইসলামি আইন চালু করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা বদলাতে হবে। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম ও তার হস্তলিপি হবে নিরেট হিন্দি। এক কথায় এই পুরো পরিকল্পনাকে আধুনিক পরিভাষায় 'কালচারাল জেনাসাইড' বা 'সাংস্কৃতিক গণহত্যা' দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিজেপির এই প্রত্যয় ও পরিকল্পনাগুলোর সত্যায়নের জন্য ১৯৯২ সালের জুনপরবর্তী নানা ঘোষণা, বিবৃতি ও নিবন্ধমালা পড়ে দেখতে হবে, যেগুলো সে-সময়কার ইংরেজি ও হিন্দি পত্র-পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে এবং রেডিও থেকে প্রচারিত হয়েছে। সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, মুসলমানদেরকে জাতীয় ধারার অংশ হয়ে থাকতে হবে। জাতপাতের রীতি বহাল থাকবে। এখানকার প্রাচীন সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বোধবিশ্বাসের কেন্দ্রগুলোকে সেই মর্যাদা দেওয়া হবে, যেটি তাদের আবহমান কাল থেকে অর্জিত ছিল।

এখানে আমি বিজেপির সেই চিংারীতি ও প্রত্যয়-পরিকল্পনার ধরন বোঝাতে কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

হিন্দু পুনর্জাগরণ ও ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানো, বহিরাগত জাতি-গোষ্ঠী এবং হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্যান্য সভ্যতার অনুসারীদের সাংস্কৃতিক গণহত্যার দর্শন ও পরিকল্পনা মূলত গুরু গল ওয়ালকারের শিক্ষা ও গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া। বিশ্বহিন্দুপরিষদ, বজরং দল ও ভারতীয় জনতা পার্টি এই দর্শন ও আন্দোলনে বিশ্বাসী।

গুরু গল ওয়ালকারের মতে ভারত চিরকালই হিন্দুরাষ্ট্র এবং একে হিন্দুরাষ্ট্রই থাকতে হবে। এই চিন্তার মাঝে একটা 'বহিঃশত্রু'র দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতি ঘৃণা ও তাকে মোকাবেলা করে চলার ভাবনা মৌলিকভাবে বিরাজমান। এই 'বহিঃশত্রুটা' হলো মুসলমান। তিনি বলেছেন :

> 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত শুধু হিন্দুদের রাষ্ট্র। যারা হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্ম, হিন্দুসভ্যতা ও ভাষার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না, তারা প্রকৃত জাতীয় জীবন থেকে আলাদা। যারা এই জিনিসগুলোর সাথে আন্তরিকতা রাখে না, তারা হয় বিশ্বাসঘাতক, নাহয় শত্রু, নাহয় বোকা।'

আরেক জায়গায় লিখেছেন :

'যে-সম্প্রদায় নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ না করবে, জাতীয় জীবনে তাদের কোনো জায়গা নেই।

১. স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে মূল ধারার সঙ্গে মিশে যাবে।

২. হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নেবে।

৩. তারা হিন্দুদের সংস্কৃতি লালন করবে।

৪. জাতীয় ভাষাকে বরণ করে নেবে।

৫. জাতীয় চরিত্রের সাথে একাকার হয়ে যেতে হবে।

যতক্ষণ-না কোনো সম্প্রদায় একাজগুলো করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিদেশি।'[১]

এর সঙ্গে শিবসেনার নেতা বাল থ্যাকারের বিভিন্ন ঘোষণা-বিবৃতিগুলোও সামনে রাখতে হবে, যেগুলো শুধু মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্টদেরই ওপর নয়; দেশের কট্টরপন্থী সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের ওপরও প্রভাব ফেলেছে। মহারাষ্ট্রের মুসলিমনিধন দাঙ্গাগুলোর সময়কার পরিস্থিতির দায় অনেকটা-ই তার ওপর বর্তায়।

বাল থ্যাকারের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কী? ১৯৮৪ সালের দাঙ্গা ও রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পর বাল থ্যাকারে বলেছিলেন :

'বিভক্তির পর ভারতের মালিক হলো হিন্দুরা। মুসলমানরা এদেশে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাগরিক। মুসলমানদের জন্য সম্মানজনক ব্যাপার হলো, ধর্ম পরিবর্তন করে তারা সবাই হিন্দু হয়ে যাক। অন্যথায় ক্ষমতা পেলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমি তাদের সোজা করে দেব।'[২]

'এই দেশটি হিন্দুদের রাষ্ট্র হওয়া উচিত। আমি এর বীজ বপণ করছি। আবার আমি এর ফসলও কাটব।'[৩]

মুসলমানদের বারবার লেজকাটা জীব নামে সম্বোধন করে বাল থ্যাকারে বলেছিলেন, 'এদের জনসংখ্যা ক্যান্সারের মতো বাড়ছে, যার একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন।'[৪]

---

১. *'ফ্রন্টলাইন' পৃ. ৪৫ : ১২ মার্চ ১৯৩৯ সংখ্যা*
২. *উরদু দৈনিক নাস্‌ক ও জেন্টলম্যান, বোম্বাই : মে ১৯৪৮*
৩. *ইন্ডিয়া টুডে : ১৫ জুন ১৯৮৪*
৪. *সানডে আবরোয : ২০ মে ১৯৮৪*

একটি রাস্তার নাম ছিল 'নার্গিস দত্ত'। তাতেও বাল থ্যাকারের ঘোর আপত্তি ছিল। ১৯৮৪ সালের ১৭ মে তিনি আগুনে তেল ছিটানোর মতো কাজ করেছিলেন।[১]

১৯৮৪ সালের ১৭ জুন যে-মিছিলটি বের করা হয়েছিল, তাতে উসকানিমূলক স্লোগানের সাথে একটা পোস্টারও ছিল। তাতে লেখা ছিল– 'হয় কুরআন ছাড়ো, নাহয় ভারত ছাড়ো।'

নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে বাল থ্যাকারের পক্ষ থেকে অল মহারাষ্ট্র শিবসেনা কনফারেন্স আহ্বান করেছিল। এই কনফারেন্সে শিবসেনা, হিন্দুসভা, হিন্দুসেনা ও একতা সম্মেলন সবাইকে নিয়ে হিন্দুমহাসিং নামে বৃহদাকারের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তখন থেকেই বাল থ্যাকারের তৎপরতা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাও রেকর্ডভুক্ত আছে যে, ১৯৭০ সালের দাঙ্গাগুলোর পর শিবসেনা ও জনতা পার্টির মিছিল-শোভাযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু বিসনত পটলের সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এবার বাল থ্যাকারে 'মহাজয়' নামে ব্যাপকাকারে একটি মিছিল বের করেন। তার পর থেকেই তার ওপর অধঃপতন নেমে আসে, যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

বিজেপি নিজের লক্ষ্য অর্জন, দলকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্টের মাঝে সুদৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য বানাতে অযোধ্যায় অবস্থিত বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে জায়গাটিকে মন্দির, রামের স্মৃতি ও জন্মস্থানে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাকে নিজেদের কার্যতালিকায় এক নম্বরে স্থান দেয়। একে একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত করে। শুধু জাতীয় দাবি-ই নয়; ভারতের আদি জাতি ও সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর মর্যাদার বিষয় বানিয়ে তোলে। এর জন্য তারা দেশ জুড়ে একটা জবরদস্ত আন্দোলন চালায়। ইউপির বাইরেও অন্যান্য রাজ্যগুলোতে ধর্মীয় উন্মাদনা; বরং ধর্মীয় ও জাতীয় আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তুলতে; বরং ক্ষেপিয়ে তুলতে একটি সুপরিকল্পিত ও জোরদার আন্দোলন চালায়, যার ফলে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সেই নির্মম, সহিংস ও সন্ত্রাসী ঘটনাটা ঘটে গেল, যেটা শুধু ভারতেই নয়, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় উন্মত্ততা ও সহিংসতার একটা উপমা, যার নজির বিগত কয়েকশো বছরে

---

১. *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ২১ মে ১৯৮৪*

কোনো রাষ্ট্র বা জাতির চরিত্রে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই ঘটনাটা সামনে যথাস্থানে যথানিয়মে আলেচিত হবে।

ইংল্যান্ড সফর, সেখানকার নানা ব্যস্ততা ও ভাষণ-বক্তৃতা

প্রতি বছরের কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 'সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ' অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা পরিষদের (আমি যার সভাপতি) বৈঠকে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে স্নেহাস্পদ সহকর্মী ও মারকাযে ইসলামীর সদস্য মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবিকে সাথে করে লন্ডন পৌঁছি। দিনটি ছিল সেপ্টেম্বরের ৭. তারিখ। সেখানে আমি সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিষদে, যেটি ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হলো (যেখানে আরব বিশ্ব ও অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব পরিষদের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের আলোচনা বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে বারবার এসেছে) আমি অংশগ্রহণ করি এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। সমস্যাবলির ওপর গভীর চিন্তাভাবনা হলো। আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি আনন্দদায়ক; বরং মর্যাদাজনক ও ঈমান-আলোকিত সুসংবাদ বেরিয়ে এল যে, অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ উজবেক সরকারের অনুমোদনক্রমে মুহাদ্দিছকূল শিরোমনি ইমাম বুখারির যথাযথ মর্যাদা অনুপাতে একটি স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। একাজের উদ্‌বোধনি অনুষ্ঠানে (যেটি কোনো একটি উপযুক্ত মওসুমে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে) সেন্টারের একটি প্রতিনিধিদল মারকাযের সভাপতি ও সদস্যবর্গের সঙ্গে যাবে এবং ইমাম বুখারির সর্বশেষ বিশ্রামাগারসংলগ্ন তাঁর মসজিদ ও মাদরাসার পুনঃচালুকরণ ও নির্মাণের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ইসলামি বিশ্বের বেশ কজন বিজ্ঞ স্থপতি দ্বারা নকশা তৈরি করানোর কাজ চলছে। অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার সে-সময় অন্য আরও কাজের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিল। একটি হলো ইসলামি ঐতিহাসিক মানচিত্র প্রস্তুতকরণ, অপরটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক ইসলামি ইতিহাস সংকলনের পরিকল্পনা।

সেন্টারের নানা ব্যস্ততা ও অনেকগুলো মিটিং-এ অংশগ্রহণের পর সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে পার্ক ফিল্ড লেস্টার শায়েরস্থ (ব্রিটেন) ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যেতে হলো, যেখানে বিগত বছরও যাওয়া হয়েছিল এবং যার লক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোধন ও স্থানান্তরের সময়ও তার দায়িত্বশীলগণ; বিশেষ করে ডক্টর খুরশিদ আহমাদ ও ডক্টর মানাযির আহসান সাহেবের তরফ থেকে ভারতে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি যেতে পারিনি।

এখন এই সুযোগে ওখানকার কয়েকজন সদস্য আমাকে নিতে অক্সফোর্ড এলেন। তারা শুধু আমাকে কেন্দ্র করে একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন, যেখানে গিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে হবে। সম্মেলনে লেস্টার শহর ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসে উপস্থিত হচ্ছেন।

আমি পৌঁছে দেখলাম, হল কানায়-কানায় পরিপূর্ণ এবং সেখানে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও ব্রিটেনে অবস্থানরত বহুসংখ্যক মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন আরব দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত আরব যুবক বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত রয়েছে। কিছুটা আমন্ত্রণকারীদের নিষ্ঠা, কিছুটা জায়গার গুরুত্ব ও কেন্দ্রিকতা, কিছুটা পণ্ডিতদের অংশগ্রহণ এবং সবার ওপরে আল্লাহর তাওফীক আমার অন্তঃকরণে একটি উন্মুক্ততার অবস্থা এবং মস্তিষ্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার খোরাক জাগানিয়া বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে দিল, যার ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত, যেটি আসার পথে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাথায় এসেছিল এবং মনে চিন্তা জেগেছিল, একে ভিত্তি বানিয়েই আজ ভাষণ দেব। আমি প্রথমে আরবিতে এবং পরে উরদুতে ভাষণ দিলাম। অবশেষে তার সারাংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনানো হলো। শ্রোতারা বেশ প্রভাবিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। সেই ভাষণটি আমি এখানে হুবহু তুলে ধরছি, যাতে দীর্ঘ সময় যাবত বিপুলসংখ্যক পাঠক ভাষণটি পাঠ করে উপকৃত হতে পারেন।

মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য ও তার বৈপ্লবিক প্রভাব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

সুধীমণ্ডলী!

আমি পবিত্র কুরআনের সামান্য একজন ছাত্র। আপনারা সবাই জানেন, কুরআন প্রত্যহ পাঠ করা হয় এবং তাওফীক অনুসারে বারবার এবং বেশি-বেশি পড়া হয়। নিয়ম হলো, মানুষ যখন কোনো বস্তুকে বিস্ময়ের সাথে দেখে এবং তার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন তার এই বিস্ময় চিরকাল থাকে না– তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে আমার নিজের অবস্থা বর্ণণা করছি যে, আমি যখন পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের এই আয়াতটি পাঠ করি

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

'...যদি তোমরা তা না কর, তা হলে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় নেমে আসবে।'

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেই মুহাজির ও আনসারদের সম্বোধন করেছেন, যাঁরা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন। যেসব মুহাজির মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল কয়েকশো। আপনারা জানেন, হিজরত কোনো হাসি-খেলা নয়। হিজরতে মানুষকে নিজের বাড়িঘর ত্যাগ করতে হয়, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে চলে যেতে হয় এবং সেসব সুযোগ-সুবিধাকে পরিত্যাগ করতে হয়, যেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে ও স্থানীয়ভাবে অর্জিত থাকে। বলা বাহুল্য, এই মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল নগণ্য ও সীমিত। আর যারা মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরও সংখ্যা তখনও পর্যন্ত বেশি ছিল না। হাদীছ অধ্যয়নে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তিনবার মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করিয়েছিলেন। প্রথমবার বেরিয়েছিল ৫০০। দ্বিতীয়বার ৬০০-৭০০। তৃতীয়বারের গণনায় মুসলমান পাওয়া গিয়েছিল ১৫০০। এই সংখ্যা নিয়েই মুসলমানরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন যে, এখন আমরা দেড় হাজার হয়ে গেছি! এখন আর আমাদের কীসের ভয়! আমরা তো সেই সময়টা দেখেছি, যখন আমরা একাকি নামায পড়তেও মনে দুশমনের ভয় থাকত।[১]

তার মানে এ-যাবত যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় মুসলমান দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন, আমাদের চার পাশে মানববসতির যে সমুদ্রটা ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে আমরা হেদায়েত ও তাবলীগের কাজ করব। আপনি অনুমান করতে পারবেন,

১. *সহীহ বুখারি, খণ্ড ২, জিহাদ অধ্যায়*

সারা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই এমন ছিল, যারা ইসলামের নামও কোনোদিন শোনেনি। তদুপরি সে-সময় পৃথিবীতে বড়-বড় এমন দুটি রাজ্য ছিল, যাদের মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যই বলতে হয়। শুধু সাম্রাজ্যই ছিল না। তারা শুধু প্রশাসন আর সরকারই ছিল না। সঙ্গে তাদের স্বতন্ত্র একটি সভ্যতাও ছিল, আলাদা একটি আদর্শও ছিল। এ দুটি সরকার প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে যে-অঞ্চলগুলোর অধিপতি ছিল, সেখানকার মানুষ তাদেরই থেকে সভ্যতা গ্রহণ করত, তাদেরই থেকে ফ্যাশন গ্রহণ করত, তাদেরই থেকে আইন গ্রহণ করত। রোমান আইনকে পৃথিবীতে কতখানি মর্যাদার চোখে দেখা হতো, সে আপনারা জানেন। ইরানি সভ্যতা ভারতবর্ষ এবং দূরদূরান্তের নানা দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুধীমণ্ডলী!

আমি যখন কুরআন পাঠ করতে-করতে এই আয়াতটিতে পৌঁছি, তখন সব সময়ই আমি বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি হয়ে যাই। ভাবতে শুরু করি, কথাটি আল্লাহ কাদের বলছেন? কখন বলছেন? কোথায় বলছেন? এই সর্বশেষ মুসলিমশুমারি, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০০ বেরিয়েছিল এটি কখন হয়েছিল? কোনো-কোনো মুহাদ্দিছ ও গবেষকের মতে এটি হয়েছিল অহুদ যুদ্ধের সময় তৃতীয় হিজরিতে। কারও-কারও মতে খন্দক যুদ্ধের সময় ৫ম হিজরিতে। তার মানে বড়জোর হিজরতের পাঁচ বছরের মাথায় এই শুমারির কাজটি হয়েছিল। তো তখন মুসলমান বড়জোর দেড় থেকে দুই হাজার ছিল, যাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে, কোমর বেঁধে মাঠে নামো এবং একটি ইউনিট তৈরি করো, যার ভিত্তি রচিত হবে ঈমানের ওপর, কুরআনের ওপর, নির্ভুল বিশ্বাসের ওপর এবং সেটি তৈরি হবে রাসূলের পৃষ্ঠপোষকতায়।

এই ঐক্য এজন্য গঠন করতে বলা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে তোমরা পৃথিবীতে ইসলামের বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে এবং

বিশ্বকে 'জাহেলিয়াত' (নিজের ইচ্ছামাফিক জীবন যাপন ও প্রবৃত্তির অনুসরণ)-এর জীনব থেকে বের করে ইসলামের (আল্লাহর অনুসরণ ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ) দাওয়াত দাও। যদি তা না কর, তা হলে দুনিয়াতে বড়-বড় ফেতনা ও মহাবিপর্যয় নেমে আসবে।

এই জায়গাটায় এসে আমি চিন্তা করি, যাদের বলা হচ্ছে, যাদের উদ্দেশ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তাঁদের মাঝে আর তাঁদের ওপর যে-কাজের, দুনিয়ার যে-জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য কী ছিল? কিন্তু ফারসিতে একটা বাগ্‌ধারা আছে। কথাটি আমি আরবিতেও ব্যক্ত করি। তা হলো بقامت کہتر و بقیمت بہتر (বকামত কাহ্‌তর ওয়া বকীমত বেহ্‌তর)। অর্থ হলো, উচ্চতায় বেঁটেখাটো; কিন্তু দামে সেরা। আমি আমার আরবি ভাষণে কথাটি এভাবে প্রকাশ করি لا العبرة بالقيمة بالقامة। কুরআনে আল্লাহ্‌পাক কথাটি যাদের উদ্দেশ করে বলেছেন, তাঁরা সাইজে বেঁটেখাট ছিলেন বটে; কিন্তু দামে ছিলেন অনেক মূল্যবান। দেখার বিষয় হলো মূল্য– উচ্চতা নয়। ফলাফলও দেখা গেল, এই খাট সাইজের দামি মানুষগুলো বিপ্লব সাধন করে ফেললেন। ইরানি সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভে গেল। শুধু সাম্রাজ্যের নয়– ইরানি সভ্যতার, আদর্শের, তার মাপকাঠির বাতিও নিভে গেল।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালের শেষ সময় পর্যন্ত এসে কিংবা বলা যায়, খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তি পর্যন্ত পৃথিবীর যে-অংশটি সভ্য ও উন্নয়নকামী মানুষদের জন্য নমুনা ও আদর্শ ছিল, সেটি বদলে গেল কিংবা ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন হতে থাকল। মাপকাঠি বদলে গেল। চিন্তার রীতি বদলে গেল। মানুষ ইরান ও রোমের মানসিক ও চিন্তানৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে শুরু করল। তারা আর সভ্যতা, উন্নতি ও মর্যাদার মাপকাঠি থাকল না। মানুষ আল্লাহর আইন ও সুন্নাতে নববীর অনুসরণ, নবীর যুগ ও তাঁর হাতে গড়া লোকদের সঙ্গে

সাদৃশ্য অবলম্বন, সভ্যতায়, সামাজিকতায়, স্বভাবে-আদর্শে, পোশাকে-পরিচ্ছদে তাঁদের অনুকরণকে প্রশংসা ও মর্যাদার বিষয় মনে করতে শুরু করল। তার অনেক দৃষ্টান্ত আপনি বড়-বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতাসীন লোকদের জীবনে ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোকে পাবেন।

আপনারা জানেন, মানুষের জীবনের উপকরণ সহজে পরিবর্তনশীল। সভ্যতার ধরনও সব সময় এক রকম থাকে না। কিন্তু মর্যাদা ও অমর্যাদা, শিক্ষা ও মূর্খতার মানদণ্ড ও লক্ষণাদি বদলায় অনেক দেরিতে এবং অনেক কষ্টে। এ কাজে অনেক সময় কয়েক বছর সময়ও লেগে যায়। আপনি যদি মানবীয় সভ্যতার ইতিহাস পড়েন, তা হলে জানতে পারবেন, কোনো-কোনো পাল্লা শতাব্দির-পর-শতাব্দি পর্যন্ত রাজত্ব চালাতে থাকে। কিন্তু এখানে চিন্তার রীতি বদলে গেল। কোনো কাজ করা আলাদা বিষয়। করার ক্ষেত্রে অনেক তাড়াতাড়ি পরিবর্তন চলে আসে। কিন্তু চিন্তার রীতি অনেক বড় শক্তি। এটিই জীবনের ওপর শাসন চালায়। আমরাও অনেক ইসলামি রাষ্ট্রে দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমা শাসন ও সভ্যতার প্রভাবের পাল্লা বদলায়নি। পাল্লায় যা-কিছু পরিমাপ করা হয়, সেগুলো বদলে গেছে; কিন্তু পাল্লা বদলায়নি। মর্যাদা, সভ্যতা, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, শিক্ষা, মূর্খতা, উন্নতি, অবনতির মাপকাঠি সেটি-ই রয়ে গেছে, যেটি বহিরাগত শাসক গোষ্ঠীগুলো ও ভিনদেশি সভ্যতা দান করেছিল।

এবার এই বাস্তবতাগুলোর আলোকে দেখুন, কাদের ওপর এবং কোন সময়টায় সারা বিশ্বে বিপ্লব সাধনের, তাকে আল্লাহকে মানার, ভয় করার, মানুষকে ভালোবাসার, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার, ত্যাগের জীবন অবলম্বনের ও আল্লাহর দেখানো পথে চলার ও চালানোর বিশ্বজনীন দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। আরও দেখুন, এ-দায়িত্ব পালনে এবং এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে এই বেঁটেখাট মহামূল্যবান মানুষগুলো কত বড় সফলতা অর্জন করেছেন।

এবিষয়ে জানতে আপনি ষষ্ঠ খ্রিস্টসনের পর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।

সুধীমণ্ডলী!

আমি আপনাদের এজন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, আপনারা এই কেন্দ্রটি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গাটা বেশ উপযুক্তই নির্বাচন করেছেন। আপনারা এখানে পশ্চিমা সভ্যতার বুকের ওপর বসে গেছেন। এখান থেকে কিংবা বড় কোনো পশ্চিমা রাষ্ট্র বা পশ্চিমা সভ্যতার বড়সড় কোনো কেন্দ্র থেকে যদি বিপ্লব শুরু হয়, তা হলে এটি শক্তিতে, গভীরতায়, প্রশস্ততায় ও কলেবরে হিসাবে আসবার মতো একটি প্রতিষ্ঠান হবে। আল্লাহ্ করুন সেই দিনটি যেন আসে যে, এসব দেশেও মানুষের মাঝে সত্যের অন্বেষণ ও নিজের জীবনের শূন্যতার অনুভূতি জাগ্রত হয় আর তারা বলে, আপনারা আমাদের এই অন্ধকারের জীবন, প্রবৃত্তিপূজার জীবন ও হীনম্মন্যতার জীবন থেকে বের করে নিন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখতে হবে। তা হলো, পবিত্র কুরআনে অন্ধকারের জন্য প্রায় জায়গায় বহুবচন শব্দ 'জুলুমাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আর আলোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একবচন 'নূর'। যেমন– يخرجهم من الظلمات الى النور ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল, অন্ধকার বেশুমার আর আলো মাত্র একটি। কাজেই যেন বলতে শুরু করে, আমাদের এই নানাবিধ অন্ধকার থেকে বের করে এক আলোর পথে নিয়ে যাও। যেন তারা বলতে বাধ্য হয়, আলো শুধু আপনাদেরই এখানে পেতে পারি।

এ বিষয়টি তখনই অর্জিত হবে, যখন আপনার জীবন ও চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য থাকবে। একটি ঘটনা আমি অক্সফোর্ড জামে মসজিদের বড় এক মজমায় শুনিয়েছিলাম। এখন আপনাদেরও শোনাচ্ছি। কারণ, ঘটনাটি যখনই বলি, প্রতিবারই নতুন-নতুন স্বাদ অনুভব করি। হযরত আহমাদ শহীদ (রহ.) পেশোয়ার জয় করলেন।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। মুজাহিদ বাহিনী ওখানে পড়ে রইল। এক পাঠান এক ভারতীয় মুজাহিদের হাত ধরে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি তার ঠিকঠিক উত্তর দেবে। মুজাহিদ বললেন, ঠিক আছে বলো; জানা থাকলে আমি সঠিক উত্তরই দেব। তোমরা ভারতীয়দের চোখের দূরের পাওয়ার দুর্বল হয় নাকি? তোমরা কি দূরের জিনিস দেখতে পাও না? মুজাহিদ বললেন, না; তোমার এই ধারণা তো ঠিক নয়। আমরা তো দূরের জিনিসও দেখতে পাই! তুমি দূরের কোন জিনিসটার কথা বলবে বলো; আমি বলে দেব সেটা কী। পাঠান বলল, না; ব্যাপার একটা অবশ্যই আছে। ভারতীয়দের চোখের দূরের দৃষ্টিশক্তিতে জন্মগতভাবেই কোনো ত্রুটি আছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। মুজাহিদ বললেন, খুলে বলো তোমার সমস্যাটা কী। একথা কেন বলছ? পাঠান বলল, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনারা কয়েক সপ্তাহ যাবত এখানে পড়ে রয়েছেন। আর এটা ঠিক যে, ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছেন হয়তোবা কয়েক বছর হয়ে গেছে। আপনাদের অনেকে বিবাহিত। অনেকে আবার বিবাহযোগ্য যুবক। কিন্তু আপনাদের একজন লোককেও কোনো ভিন নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাতে দেখলাম না। একজন দুজনের না হয় এই শখ না থাকতে পারে; কিন্তু এই একরকম হলে কী করে? ওদিকে যৌবন আর এদিকে সৌন্দর্য। কিন্তু কারুরই চোখ তুলে তাকানোর খবর নেই!

এবার ভারতীয় মুজাহিদ উত্তর দিলেন, আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিশক্তি একদম ঠিক আছে। কিন্তু আমরা কুরআনের অনুসারী। আর কুরআনের শিক্ষা হলো :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত করে। এটি-ই

তাদের জন্য শ্রেষ্টতম পবিত্রতা। তারা যা-কিছু করে, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[১]

তা ছাড়া এটি আমাদের নেতার প্রশিক্ষণেরও সুফল।

এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিম্নলিখিত আয়াতটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তা হলে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করবেন, তোমাদের পাপগুলো মুছে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।'[২]

এই দেশে অবস্থান করে যদি আপনি জীবনের একটি নতুন মডেল, একটি নতুন কাঠামো, নতুন নমুনা উপস্থাপন করেন, যেখানে এখানকার জীবন, সমাজরীতি, প্রবৃত্তিপূজা, বিত্তপূজা ও সব ধরনের বল্গাহীনতা থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাবে, তা হলে মানুষের মাঝে ইসলাম অধ্যয়নের আগ্রহ তৈরি হবে। তারা আপনাদের এখানে আসবে এবং বলবে, আমাকে একটি বই দিন, যেটি পড়ে আমি বুঝতে পারব এই বিপ্লবের উৎস কোথায়। কোথা থেকে এই পরিবর্তন এল এবং আপনাদের মাঝে এই স্বাতন্ত্র্য কীভাবে জন্ম নিল।

আমি আপনাদের অনেক-অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা আমাকে ও আমার সহকর্মীদের অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। বিশেষ করে আমি ডক্টর খোরদেশ আহমাদ সাহেব, মানাযির আহসান সাহেব, এই প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্বশীল ও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমাদের সঙ্গে শুধু ভ্রাতৃত্বমূলকই নয়; অত্যন্ত

---

১. *সূরা নূর : আয়াত ৩০*

২. *সূরা আনফাল : আয়াত ২৯*

সম্মানজনক ও উদার ব্যবহার দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাওফীক দিন, যেন এই প্রতিষ্ঠানটি বেশি-বেশি হেদায়াত ও মানবতার উপকারের উৎসে পরিণত হয়। আল্লাহ যেন আমাদের সেই দিনটি দেখান, যেদিন এখান থেকে ঈমানের, সচ্চরিত্রের, মানবতার, ভদ্রতার ও হেদায়াতের বায়ু প্রবাহিত হবে।

'ইসলামিক সেন্টার লন্ডন'-এ ভাষণ

লেস্টার থেকে লন্ডন গেলাম। ওখানকার বিখ্যাত ও প্রাচীন ইসলামিক সেন্টার-এর পক্ষ থেকে (যেটি রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত এবং মিশরি পণ্ডিতবর্গ ও ব্যাবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত। এর আগেও আমি ওখানে এক-দুবার বক্তৃতা করেছি) আমন্ত্রণ জানানো হলো। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, উপস্থিতি ও শ্রোতাদের বেশিরভাগই শিক্ষিত আরব যুবক। তাই আমি ভাষণ আরবিতেই দেব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিন আমি যে-ভাষণটি দিয়েছিলাম, তার শিরোনাম ছিল 'অনৈসলামিক সভ্যতা ও শাসনের কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানকারী মুসলমানদের দায়িত্ব'। ওখানকার পরিস্থিতি অনুপাতে বিষয়টি খুবই যুৎসই ছিল। সেই ভাষণটিও আমি এখানে হুবহু তুলে ধরলাম।

অনৈসলামিক সভ্যতা ও শাসনের কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানকারী মুসলমানদের দায়িত্ব

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

এমন একটি দেশে, যেখানে ইসলাম একটি শাসিত ধর্মের মর্যাদা রাখে, পশ্চিমা সভ্যতা ও অনৈসলামিক সমাজরীতির প্রাধান্য বিরাজমান, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর রাজনৈতিক নেতাদেরই সব কিছু মনে করা হয়, যৌনতাকে একটা দর্শনের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড, স্বভাব-চরিত্র ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য এই যৌনতাকেই মনে করা হয়; এমন একটি দেশে মুসলমানদের (যখন তারা এখানে সংখ্যায়ও লঘু) অনেক নাজুক দায়িত্ব রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন হলো, তাদের মাঝে অটল ঈমান থাকতে হবে, সাহসী চরিত্র থাকতে হবে

এবং পুরোপুরি কৌশলে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি তাদের মাঝে সেই পয়গাম ও দাওয়াতের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে, যার দ্বারা আল্লাহ তাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আবার তাদের জন্য এটিও জরুরি যে, তাদের একটি উন্নত মানদণ্ড থাকতে হবে এবং তারা হীনম্মন্যতার শিকার হতে পারবে না। যদি তারা উন্নত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়, তা হলে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজের সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এবং পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারী ও তার উচ্ছিষ্টভোগী হিসেবে দেখবে। যদি এমনই হয়, তা হলে তারা কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না। মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং সমাজে কোনো বিপ্লব সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

আপনাদের সম্মুখে আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, যার দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানের চরিত্র কেমন হওয়া দরকার, তা-ও আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঘটনাটি যার, নিজের দাওয়াত ও বার্তার ওপর তার পুরোপুরি আস্থা ছিল এবং এই বাহ্যিক জাঁকজমক ও মনোহারী দৃশ্যাবলি তার চোখে ক্ষুদ্র পাথরখণ্ডের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। বাহ্যিক জাঁকজমক ও ভোগ-বিলাসের ওপর যারা জীবন দিয়ে দিত এবং জাহেলি জীবন যাপন করত, তাদের জন্য তার খুবই মায়া লাগত। এটি ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। উপদেশে ভরপুর ঘটনাটি আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়।

ইরানি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন রুস্তম, নিজের দক্ষতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে যাকে রাজার প্রায় সমকক্ষ মনে করা হতো। তিনি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন, আপনি এমন একজন লোক পাঠিয়ে দিন, যিনি যে-লক্ষ্যটি আরবের মরুচারী ও বেদুইনদের এই বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী সুসভ্য দেশগুলোতে নিয়ে

এল, যাদের সম্পর্কে আরবদের কোনোই ধারণা নেই, তার ব্যাখ্যা দেবেন।

চিন্তা করুন, যেলোকটি নেতৃত্ব ও ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট এবং একটি ভূখণ্ডের ওপর যার শাসন চলছে, সেই আরবদের ব্যাপারে তার ধারণা কী হতে পারে, যারা বাস করে তাঁবুতে কিংবা কাঁচা ঘরে, যাদের জীবন কাটে খেজুর আর উটের গোশত দ্বারা? তিনি কেমন অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের চোখে আরবদের দেখে থাকবেন? বলে পাঠালেন, এমন একজন পাঠিয়ে দাও, যে আমাকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাবে, তারা এখানে কেন এসেছে, কোন জিনিস তাদের এখানে ঠেলে পাঠিয়েছে।

ইসলাম সমস্ত আরবকে চিন্তা, বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও দীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর জন্য গর্ব করার একটি উন্নত মানদণ্ডে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এটি ইসলামের একটি অলৌকিক ব্যাপার। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) এর জন্য হযরত রিবয়ি ইবনে আমের (রাযি.)কে নির্বাচন করলেন। রিবয়ি ইবনে আমের একজন অখ্যাত-অপরিচিত সাহাবি। অধিকাংশ ইতিহাস ও সীরাতবিদ তাঁকে চেনেন না। বাহিনীতে তার তেমন কোনো পদ-পদবি বা কোনো স্বাতন্ত্র্যও ছিল না। কাহিনিটা আমি আপনাদের সামনে কোনো উপাখ্যান হিসেবে বর্ণনা করছি না যে, সাময়িকের জন্য কিছু স্বাদ জুগিয়ে হারিয়ে যাবে। ঘটনাটি আমি এজন্য উপস্থাপন করছি, যেন যে-শক্তিশালী ঈমান ও আস্থা ইরানি বাহিনীর সেনাপ্রধান রুস্তমের সামনে স্বাধীনভাবে এমন সাহসী বক্তব্য উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আপনারা সে-সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং একজন মুমিনের চরিত্র, সাহস, প্রত্যয় ও ঈমানি শক্তিকে পশ্চিমা সভ্যতা ও ক্ষমতার সাথে তুলনা করে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করে নিতে পারেন। এখানে আমরা নিজেদের সাথে, নিজেদের বার্তার সাথে, নিজেদের কর্তব্যের সাথে কীরূপ আচরণ করছি আর এখানে যে-পশ্চিমা সভ্যতার প্রচলন

রয়েছে এবং যাকে বর্তমানে সমকালীন বিশ্বে নেতৃত্ব অর্জিত আছে, তার প্রতি আমরা কোন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি।

হযরত রিবয়ি ইবনে আমের রুস্তমের দরবারে গেলেন। তাঁর পরিধানের পোশাক তালিলাগানো। সাথে সাধারণ একটা তরবারি আর একটা ঢাল। একটা সাধারণ খর্বকায় ঘোড়ার চড়ে গেলেন। এই অবস্থায়ই তিনি গালিচা মাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াটা বাঁধলেন। এবার পায়ে হেঁটে রুস্তমের দিকে যেতে শুরু করলেন। অস্ত্রগুলো তাঁর সঙ্গেই আছে। তিনি বর্মপরিহিত। মাথায় শিরস্ত্রাণ। প্রহরীরা পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, অস্ত্রগুলো রেখে যেতে হবে। রিবয়ি ইবনে আমের বললেন, আমি আপনা থেকে আসিনি। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদি এই অবস্থায় যেতে দাও তো যাব; নাহয় ফিরে যাচ্ছি। রুস্তম বললেন, ঠিক আছে; আসতে দাও। হযরত রিবয়ি ইবনে আমের (রাযি.) হাতের বর্শাটা দ্বারা গালিচার ওপর ঠুকতে-ঠুকতে এগিয়ে গেলেন। এতে গালিচাটা অনেক জায়গায় কেটে বা ফেটে গেল।

বিরয়ি ইবনে আমের (রাযি.) রুস্তমের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। রুস্তম জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আরবরা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে?

হযরত রিবয়ি সাহাবি ছিলেন। পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস তাঁর রক্তের সাথে মিশে ছিল। পরিপূর্ণ আস্থাশীলতা তাঁর স্নায়ুগুলোকে সুদৃঢ় বানিয়ে দিয়েছিল। কারণ, তাঁর ওপর যে-বিষয়গুলো কার্যকর ছিল, সেগুলো ছিল আসমানি কিতাব, সত্য নবুওত ও নিষ্কম্প বিশ্বাস। সাহস ছিল তাঁর পাহাড়ের মতো উঁচু। বললেন–

'আল্লাহ আমাদের এজন্য পাঠিয়েছেন, যেন আমরা বান্দাকে বান্দার গোলামি থেকে মহান আল্লাহর গোলামির দিকে বের করে আনি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসি, নানা ধর্মের নিপীড়ন থেকে বের করে ইসলামের সুবিচার দান করি।'

বন্ধুগণ! ইসলামের বার্তা, দাওয়াত ও তার মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত রিবয়ি ইবনে আমের (রাযি.) এই যে বলেছেন, "আল্লাহ আমাদের এজন্য পাঠিয়েছেন, যেন আমরা বান্দাকে বান্দার গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে বের করে আনি, নানা ধর্মের নিপীড়ন থেকে বের করে ইসলামের সুবিচার দান করি।" এর মাঝে আমি বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। কারণ, এটি তাঁর বিশ্বাসের কথা ছিল। কিন্তু এই যে তিনি বললেন, "যেন আমরা বান্দাকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ত তার দিকে নিয়ে আসি" এ বাক্যটির জন্য আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসা! যদি বলতেন, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে..., তা হলেও বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকত না। কারণ, এটি তো এমন একটি সত্য, এমন এক ট বাস্তবতা, যার ওপর প্রতিজন মুসলমানই বিশ্বাস রাখে

হযরত রিবয়ি (রাযি.)-এর এই ঘটনাটি ইসলামের প্রথম যুগের। আমি তাঁর এই বাক্যটির জন্য বিস্ময়ের সাগরে ডুবে যাই যে, তিনি বলেছেন, আমরা বান্দাকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে বের করে আনতে এসেছি। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, আমরা আমাদের প্রয়োজনে আসিনি। এই দেশগুলোর বিত্তবৈভবের লালসায় আপন ঘরবাড়ি ত্যাগ করে আসিনি। এখানে এসেছি আমরা তোমাদের প্রতি করুণা দেখাতে। নিজেদের মায়ায় আসিনি– এসেছি তোমাদের মায়ায়। আমরা তোমাদের সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্ত করতে এসেছি, যেখানে তোমরা সেই পাখিটির মতো জীবন যাপন করছ, যাকে কোনো একটি পিঞ্জরায় আটকে রাখা হয়েছে এবং দানা-পানিও সেখানেই দেওয়া হচ্ছে। কারণ, তোমরা তোমাদের অভ্যাস ও প্রয়োজনাদির গোলাম। তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির গোলাম। তোমরা প্রচলিত ফ্যাশনের পিছু ছাড়াতে পারছ না। একাকি জীবন

কাটানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তোমরা নিজেদের মর্জিমতো চলতে পারছ না। পায়ে-পায়ে তোমাদের চাকর-সেবকদের সহযোগিতা নিতে হয়। পাহারাদার-চৌকিদার ছাড়া তোমরা চলতে পার না। সহযোগী ব্যতীত কোনো কাজই তোমরা করতে পার না। এই বন্দিত্ব থেকে আমরা তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি।

ইরানসম্রাট ইয়াযদাগ্‌রদ যখন সিংহাসন ছেড়ে পলায়ন করলেন, তখন পথে একটা জায়গায় তার খুব পিপাসা লাগল। তিনি একটা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং পানি চাইলেন। দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ একটা গেলাসে করে তাকে পানি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, এই গেলাসে করে পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ কী? কারণটা হলো, তিনি সোনা-রুপার গেলাসে করে পানি পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইরানিদের তো অবস্থা ছিল, যদি বড় কেউ এক লাখ দেরহামের কম মূল্যের মুকুট পরত কিংবা তার আলিশান বাড়ি এবং বাড়ির আনুসঙ্গিক বিষয়াদি– যেমন হাউজ, ফোয়ারা, বাগান ইত্যাদি না থাকত, তা হলে তাকে তুচ্ছ নজরে দেখা হতো। ইতিহাসে এর ভুরিভুরি প্রমাণ বিদ্যমান।

যেন হযরত বিরয়ি (রাযি.) বলতে চেয়েছিলেন, তোমরা তোমাদের সেবকদের সেবক ও গোলামদের গোলাম। কারণ, তাদের তুলনায় তোমরা বেশি মুখাপেক্ষী। সেজন্য আমরা তোমাদের এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কারাগার থেকে বের করে প্রশস্ত ও মুক্ত পরিবেশে নিয়ে যেতে এসেছি। এখানে আমরা নিজেদের গরজে আসিনি। এতখানি দূরের এই কষ্টকর সফর আমরা তোমাদের প্রয়োজনে বরণ করে নিয়েছি। আমাদের জন্মভূমিতে আমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা নেই। ও তো মরুভূমি। আর মরুভূমি খুবই প্রশস্ত ও খোলামেলা হয়ে থাকে। তোমাদের এই অস্বাভাবিক জীবনের জন্য আমাদের মনে অস্থিরতা বিরাজ করছে, যার জন্য তোমরা পাগলপারা হয়ে আছ। এই অস্থিরতা-ই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। আমরা মনের

চাহিদা অনুযায়ী চলবার মতো মানুষ নই। আমরা বিশেষ কোনো পোশাক বা বেতন-ভাতার মুখাপেক্ষী নই। নই আমরা সেবক-চাকরদের কাছে ঠেকা। আমরা মরুভূমিতে স্বাধীন জীবন যাপন করার মতো মানুষ। যখন যা মিলে খাই আর শোকর করি।

আল্লাহ আমাদের এজন্য পাঠিয়েছেন, যেন তিনি যাকে চাইবেন, আমরা তাকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে এক আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসব। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে দুনিয়ার প্রশস্ততা মধ্যে নিয়ে আসব। আর ধর্মাধর্মের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুবিচার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেব। তোমরা তোমাদের ধর্মের নিপীড়নের শিকার হয়ে আছ, যার ফলে তোমরা নানা ধরনের বিপদে জর্জরিত। লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা তোমাদের ভাগ্যলিপি হয়ে আছে। শান্তি জিনিসটা কোনোদিনও তোমাদের কপালে জোটেনি।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

আমি কথা দীর্ঘ করতে চাই না। আপনাদের অনেক কাজ আছে, অনেক ব্যস্ততা আছে। কথা আমি সংক্ষেপেই শেষ করে দিচ্ছি। এখানে আপনারা কার্যকর ও মৌলিক ভূমিকা পালন করুন। নিজেদের জীবনগুলোকে আদর্শ জীবনরূপে গড়ে তুলুন। তা হলে আপনারা মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবেন। তখন মানুষের মনে এমনসব প্রশ্ন তৈরি হবে, যেগুলো তাদের ভাবতে বাধ্য করবে। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা তৈরি হবে। আপনারাও যদি পশ্চিমা সমাজরীতি গ্রহণ করে নেন, তা হলে তো আপনারাও তাদের অনুসারী হয়ে গেলেন এবং নিজেকে উঁচু মানদণ্ড থেকে নিচে ফেলে দিলেন। তখন আপনার ও এখানকার পশ্চিমা নাগরিকদের মাঝে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট রইল না। তখন আর আপনাকে দেখে কারও মনে ইসলামের ব্যাপারে কোনো কৌতূহল তৈরি হবে না, ইসলামকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। তাদের মনে আপনার প্রতি কোনো মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে না। আপনি অনুসরণীয় ও আদর্শ হতে পারলেন না।

কিন্তু যখন আপনি তাদের সামনে একটি অপরিচিত জীবনরীতি উপস্থাপন করবেন, তখন তাদের মনে একটি অনুসন্ধিৎসা তৈরি হবে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হবে, এই জীবনরীতি তুমি কোথা থেকে গ্রহণ করেছ? এই উন্নত স্বভাব-চরিত্র তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ? তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তখন আপনি তাদের হাতে এমন কিছু পুস্তিকা ধরিয়ে দেবেন, যেগুলোর মাধ্যমে তারা ইসলাম সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করবে। আপনি তাদের রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনচরিতের সাথে পরিচিত করে তুলুন। তাদের সেই পথ দেখান, যেপথে চলার মাধ্যমে আপনার মাঝে এই উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। তখন তারা আপনাকে মর্যাদা ও ভক্তির চোখে দেখতে শুরু করবে।

আমার মুসলমান ভাইয়েরা! এখানকার অধিবাসীবৃন্দ! আপনারা এমন একটি নমুনা পেশ করুন, যেটি অমুসলিমদের মাঝে ইসলামকে জানার ও বোঝার আগ্রহ তৈরি করে দেবে এবং সেই পথটি চেনার বাসনা সৃষ্টি করবে, যেপথে চলে আমরা এই জীবনরীতি, এই চিন্তারীতি লাভ করেছি। এটিই একমাত্র সেই বিপ্লবাত্মক পথ, যার ওপর চলে আপনি অমুসলিম দেশগুলোতে কার্যকর ও ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনি যদি তাদেরই রঙে রঞ্জিত হয়ে যান, তাদেরই জীবনরীতি অবলম্বন করেন, তা হলে আপনি কোনোদিনও প্রভাবক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবেন না। আপনার দ্বারা কোনো বিপ্লব সাধিত হবে না। যদি একশো বছর বা তারও বেশি সময় আপনি এখানে অবস্থান করেন, তবুও নয়।

অবশেষে আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা দীর্ঘ সময় যাবত মনোযোগসহকারে আমার ভাষণ শুনেছেন। যদি আমার দ্বারা কোনো বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তা হলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

জিয়াউর রহমান আনসারি সাহেবের মৃত্যু

সময়টা ছিল অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। সংবাদ এল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সরকারের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান সদস্য জনাব জিয়াউর রহমান আনসারি মারা গেছেন। ৮ অক্টোবর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে আমি তাঁর মৃত্যুকে একটা জাতীয় দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছি এবং বলেছি, তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায় মুসলিম পার্সোনাল ল বিবাদ অনেক শক্তি লাভ করেছিল। অন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যে-বিষয়টি তাঁকে অন্যান্য মুসলিম মন্ত্রীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল, সেটি হলো তাঁর বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, দীনি আত্মমর্যাদা ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, যে-গুণটি তাঁর শ্রেণিতে খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল।

মাওলানা আযাদের সাথে আনসারি সাহেবের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। মাওলানা আযাদের সাহিত্যের সুগভীর পাঠক ছিলেন তিনি। মাওলানা আযাদ মেমোরিয়াল একাডেমির পক্ষ থেকে লাখনৌতে মাওলানা আযাদ বিষয়ে যে-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আনসারি সাহেব পরম আগ্রহের সাথে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মাওলানার ব্যাপারে নিজের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেন। যে-রোগে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি অনেক কষ্ট ভোগ করেন। আল্লাহ যদি তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করেন, তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

হাকীম আবদুল কাবী দরিয়াবাদির মৃত্যু

হাকীম আবদুল কাবী দরিয়াবাদি স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত গবেষক মরহুম মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদির আপন ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। বয়সের স্বল্পতা, প্রতিবেশিত্ব, মাওলানার ব্যক্তিসত্তা ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্ক-ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারের সাথে নানা দিক থেকে যোগাগোগের সুবাদে হাকীম সাহেবের সঙ্গে আমার একটি ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাদের শায়খ ও ওস্তাদ মাওলানা খলীল ইবনে আরব (লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক)-এর পারিবারিক মাদরাসায় বিদ্যার্জনের জন্য আসতেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যেটি বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে এবং তিনি আমার বিশেষ বলয় ও বন্ধুশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। তারপর এই সম্পর্ক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু খবরটা

আমার কাছে পৌঁছল অনেক দেরিতে। ১৯৯২ সালের ১৬ অক্টোবর যখন তিনি বলরামপুর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেদিন তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মাদ হাশেম কুদওয়াই সাহেবের সাথে (মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের প্রাক্তন প্রফেসর ও রাজনীতি বিভাগের প্রধান ও রাজ্যসভার সদস্য) হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গেলাম। হাকীম সাহেব তখন অর্ধ-অচেতন অবস্থায় জীবন পার করছিলেন। লোকেরা বলল, এই অবস্থায়ও যখনই জিহ্বা সঞ্চালিত হয়, তখন তিনি কুরআন পাঠ করছেন বলে শোনা যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি দারুল উলূম এলাম। ঘণ্টাকতক পরই তাঁর মৃত্যুসংবাদ এল। আমি কষ্ট করে হলেও আমার এই পুরনো বন্ধুটির জানাযায় অংশগ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করলাম। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন।

রায়বেরেলিতে ইসলামি দাওয়াত ও চিন্তাবিষয়ক কনফারেন্স

১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসের ১৪, ১৫ ও ১৬ তারিখে রায়বেরেলিতে 'ইসলামি দাওয়াত ও চিন্তা' শিরোনামে মুহাম্মাদ ছানি হাসানি মেমোরিয়াল এডুকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বেশ কজন ভারতীয় ও আরব পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেন। আরব পণ্ডিতদের মাঝে শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাহরুস ইরাকি, জনাব আমীনুল কুজাত (ওমান ও জর্ডান) ডক্টর আবুদল হালীম আবীস রিয়াদ, জনাব আবদুল ফাত্তাহ সাঈদ আবুধাবী, আহমাদ ফাহমী যমযম মালয়শিয়া, মাওলানা বদরুল হাসান কাসেমি কুয়েত। ভারতীয় পণ্ডিতদের মাঝে মাওলানা আবদুল্লাহ মুগীছি ও মাওলানা আবদুল করীম পারিখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. উপমহাদেশ তথা পাক-ভারত-বাংলায় ইসলামি দাওয়াত ও তার পদ্ধতি।

২. আরব বিশ্বে ইসলামি দাওয়াত ও তার পদ্ধতি।

৩. আফ্রিকায় ইসলামি দাওয়াত ও তার পদ্ধতি।

৪. ইউরোপে ইসলামি দাওয়াত ও তার পদ্ধতি।

৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামি দাওয়াত ও তার পদ্ধতি।

কনফারেন্স অনুষ্ঠানের জায়গাটার পরিসর ছিল কম। শহরটাও ছোট। আয়োজনে জটিলতাও ছিল বেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আয়োজকদের প্রচেষ্টা ও কর্মব্যনিষ্ঠার কারণে খুবই সফল হয়, যার নজির অন্তত এই শহরের ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় রাবেতা আদবে ইসলামীর অষ্টম দোরোজা কনফারেন্স

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় 'চিঠিপত্রের শিষ্টাচার' শিরোনামে ১৭ নভেম্বর ১৯৯২ সালে কুতুবখানায়ে শিবলির সুপরিসর হলে রাবেতা আদবে ইসলামীর পক্ষ থেকে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক শ্রোতাসমাগমের ফলে হলটি কানায়-কানায় ভরে যায়। সেমিনারটি যদিও ছিল শিক্ষাবিষয়ক; কিন্তু পুরো সেমিনারের ওপর একটি রূহানি হালত বিরাজমান ছিল। ইসলামি বিশ্বের একাধিক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কলামিস্ট সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সেই সব কজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের নাম রায়বেরেলির 'ইসলামি দাওয়াত ও চিন্তা' শিরোনামের কনফারেন্সের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই বিশ্ব রাবেতা আদবে ইসলামীর শিক্ষাবিষয়ক দোরোজা আন্তর্জাতিক আলোচনাসভার উদ্বোধন হয় কুরআন তেলাওয়াত, আল্লামা ইকবালের একটি পঙ্‌ক্তি ও আমার একটি উক্তির মাধ্যমে। আমার উক্তিটি ছিল– 'লেখনির প্রাণ হলো নিষ্ঠা, সরলতা, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতার চিন্তা ও বিবেকের নির্ভুল ক্রিয়ার আহ্বান। আর এ-জাতীয় লেখনি খুঁজতে হবে 'খাওয়াতির' ও মুরাসালাত'-এর পত্রাবলিতে, যেগুলো এসব গুণের বাহক; কিন্তু মানুষের চোখের আড়ালে চলে গেছে।'

এই বৈঠক দ্বারা স্বার্থ উদ্ধার করার নিমিত্ত প্রতিনিধিদের নামে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল :

> 'এখান থেকে আপনারা এই বার্তা নিয়ে যাবেন যে, আমরা যেকোনো মূল্যে দীনকে সব ধরনের কাটছাটের প্রচেষ্টা থেকে নিরাপদ রেখে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে আপন মহিমায় টিকিয়ে রাখব এবং আমরা আমাদের দীন, সভ্যতা ও ভাষাকে যেকোনো মূল্যে নিরাপদ ও অটুট রাখব।...
>
> 'ভারতসহ গোটা ইসলামি বিশ্ব নানা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। ইহুদিদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও আমেরিকা-ইউরোপের উপকরণের প্রাচুর্য মিলে মুসলিম উম্মাহর সামনে বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর আজ নানা হিংসাত্মক স্লোগানের মাধ্যমে মুসলমানদের

কাছে তাদের ধর্ম পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছে। উরদু ও তার হস্তলিপি মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। যুবকদের মাঝে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদিতার বীজ বপণ করা হচ্ছে। আলেমসমাজ ও দীনদরদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুধু এজন্য অভিযান চালানো হচ্ছে যে, ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী। এই বিপদ শুধু উরদুর জন্যই নয়; এই বিপদ পুরোটা আরবিকেও গ্রাস করতে পারে।'

আরব পণ্ডিতগণও এসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিবন্ধ পাঠ করেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে দিল্লি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যক্ষ জিয়াউল হাসান ফারুকি ও ডক্টর মুহসিন ওছমানি নদবি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইজতিবা নদবি, প্রফেসর আবদুল ওয়াহ্হাব, ডক্টর মানশাউর রহমান মানশা (নাগপুরি), ডক্টর সাইয়িদ এহ্তেশাম আহমাদ নদবি, মাওলানা আবদুল করীম পারিখ, ডক্টর মুহাম্মাদ রাশেদ নদবি, প্রফেসর শুআইব আজমি, ডক্টর যফর আহমাদ সিদ্দীকি, ডক্টর সাইয়িদ কুদরতুল্লাহ বাকুবি ও ডক্টর আবদুল বারী সুবহানি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

রামজন্মভূমি বিবাদের সংকটকাল

দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা ব্যস্ততা, অনেকগুলো সফর এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও দাওয়াতি সভা-সমাবেশের ঝক্কিঝামেলার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণির পর এবার আমি সেই সমস্যাটার দিকে আসছি, যেটা দেশের গোটা পরিবেশ ও মন-মস্তিষ্কের ওপর ধূলি ও কুয়াশার মতো; বরং মোটা একটা আবরণের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সেটা ছিল রামজন্মভূমির বিবাদের সমস্যা, যেটা আসরগুলোর আলোচ্য, পত্রপত্রিকার সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান শিরোনাম এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সবচেয়ে দীর্ঘ বিষয়বস্তু ছিল। দেশ এমন একটা সংকটকাল অতিক্রম করছিল, যার নজির শুধু নিকট অতীতেই নয়– দূর অতীতেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ; মানে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর নেতৃস্থানীয় সদস্যবর্গ আমাদের সংবাদবিবৃতিগুলোতে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাক্ষাৎকারে একদম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছিলাম, 'মসজিদ না ধ্বংস করা যায়, না স্থানান্তর করা যায়। মসজিদ আজীবন

মসজিদই থাকবে এবং যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।' আগের বছর এ বিষয়ে আলোচনা করতে এবং মুসলমানদের অবস্থান স্পষ্ট করতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটি সভার আয়োজন করেছিল। কিন্তু তার পরদিন থেকে নিয়ে এ-যাবত তার কোনো দায়িত্বশীল একটা দিন বা একটা মুহূর্তও এর বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি।

সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। উলটো অপপ্রচার ডালপালা গজাতে থাকল। ফলে আবারও ল বোর্ডের মিটিং তলব করে এ-ব্যাপারে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এমনিতেই ল বোর্ডের মজলিসে আমেলার মিটিং তলব করার প্রয়োজন ছিল। আমার আমন্ত্রণে লাখনৌতে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সময় নির্ধারণ করা হলো ১১ আগস্ট ১৯৯২। লাখনৌতে গুলমার্গ হোটেলে মেহমানদের থাকার এবং মিটিং-এর আয়োজন করা হলো। এই বৈঠকে আমেলার ২৪ জন সদস্য এবং ৭ জন বিশেষ অতিথি এসে যোগদান করেছেন। অপরাপর সিদ্ধান্তাবলির পাশাপাশি বাবরি মসজিদের ব্যাপারে একটি স্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রস্তাবনা পাশ হলো। ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মসজিদের মর্যাদার ব্যাপারে যে-রেজুলেশন পাশ হয়েছিল, তার সূত্রে বলা হলো, এ-মুহূর্তে যিনি দেশের ক্ষমতার শীর্ষ আসনে সমাসীন, (প্রধানমন্ত্রী) তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁর যেমন সর্বোচ্চ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি তাঁর দূরদর্শিতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ও বড় বেশি আবশ্যক।

আমার নামে নরসীমা রাওজির পত্র ও তার উত্তর

১৯৯২ সালের ১১ আগস্ট অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর মজলিসে আমেলার বৈঠক চলছিল। ঠিক এ-সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওজির এক দূত তাঁর একটি ব্যক্তিগত একটি পত্র নিয়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় এসে হাজির হলো। তিনি জানালেন, এটি নরসীমা রাওজির নিজের হাতে লেখা পত্র। দেখলাম, উরদুতে লেখা পত্রটির হস্তাক্ষর খুবই স্পষ্ট। ভাষাও বেশ ঝরঝরা। পত্রটির ভাষ্য এখানে তুলে ধরলাম :

> 'মুহতারামী! আদাব।
> আশা রাখি, ভালো আছেন। ইচ্ছা ছিল, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাক। কিন্তু সম্প্রতি যারা আপনার সঙ্গে দেখা করে এসেছে, তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি,

পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া দিল্লিতে আসা আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে। কাজেই এই পত্রখানা পাঠালাম। বাবরি মসজিদ ও রামজন্মভূমি বিবাদটি মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হচ্ছে; যেমনটি আপনি জানেন, এটি অতিশয় জটিল, নাজুক ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এই সমস্যার ন্যায়ানুগ, যুক্তিগ্রাহ্য ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বের করার প্রচেষ্টা দেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত ফলপ্রসূ হতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে এমন কিছু পর্যায় আসে যে, তখন সাময়িক সুবিধা, রাজনৈতিক স্বার্থ, জোশদীপ্ত আবেগ ও উত্তেজনাকে একধারে সরিয়ে রেখে মহৎ উদ্দেশ্য, দূরদর্শিতা, সাধুতা, মমতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়।

আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি, আমার মতের সঙ্গে আপনি একমত হবেন। এই সমস্যার সমাধানে আপনি অতীতে ইতিবাচক ও নিষ্ঠাপূর্ণ যে-ভূমিকা পালন করেছেন, তার ওপর নির্ভর করে আমি আশা করছি, এ-ক্ষেত্রে নতুন করে আপনি আমাকে নির্দেশনা ও সহযোগিতা দেবেন।

বাবরি মসজিদ ও রামজন্মভূমি বিবাদে ধর্ম, ইতিহাস, আইন ও রাজনীতি সব কিছুকে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে যে, এখন একা একজনের পক্ষে তার সমাধান দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। এই প্রেক্ষাপটে আমি যেকোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনের যুক্তিসঙ্গত ও ইতিবাচক পরামর্শকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আছি। একাজে আমি সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করি।

দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ বজায় থাকুক এটি আমার ব্যক্তিগত বাসনা-ই নয়; বরং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সুনামের জন্য এটি সমস্ত ভারতীয়র জাতীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

হাজারো জটিলতা থাকা সত্ত্বেও যদি মহৎ লক্ষ্য, সৎ-সাধু ও শান্তিপ্রিয় কতিপয় মানুষ সামগ্রিক অনুভূতি ও পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান খোঁজ করেন, তা হলে একটি যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যদি দুজন মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারতাম, তা হলে বিষয়টির সবগুলো দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেত। যদি বিশেষ কোনো কারণে এ মুহূর্তে দিল্লিতে আসা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়, তা হলে দয়া করে পত্রের মাধ্যমে কিংবা কোনো লোকমারফত আপনার মতামত ও পরামর্শ আমাকে অবহিত করুন কিংবা এ-ব্যাপারে আপনার কোনো প্রস্তাব থাকলে তা-ও জানান। সবাই মনে করে, এ-ক্ষেত্রে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সেজন্য আমি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে
আপনার হিতকামী
পি.ভি নরসীমা নাও।'

পত্রটি নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তাকে বলা হলো, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর কার্যকরি পরিষদের সভা চলছে এবং আমাকে এখনই সেখানে যেতে হবে। ওখান থেকে অবসর হয়ে এর উত্তর লিখে আমি আপনার হাতে তুলে দেব। এই সময়টুকু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি মেনে নিলেন। এই চিঠিতে আমি তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয় বলে জানালাম। কারণ, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার অব ইসলামিক স্টাডিজ-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, যার আমি সভাপতি। তা ছাড়া আমার পরিকল্পনা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমি দেশের সার্বিক বিষয়ে কথা বলব, যার জন্য প্রোগ্রামটা এককভাবে করতে হবে। এর জন্য আমি সেপ্টেম্বরের ৬ ও ৭ তারিখের প্রস্তাব দিলাম। পত্রটির ভাষ্য হুবহু এখানে তুলে ধরলাম :

শ্রদ্ধেয় জনাব নরসীমা নাও, প্রধানমন্ত্রী, ভারত।

আপনার পত্রখানা কাল ১১ আগস্ট লোকমারফত আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। পত্র পেয়ে আমি খুবই প্রীত হয়েছি।

তদুপরি যখন দেখলাম, পত্রখানা আপনি নিজের কলমে উরদুতে লিখেছেন, তখন আর আনন্দের সীমা রইল না। আপনার এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যর নিজ চোখে দেখার অভিজ্ঞতা হলো, যার খ্যাতি আগেই আমি শুনেছি।

আপনার পত্রের উত্তরে আমার নিবেদন হলো, বেশ কিছুদিন যাবতই আমি সরাসরি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভে ধন্য হওয়ার বাসনা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। আপনার সঙ্গে আমি এমন একটি একান্ত সাক্ষাৎ কামনা করছিলাম, যেখানে আপনার সঙ্গে আমি দেশের নানা স্বার্থে আলোচনা করব। কারণ, আমার ধারণামতে এই মুহূর্তে এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি, দীর্ঘদিন পর দুর্ভাগ্যবশত কোনো দেশ ও জাতি যার সম্মুখীন হয় এবং যার সমাধান ও প্রতিকার অনেক সময় অসম্ভব, আবার কোনো-কোনো সময় দুষ্কর হয়ে যায়। এই দায়িত্বটি (প্রধানমন্ত্রিত্ব) গ্রহণের অব্যবহিত পরই আপনার কাছে আমি একটি দীর্ঘ পত্র কোনো এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রেরণ করেছিলাম। পরে আমি জানতে পেরেছি, আপনি অত্যন্ত মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে পত্রটি পাঠ করেছিলেন এবং উত্তর দেওয়ার প্রত্যয় বা ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আপনার দেশের নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়া প্রমাণ করে, আল্লাহ আপনার থেকে বড় কোনো কাজ নিতে চাচ্ছেন।

ঘটনাচক্রে আপনার দূত যে-সময় পত্র নিয়ে লাখনৌ পৌঁছেছিল, তখন আমি অধমেরই সভাপতিত্বে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড-এর কার্যকরি পরিষদের সভা চলছিল। আমি খাওয়ার বিরতিতে ওখান থেকে উঠে নিজের অবস্থানের জায়গায় এলাম, যেখানে আপনার লোক এসে আমাকে পেয়ে গেল। পার্সোনাল ল বোর্ড-এর এই সভায় (সম্ভবত আপনারই ইঙ্গিতে) আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠিত হতে যাচ্ছে। প্রতিনিধিদলের সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই আজই আমি ও বোর্ডের সেক্রেটারি মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেব সেই সদস্যদের নির্বাচন করেছি, যারা বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই এই দলে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করিনি, যারা শুধু বাবরি মসজিদ বনাম রামজন্মভূমি বিবাদ নিয়েই কথা বলবে। তার কারণ দুটি। একটি কারণ হলো, নির্বাচিত এই সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল। কারও কোনো তারিখে অজুহাত থাকতে পারে, কারওবা আরেক তারিখে। জানি না, এরা কোন দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারে এবং বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আমার অক্ষমতা হলো, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার অব ইসলামিক স্টাডিজ-এর বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত (যার আমি সভাপতি) ইনশাআল্লাহ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাব। দ্বিতীয় কারণটি হলো, এই প্রতিনিধিদলের আলোচনা বিশেষভাবে সেই বিবাদবিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, আপনি যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমি আপনার সাথে দেশের বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতিও তার সংশোধন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আর তা হতে হবে নির্জনে, এই সীমিত সময়ে এবং বহু লোকের এই ভিড়ের মধ্যে আমি যার সুযোগও পাব না আবার তা সঙ্গতও হবে না। তাই আমার আবেদন হলো, সেপ্টেম্বরের ৬ অথবা ৭ তারিখে আমাকে সময় দিন; আমি আপনার সঙ্গে একান্তে মিলিত হব। এভাবে হয়তো আমার দ্বারা দেশের কোনো সেবা হতে পারে এবং কোনো-না-কোনো সমস্যার সমাধানে আমার সাহায্য পেতে পারেন। আমার এই প্রস্তাবের সঙ্গে যদি আপনি একমত হন এবং ৬ কিংবা ৭ সেপ্টেম্বর এর জন্য সময় বের করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলে জানাবেন। আমি ইনশাআল্লাহ এসে হাজির হব এবং তার দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা চালাব। এই দেশটিকে সেবাদানের জন্য আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ সুস্থ জীবন, সাহায্য ও নির্দেশনা দান করুন।

আপনার হিতকামী

আবুল হাসান আলী নদবি

১২ আগস্ট ১৯৯২ খ্রি.

আমেলার বৈঠকের সদস্যবৃন্দ যখন জানতে পারলেন, প্রধানমন্ত্রী বোর্ডের সভাপতিকে (আমাকে) সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তখন মজলিসে আমেলা সিদ্ধান্ত নিল, সভাপতি সাহেব ও সেক্রেটারি (মাওলানা সাইয়িদ নিযামুদ্দীন) সাহেব দুজন মিলে সারা দেশ থেকে সদস্য নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠন করবেন। এই দলটি নির্ধারিত তারিখে সরকারকে কার্যকররূপে বোর্ডের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করবে। বোর্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বের হওয়া এমন একটি সমাধানে সমর্থন দেবে, যেটি শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। বোর্ড মনে করছে, এই সমস্যাটা অতিদ্রুত সমাধান করে ফেলা দেশের স্বার্থে খুবই জরুরি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

আমার চিন্তা ছিল এবং বিষয়টি মহাসচিবের কানেও দিয়েছিলাম যে, আমরা দুজন মিলে যে-দলটি গঠন করেছি, এ-সময় শুধু তারা-ই গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসুক। ইংল্যান্ড সফরের কারণে আমাকে এমনিতেই দিল্লি যেতে হবে। এভাবে দুবার দিল্লি যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কিন্তু মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেব দিল্লি থেকে বারবার টেলিফোন করছিলেন, প্রতিনিধিদলে আপনার থাকা খুবই জরুরি এবং আপনার অনুপস্থিতি অনুভূত হবে। অগত্যা আমিও চিন্তা করলাম, সময়টা তো কুধারণা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা বলার। আমি না গেলে ধরে নেওয়া হবে, বিষয়টিতে আমি গুরুত্ব দেইনি। ফলে আমিও গেলাম।

সদস্যরা সবাই ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট মুহতারাম ইবরাহীম সুলাইমান শেঠ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তারপর ওখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে গেলাম। আলোচনা আমি শুরু করলাম। আমার বক্তব্যে দেশের নাজুক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বললাম, স্বাধীনতার পর এ-ই প্রথমবার দক্ষিণ ভারতের কাউকে প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য নির্বাচন করা হলো। দক্ষিণ ভারত সাধুতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আজও অবধি সুনামের অধিকারী। আশা করি, এই উদার মন ও দূরদৃষ্টির বদৌলতে আপনি সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করে নেবেন। সেই সঙ্গে আমি একথাও বললাম যে, কোনো মসজিদকে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না। ধর্মীয় বিষয়াদিতে ভারত দীর্ঘকাল যাবত একটি সুনাম বহন করে আসছে, যার স্বীকৃতি আমরা আরব দেশগুলো থেকেও পাচ্ছি। সেজন্য আরব বিশ্ব এ-দেশের আলেমদের সম্মানিত ও সর্বদিক থেকে গ্রহণযোগ্য মনে

করে। দেশের আলেমসমাজ একমত, মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না এবং মসজিদের জায়গায় অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা বৈধ নয়।

আমার বক্তব্যের পর অন্যান্য সদস্যবৃন্দও কথা বললেন, যাদের মাঝে আলেমে দীন, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। তারাও আমার বক্তব্যকে সমর্থন জোগালেন। নরসীমা রাওজি চুপচাপ শুনতে থাকলেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো ফর্মুলা উপস্থাপন করেননি। আলোচনা শেষ করে আমরা ফিরে এলাম।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

আমি আমার বাসস্থানে অবস্থানরত ছিলাম। পরদিনই প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারির টেলিফোন এল, প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চান; কষ্ট করে আপনি আরেকবার আসুন। আমি চিন্তা করলাম, এ-সময়ে এবং এই পরিবেশে একাকি দেখা করা ঠিক হবে না। এর সূত্র ধরে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, যার ফলাফল দেশ ও জাতির জন্য শুভ হবে না। আমি শারীরিক দুর্বলতা ও ইংল্যান্ড সফরের অজুহাতে না করে দিলাম। কিন্তু তারপর আরও দুবার ফোন এল। বলা হলো, প্রধানমন্ত্রী আপনার সাথে আরও কিছু কথা বলা খুবই জরুরি মনে করছেন; আপনি আসুন। এই দুবারও আমি অপারগতা-ই প্রকাশ করলাম। কিন্তু ওদিক থেকে পীড়াপীড়ি চলতে থাকল। অবশেষে আমি সময়ের কিছু হেরফের করে (যাতে ওখান থেকে বিদায় হয়েই আমি সহজে লাখনৌর গাড়ি ধরতে পারি) যাব বলে ওয়াদা দিলাম। এবার আমি চিন্তা করলাম, কদিন পরই হয়তো পার্সোনাল ল বোর্ড-এর আমারই নেতৃত্বে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হবে। তখন তো তিনি বলতে পারেন, এত করে বললাম এলেন না; এখন কিনা আপনা থেকে আসতে চাচ্ছেন!

আমি কথা দিয়ে দিলাম। সেক্রেটারিয়েটের এক কর্মকর্তা গাড়ি নিয়ে এসে পড়ল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম; বরং মনে-মনে একরকম শপথ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম, আমার মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের হতে দেব না, যার ওপর ভর করে, যাকে দলিল বানিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন যে, একান্ত সাক্ষাতে পার্সোনাল ল বোর্ড-এর সভাপতি এই-এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে সমস্যার এভাবে সমাধান দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি। সারকথা হলো, আমি কোনো সুযোগ দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে এবং লাখনৌর উদ্দেশে রওনার প্রস্তুতি গ্রহণ করে

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খুবই সতর্কতার সাথে অতি সংক্ষেপে কথা বললাম, যার ফলে বোধহয় তিনি হতাশ হয়েছিলেন এবং সমস্যা যেখানকারটা সেখানেই রয়ে গেল। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি সোজা স্টেশনে চলে গেলাম এবং লাখনৌ ফিরে গেলাম।

একটা ভিত্তিহীন খবর ও অপবাদ আরোপ

লাখনৌ চলে যাওয়ার পর দিনকতকের মধ্যে জানতে পারলাম, আমার এক পুরনো সহকর্মী – যিনি মুসলমানদের একটি বিখ্যাত সংগঠনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত – কোনো একটি পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন–

> 'মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহেব নদবি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার পর নিজের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।'

ব্যাপারটা এখানেই থামেনি। আরও কদিন পর পাটনা থেকে এক বন্ধুর পত্র এল, এখানে একটি উরদু পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে, 'মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহেব নদবি এক সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীকে বাবরি মসজিদ ভাঙার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এটা আপনি করতে পারেন।' আমি পত্রমারফত এই দাবি প্রত্যাখ্যান করলাম। এই দায়িত্বহীন ও বদদীনি আচরণে আমি মনে খুব ব্যথা পেলাম এবং এর এর ফলে জাতীয় রাজনীতি, ও সাংবাদিকতার বড় একটা দুর্বলতা ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে চরম উদাসীনতার একটা নমুনা দেখতে পেলাম।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ভারতীয় ইতিহাসের একটা সর্ববৃহৎ দুর্ঘটনা

সময় অতিবাহিত হচ্ছিল এবং বিজেপি সরকার – যার নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং আর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছিলেন এল.কে আদভানিজি, জোশিজি, অটল বিহারী বাজপেয়ী ও তাদের অন্যান্য সহকর্মীরা – বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে তদস্থলে রামমন্দির নির্মাণের মিশনকে একটি আন্দোলনের মতো সারা দেশে পরিচালনা করছিলেন এবং একে হিন্দু জাতি, ও ধর্ম বরং স্বাধীন ভারতের একটি মর্যাদার বিষয় বানিয়ে তুলেছিলেন। অপপ্রচার এত জোরেশোরে চালানো হলো যে, সারা দেশে একটা আগুনের

মতো লেগে গেল এবং করসেবকদের একটি বাহিনী তৈরি হয়ে গেল, যারা এই কাজটিকে একটি ধর্মীয় কর্তব্য ও মহাভারতের যুদ্ধের মতো আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত ছিল।

অবশেষে একদিন বাবরি মসজিদ ইতিহাসের ঘৃণ্যতম বর্বরতা ও নির্মমতার শিকার হলো। বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, যার চিত্র আঁকা একটা সুকঠিন কাজ। এ-বিষয়ে কথা বলতে গেলে মন ও মস্তিষ্কের ওপর অসহনীয় বোঝা চেপে বসে। মসজিদটিকে ধ্বংস করার জন্য এক সপ্তাহ যাবত মহড়া দেওয়া হয়েছিল এবং পিএসি ও করসেবকদের মধ্যকার সম্পর্ক এতই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল যতখানি আন্তরিক ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আর.এস.এস)-এর মাঝে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার সঙ্গে শত্রুতামূলক ও প্রতিহিংসামূলক আচরণের বৃত্তান্ত ইংরেজি ও উরদু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সেসব উদ্ধৃত করে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে এবং হৃদয়গুলোকে আহত করতে চাই না। ইংরেজি পত্রিকা 'সে 'ট্সম্যান'-এর কলামিস্ট সঞ্জয় কাও করসেবকদের বেশ ধারণ করে যা-কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন, তার বিবরণ ডিসেম্বরের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। উরদু-হিন্দি পত্রিকাগুলোও ঘটনার পুরোপুরি চিত্র এঁকেছে।

৬ জিসেম্বর অযোধ্যায় কী-কী ঘটেছিল, একটি শ্বেতপত্রে তার ইতিহাস ও কাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল এবং দিন ও ঘণ্টার বিবরণসহ এই হিংস্র ও নির্মম কর্মনীতির ছবি আঁকা হয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে এবং আমার দাবির সমর্থন পেতে এই শ্বেতপত্রটি অধ্যয়ন করা-ই যথেষ্ট। শ্বেতপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করার সুযোগ নেই। তবে একটা বিষয় একদম পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফোর্স, পিএসি ও সেনাবাহিনী অদূরেই দাঁড়িয়ে একজন দর্শনার্থীর ভূমিকা পালন করেছেন আর কল্যাণ সিং-এর সরকার এই অভিযানকে তামাশার চোখে নয়– একটি মহৎ কর্ম ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারায় প্রত্যক্ষ করছিলেন। ডিসেম্বরের ৮ তারিখে আমি একটি বিবৃতি দিলাম, যেটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। বিবৃতিটি আমি এখানে হুবহু তুলে ধরলাম :

> '৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় প্রাচীন ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার সুরক্ষার নানা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার যে-ঘটনাটা ঘটল, সেই ঘটনা গোটা হিন্দুস্তানের গায়ে একটা কলঙ্কতিলক এঁটে দিয়েছে, তার

শত-শত বছরের সুনাম, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপ্রিয়তার ঐতিহ্যকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, যাঁরা দেশটির স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের সমস্ত শ্রমের ওপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতকে অপমানিত করেছে।...

'এই ঘটনার দায় সবার আগে চাপে সেই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর ওপর, যারা গোটা দেশে 'করসেবক' নামে একটা ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে দিয়েছিল। তারপর এর দায়ভার চাপে উত্তর প্রদেশের সেই সরকারের ওপর, যে কিনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উপহার দেবে বলে ক্ষমতায় এসেছিল, যেকোনো মূল্যে বাবরি মসজিদকে রক্ষা করবে বলে ওয়াদা দিয়েছিল; কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি-ই সে রাখেনি। এমনকি আদালতের রায়ের প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রদর্শন তার কর্তব্যের অংশ ছিল, তা-ও সে রক্ষা করেনি। বরং এই পুরো ড্রামায় একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তা-ই নয়– সে একরকম এই অভিযানে করসেবকদের সাহস জুগিয়েছিল। অন্যথায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ে এত সহজে, এমন স্বাধীনভাবে এই অপকর্মটা সম্পন্ন হতে পারত না।...

'অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারেরও ওপর এর দায়দায়িত্ব বর্তায়। বাস্তববাদী ও সচেতন মহলগুলোর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপের অধিকার আছে যে, কেন্দ্রীয় ফোর্স ও পুলিশের উপস্থিতিতে (যারা দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল) কোনো হস্তক্ষেপ করেনি এবং বারবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও সে মসজিদটিকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা চালায়নি।...

'এখন কলঙ্কের এই তিলক এবং এই ঘটনায় ভারতের মুখে যে-কালিমা লেগেছে, এসব মুছতে ও ধুয়ে পরিষ্কার করতে অনেক কিছু করতে হবে। এটি দেশপ্রেম ও বাস্তববাদিতার দাবি। মসজিদটি পুনঃনির্মাণ ছাড়াও – কেন্দ্রীয় সরকার যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে – সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রের শত্রু

সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তাদের তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি দেশে ঐক্য, পারস্পরিক আস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, অনুষ্ঠানাদি, উপাসনালয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সুরক্ষা, মানবতার মর্যাদা ও দেশপ্রেমের একটি সাহসী, বাস্তবানুগ, সার্বজনীন ও ঝড়গতির আন্দোলন চালাতে হবে। একাজে সভা-সমাবেশ করে জনমনে সচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। লেখালেখির মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রচারমাধ্যগুলোকে একাজে ব্যবহার করতে হবে। এ ঘটনায় ভেতরে ও বাইরে দেশের যে-ক্ষতিটা হয়ে গেছে, তা পূরণ করতে কঠিন ও কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থ, দলীয় চিন্তাধারা ও ক্ষমতার মোহের ঊর্ধ্বে উঠে নিরেট ও সত্যিকার দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সাথে কাজ করতে হবে। দেশ কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত, যার থেকে দেশটিকে বের করে আনতে এর কোনো বিকল্প নেই।'

কেন্দ্রের একটি সম্পূরক পদক্ষেপ এবং বিজেপির চারটি সরকারের পদচ্যুতি

চার দিক থেকে চাপ আসার পর এবং নিজেদের দুর্নামের ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি প্রদেশের (উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশ) সরকার ভেঙে দিয়ে সেখানে গভর্নর শাসন চালু করে দিল। আরেকিট পদক্ষেপ নিল, ১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বর কয়েকটা সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করল। দলগুলো হলো, আরএসএস, বিশ্বহিন্দুপরিষদ, বজরংদল ও ইসলামিক সেবক সংঘ। নিজেদের কাছে ভারসাম্য বজায় রাখতে তার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীকেও বেআইনি সাব্যস্ত করল। এর বিরুদ্ধে আমি পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিলাম, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

'ভারতের বিশিষ্ট আলেমে দীন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর সভাপতি মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবি সাহেব প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওকর্তৃক নিষিদ্ধ ও বেআইনি ঘোষিত সংগঠনগুলোর মধ্যে

জামায়াতে ইসলামীর নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ, জামায়াতে ইসলামী একটি আত্মসংশোধন ও আত্মগঠনমূলক দীনি সংগঠন। সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। নিষিদ্ধ সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর মাঝে জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভুক্তির ফলে বহির্বিশ্ব ও আরব দেশগুলোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম নেবে। কোনো রাষ্ট্রই ব্যাপারটিকে ভালো চোখে দেখবে না। কারণ, সেসব দেশের শিক্ষিত ও দীনি সমাজে জামায়াতে ইসলামীকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। তারা সবাই জানে, এটি একটি আত্মসংশোধন ও সমাজসংস্কারমূলক সংগঠন।'

আমি আমার এক আলাপচারিতায় বলেছি, এটা স্রেফ 'কাব্যের ছন্দ ঠিক রাখার প্রয়োজনে' করা হয়েছে। কারণ, কবিতায় অনেক সময় কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মেলে না, যতক্ষণ-না তাতে অতিরিক্ত কিছু বর্ণ যোগ করা হয়।

বোম্বাই, সুরাট ও মহারাষ্ট্রের ভয়াবহ দাঙ্গা এবং জীবন ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি

অযোধ্যার ঘটনা এবং বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর বোম্বাই, সুরাট, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা বান এসে পড়ল। মনে হচ্ছিল, এই পুরোটা অঞ্চলে ভয়ানক একটা ভূমিকম্প কিংবা ধ্বংসাত্মক একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে। ওই সময়কার ইংরেজি, উরদু ও হিন্দির নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্রগুলোতে চোখ বোলালেই ঘটনার ভয়াবহতা আন্দাজ করা সম্ভব হবে। তখনকার অনেকগুলো পত্রিকার কাটিং আমার সংরক্ষণে আছে। সেগুলো ঘেঁটে এখানে কতগুলো শিরোনাম উল্লেখ করলাম। এখানে তার বেশি কিছু বলার তো সুযোগ নেই।

'বোম্বাই ও আহমদাবাদে মুসলমানদের ৫৬ বিলিয়ন (পাঁচ হাজার ছশো কোটি) রুপির ক্ষতি'। 'রাস্তাগুলোতে এখনও অগণিত লাশ'। 'দাঙ্গায় গুজরাটে ১০০ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) রুপির ক্ষতি'। 'সিকুরিটি ফোর্স মোতায়েন সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে দাঙ্গা অব্যাহত : অগণিত দোকানপাট ও বাড়িঘরে আগুন'। 'বোম্বাইয়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তছনছ'।

'তিনশোসালা ঐতিহাসিক নগরীর ঘৃণ্যতম গণহত্যা'। 'বোম্বাইয়ে মুসলিমনিধন দাঙ্গার দ্বিতীয় যুগ'। 'সরকারের এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া দুঃখজনক'। 'অব্যাহতভাবে নির্মম হিংসা-হানাহানি প্রতিরোধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব দেশের অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ প্রমাণিত হতে পারে'। 'বুদ্ধিজীবী মহল ও মানবাধিকার কর্মীদের সরকারের ওপর চাপ'। 'বোম্বাই পুড়ছে আর বাল থ্যাকারে আগুনে তেল ঢালছেন'। 'হিংস্র সাম্প্রদায়িক নির্মমতার রোমহর্ষক কাহিনি'। 'একই রাতে ৫০ হাজার মানুষ শরণার্থী'। 'বোম্বাইয়ে হাজার-হাজার মানুষ রেলস্টেশনে আটকে আছে'। 'শ্রমিকরা বকেয়া না নিয়েই পালিয়ে গেল'। 'বোম্বাই থেকে শরণার্থীদের অনেকগুলো রেল লাখনৌ পৌঁছে গেছে'। 'সকলের একই কাহিনি : সব লুট হয়ে গেছে, সব পুড়ে গেছে'। 'আহমদাবাদে পুলিশের গুলিতে মৃতের সংখ্যা ষাটে পৌঁছে গেছে'।

বোম্বাই ছাড়া সুরাটেও হিংস্র ও অভদ্রোচিত অভিযানের খবর পাওয়া গেছে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী লুণ্ঠন, জ্বালাও-পোড়াও, নির্মমভাবে হত্যা ও নারীর সম্ভ্রমহানির পরিপূর্ণ সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। মিল্লি কাউন্সিলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'মুসলমানরা এমন নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়, যার সামনে হালাকুখান-চেঙ্গিসখানের নিপীড়নের ইতিহাসকে তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়। তাতে বলা হয়েছে, কোনো-কোনো প্রচারমাধ্যম দ্বারা জানা গেছে, পুলিশের গুলিতে আহত মুসলমানের সংখ্যা ১ হাজার ৭ শতেরও বেশি। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাটের সুরাত শহরে নারী ও অল্প বয়সি মেয়েদের সাথে যে-নির্লজ্জ আচরণ করা হয়েছে, তাতে আমাদের দেশের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যাওয়া দরকার। কোনো-কোনো এলাকা এমনও আছে যে, মনে হচ্ছে, এখানে দাঙ্গা হয়নি; বরং ভারী ট্যাংকের মাধ্যমে লোকালয়গুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ছাড়া কানপুর ও অন্য অনেক শহরেও রক্তক্ষয় ও অমানুষিক আক্রমণের অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে নাগরিকরা নিরাপত্তা ছাড়াও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে যে-ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, তার পরিসংখ্যান বের করা খুবই কঠিন।

ক্রমবর্ধমান ঝড়ের বিরুদ্ধে জনসভা এবং আমার ভাষণ-বক্তৃতা

দেশের এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি একদিকে জরুরি মনে করলাম, পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য হিন্দুধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও পরিচ্ছন্ন

মনের অধিকারী রাজনৈতিক নেতাদের মাঠে নামাতে হবে। এ কাজে আমি আমার একনিষ্ঠ বন্ধু তরজুমানুল কুরআন মাওলানা আবদুল করীম পারিখকে সঙ্গে নিলাম। তাঁর পক্ষে যা-যা করা সম্ভব ছিল, তিনি করলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এই মিশনটি পুরোপুরি সফল হয়নি। এসব ঘটনায় মনে আঘাত পেয়েছেন এবং অস্থির হয়ে মাঠে নেমে আসবেন এমন লোকের অভাবই ছিল তার কারণ। কিন্তু তারপরও আমি একাধিক জনসভার আয়োজন করলাম এবং সেগুলোতে পুরোপুরি পরিচ্ছন্নতা ও সাহসিকতার সাথে বিপদঘণ্টা বাজাতে এবং মানুষের মনে ব্যথা জাগাতে চেষ্টা করলাম। এ বিষয়ে আমার প্রদত্ত দুটি ভাষণ আমি এখানে উপস্থাপন করছি, যেগুলোতে আমি পরিস্থিতির পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার এবং হাজারো মানুষের মনের কথা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

একটি ভাষণ ১৯৯৩ সালের ৬ জানুয়ারি লাখনৌর কয়সরবাগের বারাদরিতে এক মিশ্র জনসভায় প্রদান করি। পরে এটি 'দেশ ও সমাজের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি নিপীড়ন ও হিংস্রতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অপরটি প্রদান করেছি ৮ জানুয়ারি রায়বেরেলি শহরে গভর্নমেন্ট কলেজের বিশাল মাঠের এক জনসভায়। এখানে ১০-১৫ হাজার লোকের সমাগম ঘটেছিল, যারা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক।

এখানে আমি এই খেয়ালে দুটি ভাষণ হুবহু উপস্থাপন করছি যে, সাময়িক পুস্তিকার ওপর কোনো ভরসা রাখা যায় না। ভাষণগুলো – যেগুলো প্রকৃত ঘটনার প্রতিনিধিত্ব ও পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি ব্যক্ত করছে – এখানে লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

দেশ ও সমাজের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি নিপীড়ন ও হিংস্রতা

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

আমি পড়ালেখা করার মতো মানুষ। কিন্তু আমার মনোযোগ ও হৃদ্যতার কেন্দ্র দুটি বিষয়। এক হলো ধর্ম। আবার তাতেও তুলনামূলক অধ্যয়ন। এক হলো ইতিহাস। তবে ইতিহাসের কোনো অংশবিশেষ নয়; বরং বিশ্ব-ইতিহাস। আরবি, ফারসি, উরদু ও ইংরেজিতে ইতিহাসগ্রন্থের বিশাল ভান্ডার দেখেছি ও পড়েছি। সেই অধ্যয়নেরই ফলে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, পৃথিবীর

সবগুলো ধর্মগুলো যে-বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি একমত, তা হলো, জুলুম একটা মন্দ কাজ এবং যিনি এই জগতটা সৃষ্টি করেছেন, তিনি জুলুম পছন্দ করেন না। আর ইতিহাসও বলছে, জুলুমের কারণে অনেক সময় বড়-বড় সাম্রাজ্যের বাতি নিভে গেছে এবং সমাজের ওপর বসন্তের হাওয়া বয়ে গেছে। সেগুলোর পুরোপুরি পতন ঘটেছে এবং সেই অঞ্চলের শিক্ষা ও সাহিত্যের সমস্ত কীর্তি ও ভান্ডার মাটির সাথে মিশে গেছে।

ইতিহাসে এমন বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে যে, অনেক সময় কোনো একজন মজলুমের আহাজারি, একজন নিপীড়িত নারীর আর্তনাদের ফলে গোটা একটা যুগেরই পতন ঘটে গেছে। একটি দেশের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষা ও সত্যিকার মায়া হলো সেই দেশে কোনো প্রকার অবিচার হতে না দেওয়া, কোনো দুর্বল মানুষকে পিষ্ট না করা, কারও ঘরের বাতি নিভতে না দেওয়া, অবলা-অবোলা কোনো নারীর গায়ে হাত না তোলা এবং কোনো মজলুমের বদদুআ না নেওয়া।

সমগ্র ভারতের কথা বাদ দিন। লাখনৌ শহরের মোকাবেলায় এই বারাদরি এলাকাটার গুরুত্ব কী? তেমন কিছু না। কিন্তু যদি কিছু লোক এসে এই বারাদরিতে ভাঙচুর শুরু করে দেয়, চেয়ার মারামারি করে, মানুষের ওপর আক্রমণ চালায়, এই যে আপনারা বিলাসিতা ও আরামের উপকরণগুলো দেখছেন, এগুলো ধ্বংস করতে শুরু করে, তা হলে এই অঞ্চলটুকুর নিরাপত্তা ও দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকগুলো ব্যাপারটা সহ্য করবে না। আপনি কুমারের দোকানে গিয়ে দেখুন। (এটা আপনার প্রতি আমার কোনো পরামর্শ নয়। কারণ, আপনার প্রতি আমার মায়া আছে। কথাটা আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি)। একজন কুমারের মর্যাদা কতখানি? তার মাটির পাত্রগুলোর দাম কত? দু-পয়সার জিনিস। কিন্তু আপনি কুমারের দোকানে গিয়ে তার গড়াগুলো ভাঙতে

শুরু করুন, তার থালাগুলো ভাঙতে শুরু করুন। কাজ সমাধা করে ওখান থেকে আপনি এমনিতেই ফিরে আসতে পারবেন না। আপনি প্রতিরোধের সম্মুখিন হবেন। কুমার তার পাত্রগুলো রক্ষা করতে চেষ্টা করবে এবং আপনার ওপর পালটা আক্রমণ চালাবে।

অনুরূপ আপনি আরেকটা দোকানে যান। তাকে লুট করতে শুরু করুন। তার মালপত্র তুলে নিয়ে আসতে চেষ্টা করুন। নিজের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটান। দেখবেন, দোকানদার ব্যাপারটা সহ্য করতে পারবে না। ওখানে যদি জীবনের কোনো চিহ্ন থাকে, জায়গাটা যদি কোনো সুসভ্য মানুষের আবাস হয়, যদি ওখানে লেখাপড়া জানা লোকজন বাস করে, তা হলে গোটা মহল্লা এসে দাঁড়িয়ে যাবে। ঘরের লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসবে। মানুষ পড়ালেখা ছেড়ে দেবে। সবাই এসে আপনার হাত ধরে ফেলবে। বলবে, এই গরিব বেচারার দোষটা কী যে, তুমি এর দোকানে ভাঙচুর করছ, জ্বালাও-পোড়াও করছ?

এখানে কাছেই একটা লাইব্রেরি আছে। ওখানকার প্রতিটি বইয়ের এক-একটি পাতা আমার কাছে অনেক মূল্যবান। আমার অনেক বই তারা ছেপেছে। কিন্তু আমি বলছি এবং বুকে হাত রেখেই বলছি, ওখানে গিয়ে আপনি একটা বই ছিঁড়তে শুরু করুন। কত আর মূল্য একটি বইয়ের? মানুষের লেখা গ্রন্থই তো। একবার নষ্ট হয়ে গেলে আবার লিখে নেওয়া যাবে। পুনরায় ছাপা যাবে। বারবার ছাপা যাবে। কিন্তু তারপরও মালিক এই ভান্ডারটি ধ্বংস করার কিংবা তার কোনো একটি অংশের ক্ষতি করার অনুমতি আপনাকে দেবে না।

এই যে একটা দেশ। এই দেশটা তো আবাদ মানুষেরই দ্বারা। মানুষ বাস করছে বলেই এখানকার জাঁকজমক অটুট আছে। আমরা কতগুলো মানুষ বাস করি বলেই তো একে রাষ্ট্র বলা হয়– বন বলা হয় না। এখানে কেউ শিকার খেলতে আসে না। কারণ, শিকারিরা জানে, এটা লাখনৌ;

এটা সভ্যতার কেন্দ্র। এটা অযোধ্যা। এটা ঐতিহাসিক শহর দিল্লি, এটা দেশের রাজধানী। এটা বোম্বাই। এটা আহমদাবাদ। এটা সুরাট। আমি আপনাদের কত শহরের নাম শোনাব? কেউ আপনাকে অনুমতি দেবে না, আপনি মাটির সামগ্রীকে, কাচের সামগ্রীকে টিনের সামগ্রীকে নষ্ট করবেন। তা হলে এটা কী করে সম্ভব, এই পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, তিনি নিজহাতে অনেক মায়া করে, আদর করে নিখুঁতভাবে যে-মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন, তারা শিকারে পরিণত হয়ে যাবে? শিকারও আবার কার হাতে? খোদ মানুষেরই হাতে? সৃষ্টিকর্তা কী করে এই অনুমতি দিতে পারেন যে, মানুষ মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে যাক যেভাবে মানুষ পশু-পাখি শিকার করে?

মোটকথা, সবগুলো ধর্ম যদি কোনো একটি ব্যাপারে একমত হয়ে থাকে, তা হলো জুলুম খুবই খারাপ ও সৃষ্টিকর্তাকে রুষ্ট করবার মতো জিনিস। তাঁর পক্ষ থেকে জুলুমকারীদের ওপর এমন-এমন সাজা-শাস্তি নেমে আসে, যার কল্পনা করলেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। আমি এ দেশেরই একজন অধিবাসী। আমার জীবনও এই ভূখণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। আমি বলতে চাই, যারা জুলুম করে, তাদের ওপর খোদার পক্ষ থেকে আপদ আসে, ভূমিকম্প আসে, বজ্রপাত হয়, নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়, দুর্ভিক্ষ আসে। মহামারি আসে। আমাকে দিয়ে আর বলাবেন না।

আমি বলছিলাম, যে-বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়া দরকার, তা হলো জুলুম। জগতের সবগুলো ধর্ম, সবগুলো সভ্যতা, সবগুলো কালচার একমত যে, মানুষ হলো সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ। প্রতিটি ধর্মের মানুষ, প্রতিটি নগরীর মানুষ, প্রতিটি দেশের মানুষ, প্রতিটি গোত্র-গোষ্ঠীর মানুষ, প্রতিটি বংশের মানুষ, প্রতিটি শ্রেণির মানুষ, প্রতিটি সমাজের মানুষ, প্রতিটি যোগ্যতার মানুষ– উপকারী হোক বা অনুপকারী; সে খোদারই শিল্প, খোদারই দয়ার বহিঃপ্রকাশ। এর চেয়ে বড় শিল্পকর্ম আর কী হতে পারে?

মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। তার মানসিক ও স্নায়বিক সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা ব্যক্তির ওপর আসতে পারে, সমাজের ওপর আসতে পারে, গোটা জাতির ওপরও আসতে পারে এবং আসছেও। ইতিহাস বলছে, রোগের এই আপদ, মাতালতার এই আপদ, জুলুম ও হিংস্রতার এই আপদ, মানুষকে হেয় ও অপদস্থ করার এই আপদ শুধু ব্যক্তির ওপরই আসে না– বরং গোটা সমাজ, গোটা দেশ ও গোটা একটা কালের ওপরও আসে। এসব আপদ নতুন, অভিনব ও বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়। কিন্তু ভয় হলো তখন, যদি এই বিপদ দূর করার মতো, এই রোগ সারানোর মতো কোনো মানুষ না থাকে। আমরা মানবীয় সভ্যতায়, মানববংশে এমন বড়-বড় বিপদ আসতে দেখেছি যে, মনে হতো, এই সভ্যতা আর বেঁচে থাকতে পারবে না। এই বংশ আর সামনের দিকে এগুতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেছে, কিছু সাহসী মানুষ সামনে চলে এসেছেন এবং ঘটনাবলির রোখ পালটে দিয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে আমি একটা-দুটা নয়– দশটা দিতে পারব। এখানে আমি মাত্র দুটা উপমা পেশ করছি।

চীনের সীমান্ত এলাকা থেকে তুর্কিস্তানের তাতারিরা উঠে দাঁড়াল। মনে হলো, মানববংশ এবার সবকিছু হারাবে। এবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। প্রতীয়মান হচ্ছিল, পৃথিবীকে এবার তার সভ্যতার সফর নতুন করে পুনর্বার শুরু করতে হবে। কারণ, সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। না গ্রন্থাগার থাকবে, না বিদ্যাপীঠ থাকবে। না পণ্ডিতরা থাকবে, না শিক্ষিতজনরা থাকবে। তারা উঠেছিল তুর্কিস্তান থেকে। কিন্তু ইউরোপের মানুষও তাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। ইউরোপের নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত কয়েকজন ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলির বরাতে এখানে আমি তার কয়েকটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি।

গিবন তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Decline And F all Of The Roman Emapire (রোমান সভ্যতার পতনের ইতিহাস)-এ লিখেছেন :

'সুইডেনের অধিবাসীরা রাশিয়ার মাধ্যমে তাতারি ঝড়ের সংবাদ শুনল। তাতেই তাদের ওপর এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে, ইংল্যান্ডের উপকূলীয় অঞ্চলে শিকার খেলতে যাওয়া তাদের নিত্যদিনকার কাজ ছিল; কিন্তু তাতারিদের ভয়ে তারা এই শিকারভ্রমণে যাওয়া একদম বন্ধই করে দিল।'[১]

এইচ জি উইলস বলেছেন :

'যদি কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বক্তা সপ্তম শতাব্দির গোড়ার দিকে পৃথিবীর পরিসংখ্যান নিতেন, তা হলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যে, মাত্র কয়েকশো বছরে গোটা ইউরোপ ও এশিয়া মোঙ্গলদের শাসনাধীনে চলে আসবে।'[২]

হেরাল্ড লেম্ব লিখেছেন :

'চেঙ্গিসখানের ধ্বংসলীলা ও লুণ্ঠন সভ্যতাকে এমন গুরুতরভাবে আহত করল যে, অর্ধেক পৃথিবীতে সভ্যতাকে মরে নতুনভাবে জন্মাতে হয়েছিল এবং খাওয়ারিজমের সাম্রাজ্য, বাগদাদের খেলাফত, রাশিয়ার প্রজাতন্ত্র এবং দিনকতকের জন্য পোল্যান্ডের শাসনক্ষমতা অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে গিয়েছিল।'[৩]

কিন্তু হলো কী? কতিপয় সাধকপুরুষ, জনকতক হৃদয়বান মানুষ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা চেষ্টা চালালেন। ওদের কাছাকাছি গেলেন। আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিলেন। আল্লাহর গজবের ভয় দেখালেন। মানুষকে ভালোবাসার উপদেশ দিলেন। নিজেদের চরিত্র দ্বারা, আধ্যাত্মিকতা দ্বারা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা দ্বারা, মানবতার প্রতি নিজেদের সহমর্মিতা দ্বারা তাদের হৃদয়গুলোকে জয় করে নিলেন। তাদের অন্তরগুলোকে এত কোমল বানিয়ে নিলেন যে,

---

১. *V. V11, p. 16, 3rd ed, Lobdon, 1909*
২. *A Short Histpry Of The World, 1924, P. 140*
৩. *Genghis Khan, P. 206, Londob 1928*

সেগুলো একেবারে মোম হয়ে গেল, যার এত কাহিনি আছে যে, বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

সেই সূফী-দরবেশদের সম্পদের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। এতই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, অল্পকজন ব্যতীত তাঁদের অধিকাংশেরই নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নিজেদের নামগুলো পর্যন্ত তাঁরা গোপন করে রেখেছিলেন। তাঁরা গোটা তাতারি প্রজন্মটাকে মানুষ বানিয়ে দিয়েছিলেন। এমন মানুষ বানালেন যে, তাদের মাঝে লেখকও তৈরি হলেন, বড়-বড় আইনবিদও সৃষ্টি হলেন, বড়-বড় সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতাও জন্ম নিলেন। তাঁরা মানবীয় সভ্যতার সুরক্ষা নিশ্চিত করলেন এবং কয়েকশো বছর পর্যন্ত বিশ্বকে নেতৃত্ব দানের যোগ্য হয়ে গেলেন।

তো আমার ভাইয়েরা! কোনো রাষ্ট্রের ওপর, কোনো গোষ্ঠীর ওপর – আমাকে ক্ষমা করুন; আমি স্পষ্টই বলব – কোনো সমাজের ওপর, কোনো চিন্তাধারার ওপর, কোনো সভ্যতার ওপর যদি এই আপদ নেমে আসা, তার রোগগ্রস্ত হয়ে পড়া, তার মাতালতার শিকার হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। এমনটি বারবারই হচ্ছে।

কিন্তু ভয়ের আসল কারণটা হলো, এই আপদটা দূর করতে, মানুষগুলোকে ফের মনুষ্যত্বের সীমানায় ফিরিয়ে আনতে, মানুষকে মানুষ বানাতে, মানুষকে জুলুম থেকে, রক্তক্ষয় থেকে ভয় দেখাতে, মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে, আপন দেশের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষা, সত্যিকার দেশপ্রেম, সত্যিকার জাতীয়তা ও নিজের দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে কোনো একটি গোষ্ঠীর উঠে না দাঁড়ানো। এটা হলো ভয়ের বিষয়।

যে-ব্যক্তির দর্শন ও ইতিহাসের ওপর চোখ আছে, ধর্মীয় শিক্ষার ওপর চোখ আছে, আসমানি গ্রন্থটি পড়েছেন, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের বাণী ও মুখনিঃসৃত কথামালা পড়েছেন, তিনি জানেন, এই আপদ তো আসতে থাকে বটে– বিত্তপূজার আপদ আসে, প্রবৃত্তিপূজার আপদ আসে,

মানুষ থেকে বিমুখ হওয়ার আপদ আসে, মানুষের মুখ দেখা ভালো না লাগার আপদ আসে, জুলুম করে স্বাদ পাওয়ার আপদ আসে। বৈধ বিনোদন ও স্বাভাবিক মজার বিষয়গুলোতে স্বাদ না পাওয়ার আপদ আসে ইত্যাদি। এটা একটা ব্যাধি। এটা মানবতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অধঃপতন। এটা সর্বশেষ স্তরের লাঞ্ছনা। কিন্তু মানুষ এর শিকার হয়। অতীতেও হয়েছে; এখনও হচ্ছে। যদি বলি, হাজারোবার মানুষ এর শিকার হয়েছে, তা হলেও ভুল হবে না। তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। এখন আর তারা মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে চলতে পারবে না। তাদের ছেলেমেয়েরা এখন আর লেখাপড়া করতে পারবে না। তাদের নারীরা ইজ্জতের সাথে বাঁচতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ বাতাসের গতি বদলে গেল। বসন্তের এমন একটা ঝাপটা এল, রূহানিয়াতের এমন একটা ঝাপটা এল এবং ত্যাগের এমন একটা জযবা তৈরি হয়ে গেল যে, মানুষ তাদের জীবনের পরোয়া করল না, ইজ্জতের পরোয়া করল না, পদের পরোয়া করল না, শরীর-স্বাস্থ্য ও জীবনের পরোয়া করল না। ভয়ের কালো মেঘ কেটে গেল। কুয়াশা দূর হয়ে গেল। যে-মানুষ বিবেক-বুদ্ধি একেবারে হারিয়ে বসেছিল, চৈতন্য খুইয়ে বসেছিল, মুখে রক্ত এসে পড়েছিল, কোনো খাবারে রুচি আসত না, মানুষের রক্ত ঝরানোতে স্বাদ পেত, সেই মানুষগুলো মানুষ ও মানবতার প্রহরী হয়ে গেল। যারা দস্যু-তস্কর ছিল, তারা পাহারাদার-চৌকিদার হয়ে গেল। যারা ঘাতক ছিল, তারা চিকিৎসক ও রোগনিরাময়কারী হয়ে গেল।

এমন একটা যুগও অতীত হয়েছে, মানুষ নিজের সন্তানদের দেখে খুশি হতে পারত না। আজকালও কোথাও-কোথাও এমনটা হচ্ছে যে, মানুষ নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের দেখে আনন্দিত হয় না। বাচ্চারা মুখে হাসি ফুটিয়ে দৌড়ে আসে যে, বাবা আমাদের আদর করবেন। কিন্তু আদরের পরিবর্তে বাবার চোখে অশ্রু নেমে আসে যে, কাল না-জানি

আমার এই সন্তানের কী পরিণতি হয়! কবে যেন এর ওপর হিস্টিরিয়ার আপদ এসে পড়ে। এই শিশুগুলোকে আমাদেরই চোখের সামনে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। হাজারো আক্ষেপ, হাজারো লজ্জা এমন জীবনের জন্য যে, মানুষ তার কলিজার টুকরা সন্তানদের চোখের শীতলতা, মনের শান্তি ভাববার পরিবর্তে তাদের দেখে শঙ্কা অনুভব করবে, না-জানি কখন উন্মাদনার একটা আপদ এসে পড়ে! মাতালতার একটা ঝড় এসে পড়ে! আর তারপর কোনো ভদ্র নারী ভদ্র থাকবে না। নিষ্পাপ শিশু নিষ্পাপ থাকবে না। এতিমকে এতিম মনে করা হবে না। অসহায়ের ওপর দয়া করা হবে না। বিধবাদের জন্য কারও মনে মমতা থাকবে না।

এটা একটা ব্যাধি। মানবীয় প্রকৃতির ও আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যর একদম পরিপন্থী। আল্লাহর নবী-রাসূলদের শিক্ষার একেবারে উলটা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমনটা হচ্ছে, এমনটা ঘটছে। আর যা ঘটে, তার আলোচনাও করতে হয়। মনের ওপর পাথর বেঁধে আলোচনা করুন। চোখের ওপর পট্টি বেঁধে আলোচনা করুন। কেঁদে-কেঁদে, চিৎকার করে-করে, কুঁকিয়ে-কুঁকিয়ে বলুন। আহাজারির সাথে বলুন। কিন্তু তারপরও বলতে হবে। তারপরও বলতে হবেই। লেখকদের লিখতে হবে। ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ইতিহাস সেগুলো লিখে রেখেছে। নতুন-নতুন প্রজন্ম সেগুলো পড়ে আর বলে, এরা কারা ছিল? কোন বংশের ছিল? কোন এলাকার মানুষ ছিল? এদের কী হয়েছিল? এই উন্মাদনার আপদটা এদের ওপর কীভাবে এসেছিল? এদের মানবতা তখন কোথায় চলে গিয়েছিল? ভেতর থেকে হৃদয়টা কি খুলে এরা ফেলে দিয়েছিল? চোখগুলো কি তখন এদের সাথে ছিল না? মানুষের দেহ থেকে রক্ত ঝরতে দেখেও কি এদের চোখে পানি আসেনি? যেখানে রক্ত ঝরেছে, সেখানে অন্তত পক্ষে অশ্রু তো ঝরা দরকার

ছিল। একটু অশ্রু ঝরালে কী আর ক্ষতিটা হতো। কিন্তু না; তারা পাষাণহৃদয় ছিল। কারণ, তারা মানুষকে পরিমাপ করত ধর্মের পাল্লায়। ধর্মই নয় শুধু; তারা মানুষ মাপত ইতিহাসের পাল্লায়। তারা মানুষ মাপত হাজারো বছর আগের গল্প-উপাখ্যানের পাল্লায়। এই গল্প-উপাখ্যান তাদের কাছে একটি জীবন্ত বস্তু ছিল আর চিরঞ্জীব আল্লাহ তাদের কাছে জীবিত ছিলেন না। পৃথিবীর এই যে জৌলুস, এই যে মানবতা ফুলের মতো ফুটে আছে, এই যে কিতাবের স্তূপ তৈরি হচ্ছে, গ্রন্থাগার ভরে উঠছে, এর মূলে আছে মানুষ। মানুষ আছে বলেই জগতের এত শোভা। মানুষ না থাকলে জগতের মূল্য কী!

মানুষই এই জগতের বাহার। মানুষেরই দ্বারা এর জৌলুস বিদ্যমান। মানুষেরই দ্বারা এর চমক টিকে আছে। আপনি কবরস্তানে চলে যান। ওখানে কি আপনার মন বসবে? বসবে না। চলে যান জাদুঘরে। ওখানে কি থাকতে আপনার মন চাবে। কত রকম পশু-পাখি, জীবজন্তু! কত রকম কীর্তি ও শিল্প! কিন্তু ওখানে আপনি থাকতে পারবেন না। এক পাক ঘুরবেন আর ফিরে আসবেন।

কিন্তু মানুষের আলয়ে থাকতে মানুষ ভয় পায় না। বনে চলতে মানুষ ভয় পায়। আল্লাহর কাছে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি নিরাপদে মানুষের আলয়ে পৌঁছিয়ে দাও। মানুষ যদি মানুষকে ভালো না বাসে, মানুষ যদি মানুষের দুঃখ-দরদ না বোঝে, মানুষ যদি মানুষকে মায়া না করে, মানুষ যদি মানুষকে সহানুভূতি না দেখায়, তা হলে এ মানুষ নয়। এর আর নেকড়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বাঘ-নেকড়ের প্রশংসা করে কি কেউ? এমন কোনো মানুষ আছে কি, যে বাঘ-নেকড়েকে ঘৃণা করে না? কে আছে এমন, বাঘ-নেকড়ের আচরণে কষ্ট পায় না? এত বড় মজমাটার মধ্যে আছেন কি এমন কেউ, যিনি বলবেন, আমি বাঘ-নেকড়েকে ঘৃণা করি না? কিন্তু মানুষ যখন নেকড়ে হয়ে যায়, তখন কেন আপনার মন কষ্ট পায় না?

কেন আপনার মনে চোট লাগে না? কেন তার প্রতি আপনি ঘৃণা প্রকাশ করেন না?

আল্লাহ কি মানুষকে বাঘ-নেকড়ে হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন? মানুষকে আল্লাহ ফেরেশতা হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বন্ধু হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা দেখানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা দিয়েছেন। নেকড়ে নেকড়েই। সেই আদি কাল থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত নেকড়ে। হাজার-হাজার বছর ধরে নেকড়ে। আমি দেখিনি, কোনো কবি নেকড়ের শানে কবিতা রচনা করেছেন। কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষকে আমি আজও নেকড়েকে হিরো বানাতে দেখিনি, নিজের আদর্শ মনে করতে দেখিনি।

সাপ-বিচ্ছুকে আমরা ঘৃণা করি। বাঘ-নেকড়েকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু সেই কাজ যখন আমরা নিজেরা করি, তখন আমাদের একটুও লজ্জা লাগে না!

আমি বলি, একজন মানুষের ওপর একজন মানুষের হাত ওঠে কী করে? এই হাতের চিকিৎসা হওয়া দরকার। এই হাতকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই হাতের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া দরকার। এই হাতটা কেটে দেখা দরকার, এর মধ্যে কোন জিনিস ভরে রাখা হয়েছে এবং কার রক্ত এর মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে। এই হাত তো মানুষের গায়ে উঠবার জন্য তৈরি করা হয়নি! এই হাত তো বানানো হয়েছিল, মানুষকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে! মানুষগুলো চাই ইউরোপের হোক, চাই আফ্রিকার হোক, চাই আমেরিকার হোক। যেখানেই তার ওপর বাড়াবাড়ি হবে, সেখানেই এই হাত তা প্রতিহত করবে। যদি ঘরে হয়, তা হলে ওখানেও। যদি রাস্তায় হয়, তা হলে ওখানেও। যদি বাজারে হয়, তা হলে ওখানেও।

মাওলানা হালী বলেছেন :

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کروبیاں

'আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন প্রেম-ভালোবাসার জন্য। নাহয় ইবাদাতের জন্য ফেরেশতারা কম উপযোগী ছিল না।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ

'যারা মায়া করে, আল্লাহ তাদের মায়া করেন। যারা পৃথিবীতে আছে, তোমরা তাদের মায়া করো; তা হলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের মায়া করবেন।'

এটি খুবই আলোচিত হাদীছ আলেমরা জানেন এই হাদীছটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান পরিস্থিতির কারণে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এ সময় যে-বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হলো আমাদের ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক লিডারগণ মাঠে নেমে আসবেন এবং হাত ধরে-ধরে বলবেন, এই দেশটির ইজ্জত রক্ষা করো। এই দেশটির সুখ্যাতিতে কালিমা লেপন করো না। মানুষ হয়ে থাকো। একে অপরকে ভালোবাসো। মানুষ মানুষকে দেখবে, মানুষ মানুষকে চিনবে আর আশা রাখবে, যদি তার ওপর কোনো আপদ নেমে আসে, আমি তাকে বাঁচাব আর যদি আমার ওপর কোনো আপদ নেমে আসে, তা হলে সে আমাকে বাঁচাবে। এরই নাম জীবন। এরই নাম সভ্যতা। এরই নাম দেশপ্রেম। এর নাম রাজনীতিও। রাজনীতিও এটিই যে, রাষ্ট্রে সবাই মিলেমিশে থাকব।

বন্ধুগণ! আমাদের দেশে আপদ নেমে এসেছে। এটা উন্মাদনার আপদ। আবেগের আপদ। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

হানাহানির আপদ। অবশ্য এই আপদ সাময়িক। এটা কেটে যাবে। কিন্তু এটা দূর করার জন্য চিকিৎসক প্রয়োজন। সহমর্মী মানুষের প্রয়োজন। হৃদয়বান মানুষের প্রয়োজন, যারা আপন-আপন বাড়ি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মাথায় এই চিন্তা রাখবে না, আমরা খাব কী? আমরা পান করব কী? পাগল হয়ে এই দেশটিকে চষে বেড়াবে। দল তৈরি করে-করে ঘুরে ফিরবে। মানুষগুলোকে সমবেত করে-করে দেশের নামে, মানবতার নামে, বিবেক ও ইনসাফের নামে, আল্লাহর ভয় ও তাঁর পরিচয়ের নামে তাদের কাছে আবেদন জানাবে, এবার ক্ষান্ত হও, এবার ঠাণ্ডা হও। এবার যেটি দেশ গঠনের কাজ, উন্নতির কাজ, দেশের মুখ উজ্জ্বল করার কাজ, দেশের মর্যাদা বাড়ানোর মতো কাজ, সেটি করো। এই দেশটির অনেক দুর্নাম হয়ে গেছে। ব্যাপারটা হয়তো আপনি জানেন না। এর আগে দেশটি কখনও এমন কালিমালিপ্ত হয়নি। বহির্বিশ্বে এর আগে কখনও এই দেশটির প্রতি সেই চোখে তাকানো হয়নি, যে-চোখে আজকাল তাকানো হচ্ছে। এর মাঝে আমরা সবাই অংশীদার। হিন্দু-মুসলমান সবাই এর অংশীদার। কারণ, আমরাও ভারতীয়। আমরাও ভারতীয় হয়েই থাকব ইনশাআল্লাহ। ভারত আমাদের প্রিয়। এখানকার আবহাওয়া আমাদের প্রিয়। এখানকার সভ্যতা আমাদের প্রিয়। এখানকার ইতিহাস আমাদের প্রিয়। এখানকার সামাজিকতা আমাদের প্রিয়।

মুসলমানরা এই দেশটিকে ত্যাগ করেনি। তারা অন্য কোথাও যেতে পারত। যাওয়ার তাদের অনেক জায়গা ছিল। কিন্তু মাতৃভূমি তাদের ছাড়েনি। এটি ছাড়ানো যাবে না। কিন্তু এর জন্য আমাদের সাহসের সাথে কাজ করতে হবে। মনোবল নিয়ে মাঠে থাকতে হবে। শক্তির সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শৃঙ্খলার সাথে কাজ করতে হবে। সরকারগুলো তাদের কর্তব্য পালন করবে। স্কুল-কলেজ তাদের দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ তাদের

দায়িত্ব পালন করবে। মিডিয়া তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

দেশের তিনটি প্রতিষ্ঠান যদি খাঁজে-খাঁজে মিলে যায়, তা হলে দেশ টিকে যাবে। তিনটি প্রতিষ্ঠান হলো শিক্ষা, পুলিশ ও প্রেস। এই তিনটি এমন জিনিস, যদি এগুলো ঠিক হয়ে যায়, তা হলে আর কোনো ভয় থাকবে না। মানুষ যখন লেখাপড়া করে বের হবে, তখন আলোর পাঠ নিয়ে বের হবে। মানুষকে সম্মান করার পাঠ নিয়ে বের হবে। তারপর আসে পুলিশের পালা, যাদের মাঝে সেবার মানসিকতা থাকবে, সহযোগিতার মানসিকতা থাকবে। কোনো রাখঢাক না করে আমি আপনাদের পরিষ্কার ভাষায় বলছি। আমি জানি না, এদেশে পুলিশের কতখানি প্রতিনিধিত্ব আছে। কিন্তু আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। আমার অনেক দেশে যাওয়া হয়েছে। সেসব দেশে পুলিশকে দিশারি মনে করা হয়, সাহায্যকারী মনে করা হয়। লন্ডনে এক পুলিশ কনস্টেবলকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। লোকটি আমাকে ঠিকানা বলেই ক্ষান্ত হলো না। আমার সঙ্গে গিয়ে ঠিকানাটা দেখিয়ে দিল। ওখানে পুলিশ থাকেই একাজের জন্য, যেন কেউ কারও ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তাদের কাজ হলো, তারা দুর্বলকে সাহায্য করবে; শুধু তা-ই নয়; মানুষকে সাথে করে গিয়ে ঠিকানাটা দেখিয়ে দেবে।

ইংরেজরা তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুলিশ এজেন্সি গঠন করেছিল। পুলিশের মাধ্যমে ইংরেজরা মানুষের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিল। কারণ, তারা এসেছিল সমুদ্রের ওপার থেকে। কিন্তু আজকালকার পুলিশ কীসের জন্য? আজকাল তো হওয়া দরকার ছিল, মানুষ পুলিশ দেখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, আমি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম; মহিলারা বিপদে পড়ে গিয়েছিল, শিশুরা বিপদে পড়ে গিয়েছিল আর এই পুলিশের লোকেরা তাদের রক্ষা

করেছে। হওয়া তো দরকার ছিল এমন। এই জনমনে অনুভূতিটা-ই ব্যাপকভাবে জাগরূক থাকা দরকার ছিল।

তো আমি বলছিলাম, শিক্ষা, পুলিশ আর প্রেস যদি ঠিক হয়ে যায়, তা হলে এদেশে এজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না যেমনটা ঘটেছে। তারপরও আমি বলব, বিপদে নেমে এসেছে বলে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। রোগ ছড়িয়ে পড়েছে বলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষের জীবনে সব কিছুই ঘটবে। এটা জীবনের চড়াই-উতরাই। তবে ভয়ের ব্যাপার হলো এই বিপদ কাটানোর জন্য, এই রোগ নিরাময়ের জন্য, এই রোগীটাকে বাঁচানোর জন্য কোনো দল, কোনো সংস্থা, দেশপ্রেমিক, মানবদরদী ও নিরপেক্ষ মানুষ না থাকা। যেকোনো দেশের জন্য– চাই সেদেশের মাটি ধনভান্ডার ঠেলে বের করে দিক, তার আকাশ সোনা বর্ষণ করুক, তার নদী-নালা সোনা-রুপায় পরিণত হয়ে যায় এবং দেশটির একজন মানুষেরও জীবনে যদি কোনো অভাব না থাকে; তারপরও জীবনে শান্তি আসবে না যদি পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো ও সঠিক না হয়। যদি একজনের অপরজনের ওপর আস্থা না থাকে।

এ কেমন কথা যে, আমরা মানুষ দেখে ভয় পাব? ভয় পাওয়ার জিনিস তো বাঘ-সিংহ। ভয় পাওয়ার জিনিস তো সাপ-বিচ্ছু। মানুষ তো ভয় পাওয়ার মতো জিনিস নয়। আল্লাহ কি মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তারা মানুষকে হত্যা করবে? মানুষ মানুষকে ভয় করবে?

তাতারিদেরকে যারা মানুষ বানিয়েছেন, সভ্যতার প্রহরী বানিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন আল্লাহওয়ালা মানুষ। তাঁরা ছিলেন হৃদয়বান মানুষ। তাঁরা ছিলেন রূহানি মানুষ। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা সহজ ছিল না। ইংরেজদের সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশের আম্পায়ার অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা শৈশবে শুনেছি, 'ইংরেজদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'। আপনি কোথায় যাবেন? যেখানেই যান, কোনো-না-কোনো অঞ্চল এমন পেয়ে যাবেন, যেখানে

সূর্যের আলো আছে। এখান থেকে নিয়ে আদন পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ছিল। এই ভূখণ্ডে কোনো একদিন স্বাধীন হবে সে ছিল একটি স্বপ্ন। কিন্তু হিন্দু ও মুলমানরা, যারা দেশপ্রেমিক ছিল গান্ধীজির সাথে, মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলীর সাথে, মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লি ও শায়খুল হিনদ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর সাথে, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি ও নেহরুর সাথে যোগ দিয়ে স্লেগান তুলল, ইংরেজদের বয়কট করো। গান্ধীজি ও মাওলানা আযাদ সবার আগে ছিলেন। সে-সময় হিন্দু ও মুসলমান আপন সংস্কৃতির বিরোধ সত্ত্বেও, ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত ছিল, যেভাবে ঘি আর চিনি পরস্পর মিশে যায়, যেভাবে দুধ আর পানি পরস্পর মিশ্রিত থাকে।

তখন আমার জীবনের শুরুর সময়। আমিনাবাদ পার্কে আমি গান্ধীজির ভাষণ শুনেছি। আমি মোতিলাল নেহেরুকে দেখেছি। মাওলানা আযাদের সঙ্গে তো আমার সম্পর্ক ছিল পুরনো। এরা কজন মিলে 'না-হওয়ার মতো' একটি বিষয়কে 'হওয়া বিষয়' বানিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল। তার আগে কেউ যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা মুখে উচ্চারণ করত, তা হলে মানুষ বলত, মিয়া! তোমার মাথাটার আগে চিকিৎসা করাও। ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব নাকি? কিন্তু এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, এই দেশপ্রেম ইংরেজদের হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করল।

তারপর তিনটি বিষয় ছিল। গান্ধীজি ও তার সাথিরা এবং মাওলানা আযাদ (মাওলানা আযাদই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ও অগ্রগামী ছিলেন) শর্ত হিসেবে এই তিনটি বিষয় উপস্থাপন করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো থাকবে, ততক্ষণ ভারত স্বাধীন থাকবে, শান্তিময় থাকবে, সমৃদ্ধ থাকবে, সম্প্রীতির দোলনা হয়ে থাকবে। এক.

ধর্মনিরপেক্ষতা, দুই. গণতন্ত্র, তিন. অহিংসা। দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় এই তিনটি বিষয় জরুরি। এগুলো থাকবে তো দেশ থাকবে। পণ্ডিতগণ শুনে রাখুন। ইতিহাসবিদগণ শুনে রাখুন। সবাই শুনে রাখুন। এই রাষ্ট্রটি এই তিনটি বিষয় ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। আমি আবারও বলছি, এ-দেশটি কেবল তিনটি বিষয়ের ওপরই টিকে থাকতে পারে। রাষ্ট্রটি হবে গণতান্ত্রিক, অহিংস ও ধর্মনিরপেক্ষ। কারণ, আল্লাহর বণ্টনই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে, এ-দেশে হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে, জৈনও থাকবে, বৌদ্ধও থাকবে, শিখও থাকবে, খ্রিস্টানও থাকবে। আর আল্লাহর ফয়সালা বদলানো যায় না।

কাজেই এ-দেশটি এভাবেই টিকতে পারে যে, এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে। এক আরব কবি বলেছেন, 'আগুন যখন খাওয়ার মতো আর কিছু পায় না, তখন নিজেকে খেতে শুরু করে।' আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, আপনারা যদি মুসলমানদের থেকে আল্লাহ না করুন – আমি কোন মুখে বলব? কিন্তু তারপরও বলতে হচ্ছে – ছুটি নিয়ে নেন, যদি মুসলমানদের প্রিয় ও পবিত্র স্থানগুলোকে নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেন, তা হলে মনে রাখবেন, এই বিরোধ আপনাদের মধ্যেও শুরু হয়ে যাবে। জৈনরা, বুদ্ধিষ্টরা দাঁড়িয়ে যাবে, আমাদের উপাসনালয়গুলো ফিরিয়ে দাও। অষ্টম খ্রিস্টসনে সাউথে শঙ্কর আচারিয়া জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি সবগুলো বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমি ওখানে গিয়ে দেখেছি। নালন্দার বুদ্ধিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়টিও আমি দেখেছি, যেটি খননের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল। জায়গায়-জায়গায় দেখেছি, জৈনদের হাজার-হাজার মন্দির বদলে গেছে। হাজার-হাজার বৌদ্ধমন্দির হিন্দুদের হাতে চলে গেছে।

রাজিবজি থেকে শুরু করে যখনই যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, আমি তাঁকে পত্র লিখেছি। আমার সেই চিঠিগুলো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমি লিখেছি, ইতিহাসকে উলটা ভ্রমণ করাবেন না। ইতিহাসকে উলটা ভ্রমণ করানো

মারাত্মক ভুল। ইতিহাসকে সামনের দিকে নিয়ে যান। সুযোগ কোথায় অত? কটা দিনের এই জীবন?

আমাদের উপায়, উপকরণ, সুযোগ, সম্ভাবনা-ই আর কতটুকু? কত-কত বিপদ সামনে আসছে। কতজন লোক আছেন, যাদের বয়স একশো অতিক্রম করে? শত বছর আয়ু পান কতজন মানুষ? তারপরও কেন এই সময় নষ্ট করা? কেন আমরা ইতিহাসকে উলটা দিকে ভ্রমণ করাতে যাব? কেন নিজের শক্তি ও যোগ্যতাকে নষ্ট করব? ইতিহাসকে আগে বাড়ান। দেশটাকে সামনের দিকে নিয়ে যান। এ কেমন ব্যাধি যে, দেশটাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে? যদি এমনটা চলতে থাকে যে, আগে এমন ছিল, অমন ছিল, তা হলে এর থেকে অবসর আর হওয়া যাবে না। এর ফলে এমন অশান্তি তৈরি হয়ে যাবে যে, জীবনের কোনো স্বাদ থাকবে না। ভারতের নামটা-ই ডুবে যাবে। তার নামের ওপর মাটির আস্তর পড়ে যাবে। এখানে যেসব বীর পুরুষ, পণ্ডিত ব্যক্তি ও দার্শনিক জন্মেছিলেন, তারা সবাই চুপসে যাবেন। তারপর সামনে রয়ে যাবে সেই ভারত, যেখানে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়, সেই ভারত, যেখানে মানুষকে কেটে টুকরা-টুকরা করা হয়, সেই ভারত, যেখানে মানুষকে করাত দ্বারা লাকড়ির মতো চিরা হয়, সেই ভারত, যেখানে নিষ্পাপ শিশুদের চলন্ত ট্রেন থেকে তুলে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়।

আপনি নক্ষত্র পর্যন্ত পৌঁছে যান। চাঁদের দেশে চলে যান। কিন্তু যেমনটি এক ভারতীয় দার্শনিক বলেছিলে– সিএম জোয়াড লন্ডনে দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি লিখেছেন, এক ভারতীয় দার্শনিক এসেছিল। খুবসম্ভব রাধা কৃষ্ণ ছিলেন। আমাদের এখানকার বড় মাপের একজন মেধাবী ও বাকপটু মানুষ ছিলেন। তো জোয়াড বললেন, জানেন, আমরা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছি! আমরা চাঁদে পৌঁছে গেছি। এত দীর্ঘ দূরত্ব আমরা মাত্র ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে অতিক্রম করে ফেলেছি। আমরা এক

মহাদেশের অমুক প্রান্ত থেকে আরেক মহাদেশের শেষ প্রান্তে উড়োজাহাজে করে পৌঁছে গেছি।

ভারতীয় দার্শনিক চুপচাপ শুনতে থাকলেন। সব শোনার পর বললেন– 'হাঁ; পানির ওপর তোমরা মাছের মতো সাঁতরাতে শুরু করেছ। শূন্যে পাখির মতো উড়তে শুরু করেছ। কিন্তু মাটির ওপর মানুষের মতো হাঁটতে শেখনি।'

ডক্টর যাকির হুসাইন খান সাহেব এই উক্তিটিকে কোড করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০সালা জুবিলিতে আমিও ওখানে উপস্থিত ছিলাম।

একটা নবজাতক যখন দুনিয়াতে আসে, তখন সাথে করে সে প্রমাণ নিয়ে আসে, আল্লাহ মানুষ থেকে হতাশ নন। নাহয় এই বাচ্চাটাকে তিনি দুনিয়াতে পাঠাতেন না। কিন্তু আমাদের কর্ম বলছে, আমরা মানুষ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছি। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, মানুষ আসলে জিনিসটা কী। আল্লাহ তাকে সেই হৃদয় দিয়েছেন, যেটি তাঁর আর কোনো সৃষ্টিকে দেননি। আমি বরং বলব, এই অন্তর আল্লাহ ফেরেশতাদেরও দেননি। মানুষের দরদে জ্বলে, গলে, ছটফট করে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরায়, আল্লাহর কাছে চায়, প্রার্থনা করে; এমন হৃদয় আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন– আর কাউকে দেননি। এই মানুষ তো এর যোগ্য ছিল যে, একে চোখের মধ্যে বসিয়ে রাখা হবে। মাথায় স্থান দেওয়া হবে। নিজের ঘরে রাখা হবে যে, এ আমার ভাই। কিন্তু এই মানুষেরই ওপর হাত উঠছে। এই মানুষকেই পিষ্ট করা হচ্ছে। দুর্বল নারী ও নিষ্পাপ শিশুদের জুলুমের নিশানা বানানো হচ্ছে। গুজরাট, আহমদাবাদ; বিশেষ করে সুরাটে গিয়ে দেখুন; ওখানে কী ঘটেছে। গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি। আমার অনেক জায়গায় যাওয়া হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব সব জায়গাতেই আছে। জানি না, ওখানে যা-কিছু ঘটেছে– নারীদের উলঙ্গ করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে খারাপ

আচারণ করা হয়েছে। তারপর গুলি পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আচরণ না কোনো ধর্মের সঙ্গে খাপ খায়, না মানবতার সঙ্গে, না জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে, না বিবেকের সঙ্গে, না সভ্যতার সঙ্গে, না ভারতীয়পনার সঙ্গে। আপনারা হয়তো জানেন না, বাইরে থেকে ভারতকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং সে কেমন মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছিল। এখানে আল্লাহর এমন-এমন বান্দা জন্ম নিয়েছেন, যাঁদের কথা বলতে গেছে সারা দিনেও বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আপনাদের থেকে আমি বেশি সময় নেব না।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে আমি আবারও বলছি। নোট করে রাখার মতো কথা, আজীবন মনে রাখার মতো কথা। রোগ ভয় পাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। রোগের চিকিৎসা করার মতো কেউ না থাকা ভয়ের বিষয়। রোগীর রোগ দেখে অস্থির হওয়ার মতো লোকের অভাব, রোগীর রোগ দেখে চিকিৎসা করানোর চেতনাধারী লোকের অভাব সব দেশের জন্য, সকল সমাজের জন্য, প্রতিটি সভ্যতার জন্য, প্রতিটি যুগের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই যে-জগতটা এখন টিকে আছে, এটি তার চিকিৎসকদের বদৌলতে টিকে আছে। প্রথমত, নবীদের বরকতে। তারপর সূফী, হৃদয়বান, সহমর্মী ও মানবপ্রেমিক ব্যক্তিদের বরকতে টিকে আছে, যাঁরা আরাম ত্যাগ করেছেন, পানাহার ভুলে গেছেন, পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে গেছেন, মানুষকে ব্যথা থেকে বাঁচাতে, মানুষকে মানুষের খড়্গ থেকে নিরাপদ রাখতে, মানবশত্রুতার নিরাময় করতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা অনাহারে সময় কাটিয়েছেন, নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং পাগলের মতো বেরিয়ে পড়েছেন। আজ এই দেশটিতেও এমন লোকদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আমি আশা করি, এই সম্মানিত ভাইয়েরা, যাঁরা এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এবং যাঁরা জায়গার অভাবে মঞ্চে

বসতে পারেননি, এঁরা সবাই এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুল ও ধর্মীয় নেতারা বেরিয়ে আসবেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবেলার চেষ্টা চালাবেন, যাতে এমনটা দ্বিতীয়বার আর না ঘটতে পারে। যা ঘটে ঘটুক; এমন ঘটনা যেন আর ঘটতে না পারে। আপনি যদি আল্লাহর বান্দাদের সেবা করেন, তা হলে আল্লাহ খুশি হন। জগতে আমরা যা-কিছু দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এমনকি মসজিদ-মন্দিরগুলোও মানুষেরই জন্য। ওখানে গিয়ে তো পশুরা উপাসনা করে না – মানুষই করে।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

স্বাধীনতার সঠিক মর্ম ও উপকারিতা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

ছোট মাতৃভূমি রায়বেরেলি আর বড় মাতৃভূমি ভারতের অধিবাসীগণ! সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং সময়ের দাবিতে রায়বেরেলিতে একটিমাত্র ডাকে এত বিশাল একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি খুবই গর্বিত। রায়বেরেলির ইতিহাসের বিচারেও এটি রায়বেরেলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই রায়বেরেলি নামটি আপনি তাজিকিস্তান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তানে গিয়ে উচ্চারণ করুন। অনেকগুলো আরব দেশে গিয়ে উচ্চারণ করুন। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে সেই অঙ্গনগুলোকে উচ্চারণ করুন, যারা এসলাহি আন্দোলন ও নানা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও সংগ্রামের সাথে পরিচিত এবং এ-বিষয়ের পড়ালেখা করেন, তা হলে দেখবেন, রায়বেরেলি নামটির সঙ্গে তারা পরিচিত এবং আপনাকে তারা পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরের সাথে বরণ করে নেবেন।

এটি কেন? এই খ্যাতি ভারতের বড় কোনো শহরের নেই। এখানে কোনো প্রত্নতত্ত্ব বা দর্শনীয় কোনো জায়গা নেই। এটি শুধু এ কারণে যে, এখানে কজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

জন্ম নিয়েছেন। এটি এমন কয়েকজন ব্যক্তির মাতৃভূমি ও জন্মস্থান, যাঁরা হিন্দুস্তানকে স্বাধীন করার সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.), যিনি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি এমন একদল মানুষ গঠন করেছিলেন, যাঁরা নিজেদের স্বভাব, চরিত্র আল্লাহভীতি, মানবপ্রেম, সুউচ্চ সাহস, দূরদর্শিতা ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ছিলেন। এ-কাজের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের শাসকমণ্ডলী ও প্রভাবশালী লোকদের কানে আওয়াজ পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মনে মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও শঙ্কার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তার কয়েকটি নমুনা আমি এখানে উপস্থাপন করছি।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ গোয়ালিয়ার রাজা হিন্দুরাওকে একপত্রে লিখেছিলেন :

'জনাবের ভালোভাবেই জানা আছে, সমুদ্রের ওপার থেকে আসা এই বণিক বিদেশি লোকগুলো আমাদের সাম্রাজ্যের কর্ণধার সেজে বসেছে। বড়-বড় সরকারগুলোর শাসনক্ষমতা এবং তাদের মান-মর্যাদা তারা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। যেলোকগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনীতির মাঠের লোক ছিলেন, তারা আজ হাত গুটিয়ে বসে আছে। সেজন্য বাধ্য হয়ে কয়েকজন গরিব নিঃসম্বল মানুষ কোমরে সাহস বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে।'

গোয়ালিয়ার রাজ্যের উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্মকর্তা গোলাম হায়দার খানকে একপত্রে লিখেছেন :

'ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশ বিদেশিদের দখলে চলে গেছে এবং তারা প্রতিটি জায়গায় নিপীড়ন চালাচ্ছে। ভারতবর্ষের শাসকদের শাসনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু তাদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর কোনো ব্যাকুলতা কারও মাঝে দেখা যাচ্ছে না। বরং সবাই তাকে মনিব ভাবতে শুরু করেছে। যেহেতু বড়-বড় সরকারগুলোও তাদের

মোকাবেলার চিন্তা পরিত্যাগ করে বসেছে, সেজন্য কয়েকজন দুর্বল ও অখ্যাত মানুষ দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিয়েছে।'

১৮৫৭ সালের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এবং গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজ সরকারের দাসত্বে চলে যাওয়ার আশঙ্কাকে সামনে রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেই যুদ্ধে এ-দেশের অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার ও তার দোসরারা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা নাম দিয়েছিল, যার ধারা আজও পর্যন্ত চলে আসছে। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক স্যার উইলিয়াম হান্টার পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন :

'১৮৫৭ সালের বিশ্বাসঘাতকতায় সাইয়িদ সাহেবের জিহাদ আন্দোলনের অবশিষ্ট অঙ্গারগুলো কাজ করে যাচ্ছিল।'

ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল। এই চেষ্টা-সাধনা এবং এর নিষ্ঠাবান ও দূরদর্শী নেতারা সারা বিশ্বে একটি মর্যাদার আসনে আসীন হলেন। তাঁদের কীর্তি স্বীকৃতি পেল। সমকালীন বিশ্ব ও পরাধীন রাষ্ট্রগুলোর জন্য তাঁরা একটি শানদার নজির ও সাহসজাগানিয়া কীর্তি উপস্থাপন করলেন। কারাগারগুলোকে আসামি দ্বারা ভরে দিলেন এবং বিশ্বের সামনে নানা ধরনের কুরবানি পেশ করলেন। এই আন্দোলন ভারতবর্ষের সুনাম কুড়িয়ে আনল। পৃথিবীর আরও যে-কটি দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের রত ছিল, একে তারা নিজেদের জন্য একটি নমুনা ও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত মনে করল। আজও অনেক এশীয় ও পাশ্চাত্য দেশে ভারত নামটি অনেক সম্মানের সাথে উচ্চারণ করা হয় এবং স্বাধীনতার লড়াকুদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হয়।

প্রয়োজন ছিল, যেকোনো মূল্যে এবং সব ধরনের ত্যাগের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার এই নেয়ামত ও কীর্তিটিকে সুরক্ষিত রাখা, এর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখা, এর জন্য প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি জায়গায় গর্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

দরকার ছিল, গোলামির যুগের কল্পনায় আমাদের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে, আমাদের ভেতরে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার একটি চেতনা সৃষ্টি হবে এবং কোনো অবস্থাতেই আমরা সেই যুগে ফিরে যাওয়ার কল্পনা এবং তাকে প্রাধান্য দেওয়ার চিন্তাও সহ্য করব না।

কিন্তু এক্ষণে মনের ওপর পাথর রেখে, নিজের বিবেক ও শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, আজ আমাদের দেশে যে-অবস্থা বিরাজ করছে, বিশেষ করে (৬ জিসেম্বর ১৯৯২-এর পর থেকে) বড়-বড় কয়েকটি শহরে স্বদেশি ও দেশীয় ভাইদের সঙ্গে যে-আচরণ করা হলো, যে-নির্মমতা ও নির্দয়তার সঙ্গে হাজার-হাজার মানুষের রক্ত ঝরানো হলো, বসতবাড়ি ও দোকানপাট লুট করা হলো, মহিলাদের সম্ভ্রম লুট করা হলো, শিশুদের মাটির পাত্রের মতো ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো, শত-শত কোটির রুপির সম্পদ লুণ্ঠন করা হলো, বিনষ্ট করা হলো, রণাঙ্গনের মতো ভীতিকর একটা পরিস্থিতি কয়েক সপ্তাহজুড়ে অব্যাহত রইল; এসব ঘটনা দেশটিকে এমন একটি স্তরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল, বিপুলসংখ্যক মানুষ দাসত্বের যুগটাকে স্মরণ করতে এবং এ যুগের ওপর সেই যুগটিকে প্রাধ্যান্য দিতে শুরু করেছেন। বরং সেই যুগটিতে ফিরে যাওয়ার কামনা করতে শুরু করেছেন। সেযুগে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, নারীদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল। শিশুদের ওপর কুদৃষ্টিতে তাকানো হতো না। সাতসমুদ্রের ওপার থেকে এসে এদেশ শাসন করার অধিকার কারুর ছিল না। সেটি ছিল বিদেশি শাসন, যারা এখান থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে সরিয়ে নিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশান্তি ছিল যে, আমরা নিরাপদ আছি। পুলিশ ও ফৌজ ভয়ের কোনো বস্তু ছিল না। তারা ছিল ভাড়ার টাট্টু আর একটা বিদেশি সরকারের গোলাম। তাদের মাঝে স্বজনপ্রীতি ছিল না। নিজের ধর্মের লোকদের, নিজের ভাই বলে কাউকে অপরের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা

তাদের মাঝে ছিল না। নিজেদের তারা জননিরাপত্তার জিম্মাদার মনে করত। সেই যুগ ও সে-যুগের সরকারগুলোর এর চেয়ে বেশি প্রশংসা করতে আমার মন সায় দেয় না। যতটুকু বলেছি, তা-ও নিজের বিবেকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বলেছি।

তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, এখানকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মানুসারীরা আপন-আপন ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসারে জীবন কাটানোয়, তাকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর কাজে, নিজেদের মতো করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা-পরিচালনা ও নিজেদের ভাষায় পড়ালেখা করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। তাদের ওপর কোনো পুরাণতত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হতো না। সেকালে শিক্ষাকারিকুলামে জীবজন্তুর কাহিনি, কুকুর-বিড়ালের গল্প ও তাদের পরিচয় পড়ানো হতো। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের যথার্থতা বা ক্রুশের পবিত্রতার দাওয়াত দেওয়া হতো না। সে-কারণে ধর্ম যাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল, এসব ব্যাপারে তাদের কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। ভয় ছিল শুধু পশ্চিমা সভ্যতা, সমাজ, ফ্যাশন, চিন্তাধারা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মহীনতা ও বিপথগামিতার।

কিন্তু আজ এ-ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। কোনো-কোনো গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল নিজেদের শিক্ষাকারিকুলাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা বলছে, ভাষা এখন একটি-ই থাকবে হিন্দি। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে এক বিশেষ ধরনের মিথলজি (পুরাতত্ত্ব) ঢোকানো হবে। একটি পরিবর্তিত ইতিহাস পড়ানো হবে। আলাদা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুধীমণ্ডলী! এবার আমাকে মনটা চেপে ধরে এবং পুরোপুরি অপারগতার সাথে বলতে হচ্ছে, এমন বহু মানুষ আছেন, যাদের কাছে ধর্ম প্রিয়, পরিবার-সমাজ ও জাতির মর্যাদা প্রিয়; আরও সামনে অগ্রসর হয়ে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রিয়, যে-পরিবেশে অবস্থান করে তারা নিশ্চিন্তে ও

নির্ভাবনায় দীনি ও এসলাহি কাজ আঞ্জাম দিতে পারবেন, লেখালিখি করতে পারবেন, সাহিত্যচর্চা করতে পারবেন; আরও সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের কাছে উপাসনালয় প্রিয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রিয়, লাইব্রেরি প্রিয়। এমন মানুষগুলো সেই যুগের কথা বেশি-বেশি মনে করতে শুরু করেছেন। (সেই যুগটা যতই অস্বাভাবিক হোক-না কেন)। এই বিষয়গুলো তখন সাধারণভাবে নিরাপদ ও আলোচনার বাইরে ছিল।

শ্রীমতি ইন্দিরাজি যখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসীন ছিলেন, দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল এবং কোনো-কোনো জায়গায় সংখ্যালঘুদের সাথে খুব বাড়াবাড়ি চলছিল, সে-সময়ে আমি ইন্দিরাজির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বললাম, 'ইন্দিরাজি! এর চেয়ে বেশি লজ্জার বিষয় আর কিছু হতে পারে না যে, মানুষ ইংরেজদের গোলামির যুগকে স্মরণ করতে শুরু করেছে। আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতারা যদি বুঝতে পারতেন কিংবা ধারণা করতে পারতেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এমন একটা সময়ও আসতে পারে, যখন দেশের কর্ণধারদের সংকীর্ণতা ও ভুল পদক্ষেপের কারণে ইংরেজ আমলের কথা মনে পড়তে শুরু করবে আর মানুষ সেই যুগে ফিরে যেতে চাইবে, তা হলে আপনি নিশ্চিত হোন, তাঁদের প্রত্যয়, সাহস ও উদ্দীপনা কমে যেত, তাদের কর্মশক্তিতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগত, তাদের ভাষণ-বক্তৃতায় সেই জোশ ও চেতনা থাকত না, এই স্বাধীনতার লড়াই এত সহজে ও সুনামের সাথে সফল হতো না এবং সেই গন্তব্যে পৌঁছত না, যেখানে পৌঁছেছে।'

এমন একটা যুগ, যখন মানুষ নিজের সন্তানদের দেখে খুশি হবে না, নিজের দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিতাবের ভান্ডার দেখে মনে প্রশান্তি পাবে না, নিজের শ্রমের ফসল ও যোগ্যতার ফলাফলে গর্ব তো দূরের কথা; আস্থার চেতনাও তৈরি হবে না, ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ভবিষ্যতের

দিকে তাকালে সবকিছু সন্দিগ্ধ ও দ্বিধান্বিত মনে হবে; এই জীবনে কোনো স্বাদ আছে কি? এমন দেশে মানুষ কোন অর্থে নিজেকে স্বাধীন নাগরিক, দেশের গঠন ও উন্নয়নের অংশীদার মনে করবে? গোটা মানবতার ইতিহাসে মানুষের বিবেক ডেকে-ডেকে বলছে বলে শুনতে পাচ্ছি যে, দাসত্বের চেয়ে বড় দোষ, অপমান ও লজ্জার আর কোনো বিষয় নেই। আল্লাহ্ না করুন, এমন আদালত যেন গঠিত না হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে এর সাক্ষ্য দিতে হয়। তবে লাখো মানুষ এমন পেশ করতে পারব, মুখে না বললেও মনে-মনে এমনটি ভাবছে অবশ্যই। ঘরে বসে মুখে উচ্চারণও করছে হয়তো।

যে-দেশটি তার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা, নেতৃত্ব ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেদেশে এমনটা বৈধ হতে পারে না যে, তার বিশেষ একটি গোষ্ঠী বা জাতি – সংখ্যায় সে যতই গরিষ্ট হোক, যতই বিত্তের অধিকারী হোক – শুধু নিজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বোধ-বিশ্বাস, পুরাতত্ত্বের প্রচার-প্রসার, নিজেদের ভাষা ও লিখনরীতি চালু রাখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে আর অপর গোষ্ঠী, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এর কোনোটিতেই স্বাধীনতা পাবে না। তার ওপর দিন-দিন নিত্যনতুন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে এবং তারা ধীরে-ধীরে অনুভব করতে শুরু করবে, চলাফেরা আর আয়-উপার্জনে আমরা স্বাধীন বটে; কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক থেকে অপরের গোলাম। শিক্ষিতজনরা জানেন, শুধু লিখনরীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে গোটা একটি দেশের অধিবাসীদের প্রাচীন শিক্ষাগত উত্তরাধিকার ও পুরো সংস্কৃতি থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায় এবং তারা তাদের অতীত থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। একথা বোঝাতেই এক দার্শনিক আরনল্ড টয়নবি লিখেছেন, 'এখন আর কোনো লাইব্রেরি, কোনো জ্ঞানভান্ডার পোড়ানোর আবশ্যকতা নেই– লিখনরীতি বদলে দেওয়াই যথেষ্ট। এ-

পদ্ধতিতেই অতীতের সাথে এই দেশটির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।'[১]

যে-স্বাধীনতার ছায়া দেশের একাংশের ওপর পতিত হবে আর অপর অংশ বঞ্চিত থাকবে, এক গোষ্ঠীর পক্ষে স্বাধীনতার বাহার আসবে, তার বাগান পত্র-পল্লবে সুশোভিত থাকবে আর অপর জায়গায় হেমন্তের জয়জয়কার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর নিত্য-নিত্য নিষেধাজ্ঞা ও বাধা-প্রতিবন্ধকতার দৃশ্য– এর নাম স্বাধীনতা নয়।'

দিল্লি সফর, প্রধানমন্ত্রীর সাথে একাধিক সাক্ষাৎ এবং পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যকরি পরিষদের বৈঠক

আমি জানুয়ারির ৭ কিংবা ৮ তারিখে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম এবং নিজের অবস্থানের জায়গায় (মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির বাড়ি) গিয়ে অবস্থান নিলাম। সে-সময় শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ ইউনুস সালীম সাহেব (প্রাক্তন গভর্নর, বিহার) ও অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জনাব শ্রী কৃষ্ণকান্তজি দিল্লিতে অবস্থানরত ছিলেন। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর সাথে একটি বিশেষ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সাক্ষাতের জায়গাটা ঠিক করা হলো প্রধানমন্ত্রীর নিজের বাসভবনের স্থলে কৃষ্ণকান্তজির দিল্লিস্থ বাড়ি অন্ধ্র প্রদেশ ভবনে। আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী মুহতারাম মাওলানা আবদুল করীম পারিখ সাহেব, ইউনুস সালীম সাহেব এবং পারীক সাহেবের ইঙ্গিতে মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' হাসান নদবি (দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার আরবি সাহিত্য বিভাগের প্রধান, যিনি এই সফরে আমার সঙ্গে এসেছিলেন) এই সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন। আমি স্বেচ্ছায় এবং পরিকল্পিতভাবেই আমার আলোচনা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের দাঙ্গাগুলোর বৃত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখলাম এবং পরিষ্কার ভাষায় বললাম, দেশ বর্তমানে জ্বলছে এবং ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিসত্বর খবর নেওয়া দরকার। অন্যথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আমি আমার লাখনৌর সাম্প্রতিক ভাষণটি, যেটি ৬ জানুয়ারি কয়সরবাগের বারাদরিতে একটি মিশ্র জনসমাবেশে প্রদান করেছিলাম এবং পেছনে একটা

---

১. *A Study Of History p. 518, 519*

জায়গায় যেটি উল্লেখ করেছি নরসীমা রাওজির হাতে তুলে দিলাম এবং আবেদন জানালাম, এটি অবশ্যই পড়বেন। তিনি পড়বেন বলে ওয়াদা দিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। জানি না, সেটি পড়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল কি-না। কিন্তু আমি মুখে যা বলেছি, তিনি আমার পুরো বক্তব্য গভীর মনোযোগসহকারে শুনেছেন এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ-সময়ে আমি বোম্বাই থেকে পত্রপত্রিকা ও টেলিফোনের মাধ্যমে দাঙ্গা ও পাশবিক ঘটনাবলির খবরাখবর পেতে থাকি। আমি প্রায় প্রতি বছর বোম্বাইয়ে বোম্বাই-অন্ধ্র ট্রান্সপোর্ট-এর মালিক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আলহাজ গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব (মুহাম্মাদ ভাই)-এর মদনপুরাস্থ সোহাগ প্লেসে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে থাকি। এখানে আমি অতি আরামে ও শান্তিতে লেখালিখির কাজ চালানোর সুযোগ পাই। আমার বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ বই কিংবা তার বৃহদাংশ এখানে প্রস্তুত হয়েছে। তার এখানকার টেলিফোনের মাধ্যমেও বোম্বাইয়ের গুরুতর পরিস্থিতির সংবাদ পেতে থাকি, যার ফলে প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির আরও বড় ধরনের কিছু ঘটে যেতে পারে বলে অনুমান করতে পারছিলাম। বোম্বাইয়ের মুসলমানদের; বরং নাগরিক সাধারণের এবং আমার সুহৃদ মেজবানের আন্তরিকতার খাতিরে মনে একটা ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোনে একবার কথা বললাম। বললাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! অতি তাড়াতাড়ি আপনি বোম্বাইয়ের খবর নিন এবং ওখানকার মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম সুরক্ষার ব্যবস্থা নিন। তিনি ওয়াদা দিলেন এবং টেলিফোনের কিছু-কিছু সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, এক রকম ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সীমিত পর্যায়ে অভিযানও পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু শহর এখনও শান্ত ও স্থিতিশীলতার স্তরে আসেনি।

অপরদিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যকরি পরিষদের সভা চলছিল। সে-সময় বোম্বাই থেকে টেলিফোনে ও অন্যান্য মাধ্যমে অত্যন্ত উদ্বেগজনক নানা খবর এল। বৈঠক সিদ্ধান্ত নিল, এখনই একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে এবং তার কাছে আবেদন জানাবে, আপনি স্বয়ং অতি শিগগির বোম্বাই চলে যান, পরিস্থিতিটা নিজের চোখে দেখে আসুন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, প্রয়োজনে প্রশাসনে রদবদল করুন। কিন্তু তিনি যা-কিছু করেছেন, করেছেন অনেক বিলম্বে কালক্ষেপন করে এবং গতানুগতিকভাবে, যার পরিস্থিতির ওপর বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলেনি।

বোম্বাইয়ের ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ

১২ মার্চ ১৯৯৩ (মোতাবেক ১৭ রমযান ১৪১৩ হিজরি) জুমার নামাযের সময় বোম্বাইয়ে থেমে-থেমে ১৩টি জায়গায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এই বিস্ফোরণে ৩১৭ জন মানুষ প্রাণ হারায়। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা এর কয়েক গুণ বেশি। আহত হয়েছে ১ হাজার ১ শোরও অধিক মানুষ।

বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শরোদ পাওয়ার এই ঘটনাটিকে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার চুয়ান অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, এই বোমা বিস্ফোরণে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের হাত আছে এবং জনজীবনে অস্থির করে তোলা এর উদ্দেশ্য।

কলকাতায় কয়েকটি বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে অন্তত ৫৫ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং ১ শোরও বেশি আহত হয়।

এই বোমা বিস্ফোরণকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মানবতাবিধ্বংসী, নির্মম ও রক্তক্ষয়ী একতরফা সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে, যেমনটি ঘটা একেবারেই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তারপরও বুঝতে হবে, হিংস্রতা এমন একটা সংক্রামক ব্যাধি, যা একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। নানা কারণ, রাজনৈতিক, নির্বাচনি ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে তার ধারা অব্যাহত থাকে।

বোম্বাইয়ের এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার কয়েকজন বাস্তববাদী ও সাহসী নেতা ও কলামিস্টের কয়েকটা বিবৃতি এখানে তুলে ধরলাম।

> 'বর্তমানে দুটি শক্তি ভারতকে অস্থিতিশীল বানাতে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে। একটি শক্তি হলো, দেশের 'হিন্দুত্ব'পুষ্ট অংশ, যারা ১৯৯২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাবরি মসজিদকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কোনো সচেতন ভারতীয়র পক্ষে এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, বাবরি মসজিদকে নির্মমতার সাথে ধ্বংস করার ফলে দেশব্যাপী ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার পরে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের জন্য ভারত একটি উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। এই ঘটনার পরপরই অপর শক্তিটি; মানে

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ভারতকে দুর্বল বানাতে দৃশ্যপটে চলে আসে। একথা একেবারেই স্পষ্ট যে, বোম্বাই ও কলিকাতার বোমা বিস্ফোরণ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়ারই একটি প্রতিফল এবং এটি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার একটা ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর জন্য ভারতের শহরগুলোকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার দায় বিজেপি ও তার নেতাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রিত্ব ও সরকার থেকে পদত্যাগের দাবি উত্থাপনের পরিবর্তে বিজেপির জন্য এটাই সঙ্গত হবে যে, তারা তাদের নির্মম সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করে দিক এবং জনগণকে অনুমতি দিক, তারা বোমা বিস্ফোরণের শোকে বাইরে বেরিয়ে আসুক এবং দেশটাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুক।'[১]

'সম্প্রতি বোম্বাই ও কলিকাতায় বোমা বিস্ফোরণের যে-ঘটনাটা ঘটেছে, তাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে, মুসলমানরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধ নিয়েছে। আমি এর সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি, অযোধ্যার পুরো ব্যাপারটাতে মুসলমানরা যে-ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, তা প্রশংসাযোগ্য। বারবারই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, মুসলমানরা একধরনের পরাজয় অনুভব করছে। এই অভিমত মানতে আমি রাজী নই। পরাজয়ের প্রশ্ন তখন উঠত, যখন কোনোরকমের জয়ের আশা থাকত। অযোধ্যায় যা-কিছু ঘটেছে, তাতে কারুরই জিত হয়নি। সেখানে মানবতার পরাজয় ঘটেছিল। প্রতিজন মানুষ এই পরাজয় অনুভব করেছে। এটা ধর্মের প্রশ্ন ছিল না।...

'সব দিক বিবেচনায় আমি মনে করি, ভারতে বসবাসরত মুসলমানরা খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা

---

১. *দি হিন্দু* ২৩, ৩, ১৯৯৩

মাথা গরম করেনি, ক্ষুব্ধ হয়নি। যদি গভীরভাবে তাকাই, তা হলে দেখতে পাই, যেখানেই দাঙ্গা হয়েছে, তাতে সেই লোকগুলো জড়িত ছিল, যারা গুন্ডামি করে জীবন কাটায়। তাদের উসকানি দিয়েছে রাজনৈতিক নেতারা। গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মুসলমানরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে কাজ করছে। এক-দুজন এমন থাকেও যদি, তার অর্থ এই নয়, এর জন্য গোটা সম্প্রদায়কে বদনাম করা হবে। আমাদেরকে গাম্ভীর্যের সাথে অনুভব করতে হবে, সাধারণ মুসলামদের কোনো কসুর নেই। তারা তো নিত্যদিনকার প্রয়োজনীয় কাজকারবার নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এসব ঝামেলায় জড়ানোর সময়টা তাদের কোথায়? এটা স্বার্থপর মানুষদের ষড়যন্ত্র, যারা মুসলমানদের ব্যাপারে কোনো সহমর্মিতা নেই। ইসলামের সঙ্গেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য যখন ক্ষমতার সিংহাসনে বসবার সময় হয়, তখন মই হিসেবে তাদের ব্যবহার করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। সবই ঘটছে।'[১]

চন্দ্র শেখরের সত্যকথন

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও সমাজবাদী জনতা পার্টির নেতা মিস্টার চন্দ্র শেখর সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বোম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা ঠিক হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, এ-জাতীয় অভিযোগ এই দেশটির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ওপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বোর্ডপ্রতিনিধিদলের পুনর্বার সাক্ষাৎ ও স্মারকলিপি প্রদান

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ এবং তাঁর কাছে একটি স্পষ্ট ও সবিস্তার স্মারকলিপি পেশ করা সঙ্গত মনে করল এবং প্রধানমন্ত্রী এর জন্য বোর্ডকে সুযোগও দিলেন। এই প্রতিনিধিদল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে

---

১. *দৈনিক হিন্দি মেলাপ, হায়দারাবাদ*

এবং স্মারকলিপি পেশ করে। প্রধানমন্ত্রী স্মারকলিপিটি রেখে দিলেন এবং বললেন, আমি বিবেচনা করব। মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি খুবই সাবধানতা অবলম্বন করলেন, যার ফলে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। প্রতিনিধিদলের প্রধান আলোচনার সূত্রপাত করলেন। পরে অন্যান্য সদস্যরাও কথা বললেন। আলোচনা শেষ করে প্রতিনিধিদল ফিরে এল।

আরেফ মুহাম্মাদ খান সাহেবের একটি বক্তব্য ও তার খণ্ডন

আরেফ মুহাম্মাদ খান সাহেব রাজিবজির আমলে মন্ত্রী ছিলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোশের ব্যাপারে শরীয়তের অনুকূলে সুপ্রিম কোর্টের রায় পবিরবর্তনের যে-দাবি উত্থাপন করে রেখেছিলেন, সেই দাবি ও আন্দোলনের সাথে তিনি একমত ছিলেন না। পার্লামেন্টের আলোচনায়ও তিনি বিরোধিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করে রেখেছিলেন। পরে সে-কারণেই তাকে পদচ্যুত হতে হয়েছিল। সেই দিনগুলোতে তিনি একটা প্রপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান (আমি অধম) রাজিবজির সাথে সওদা করেছেন, আপনি বোর্ডের দাবিটি মেনে নিয়ে পার্লামেন্টে এর পক্ষে বিল পাশ করিয়ে দিন; বিনিময়ে আমরা অনুমতি দিচ্ছি, আপনি বাবরি মসজিদের তালা খুলিয়ে দিন এবং সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিন।

তার এই বক্তব্য কোনো-কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনেক মানুষ, যাদের নির্বিচারে এ-জাতীয় বক্তব্য ও অভিযোগ মেনে নেওয়ার অভ্যাস আছে, তারা এ নিয়ে কানাঘুষা ও বলাবলি শুরু করে দিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খান সাহেবের জানা ছিল, মসজিদের তালা আগে থেকেই খোলা ছিল এবং মিস্টার ফার্নান্ডেজের বক্তব্য অনুসারে এই পদক্ষেপ ইন্দিরাজির আমলেই সম্পন্ন হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের খুশি করতে এবং তাদের থেকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে এই সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। তারপরও জানি না, এই অপবাদ ও এই 'জেনেও না জানা'র ভিত্তি কী? হয়তোবা সরকার থেকে ছিটকে পড়ার ফলে তার গায়ে যে-দাগটা লেগেছে, সেটা তুলতেই তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যে, এর দায় পার্সোনাল ল বোর্ড ও তার চেয়ারম্যানের ওপর চাপিয়ে দিই। একাধিক উরদু পত্রিকা তার বিরুদ্ধে বিবৃতি ও নিবন্ধাদি প্রকাশ করেছিল, যেগুলোর মাঝে 'কাওমী আযাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেশিরভাগ মানুষই তার এই আচরণকে একটা প্রতিশোধমূলক চেতনা ও হীনম্মন্যতা বলে অভিহিত করেছেন।

ল বোর্ডের কর্মনীতি প্রসঙ্গে

দিল্লির পার্সোনাল ল বোর্ডের বৈঠকে আকস্মিকভাবে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটিতে এমন কিছু লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যারা সমস্যার সমাধান বের করা, মুসলমানদের পারিবারিক আইন; বরং গোটা শরয়ী আইনের সুরক্ষার জন্য এবং বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধারে এই গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক, ইতিবাচক ও গঠনমূলক কর্মনীতির সাথে পুরোপুরি সমমনা ছিলেন না, যেটি বোর্ডের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা আমীরে শরীয়ত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রহমানির চিন্তারীতি ও মেজাজ ছিল এবং আমার নিজের (বর্তমান চেয়ারম্যান) ও অধিকাংশ সহকর্মীর চিন্তারীতি ও মেজাজ। তাতে এমন কতিপয় সংগঠন-সংস্থারও দখল আছে, যারা মাঠের কার্যক্রম ও মুসলমানদের মাঝে জোশ-জযবা ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার উপাদান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিষয়টি বিশ্বাস করেন। আমার বিগত প্রচেষ্টা ও রচনাবলি থেকে পাঠকবৃন্দ এতক্ষণে নিশ্চয় পরিষ্কার বুঝে ফেলেছেন, আমি ভারতে সেই পরিবেশটি তৈরি ও বহাল থাকা জরুরি মনে করি, যেখানে ইসলামের পরিচিতি ও তার দাওয়াত-তাবলীগের কাজ চলতে পারবে, 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর আন্দোলনও চালিয়ে নেওয়া যাবে এবং 'সহাবস্থান'-এর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি ও তার জন্য পরিবেশ সমতল হওয়ার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

দিল্লির বৈঠকের পর থেকে এ বিষয়টিতে অনেক তালগোল পাকিয়ে গেল এবং সংশয় তৈরি হয়ে গেল। তার একটা প্রধান কারণ ছিল কতিপয় ভিন্ন সংগঠনের সম্মানিত ও প্রভাবশালী সদস্যের তরফ থেকে বোর্ডের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন এবং বাবরি মসজিদ বিবাদের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রায়শই এক জায়গায় উভয় সংগঠনের সমাবেশের আয়োজন। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমি জরুরি মনে করলাম, এ-ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং এমন লোকদের দ্বারা বোর্ডের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করাতে হবে, যারা বোর্ডের চিন্তাধারা, কর্মনীতি অনুসারে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন। 'কাওমী আযাদ'-এর প্রতিনিধি হুসাইন আমীন সাহেবের এ-জাতীয় এক প্রশ্নের উত্তরে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম। তার একটি চয়ন এখানে তুলে ধরলাম :

> 'মাওলানা বলেছেন, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ভারতে মিল্লাতের সমস্যাবলির সমাধানের জন্য ইসলামি শরীয়তের

বিধিবিধানের গণ্ডির মধ্যে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করাকেই সঙ্গত ও উত্তম মনে করছে এবং এখনও পর্যন্ত এই নীতিরই অনুসরণ করে আসছে।

মিল্লাতের সমস্যাবলিকে নানা পন্থায় সমাধান করতে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনও হতে পারে। সেগুলোর সম্মিলিত সংগঠন 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত' এবং কিছু দিন যাবত 'অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল'ও আছে, যারা নিজ-নিজ আঙ্গিকে দায়িত্ব পালন করছে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এই দলগুলোর সাথে কোনো প্রকার বিরোধ পোষণ করে না। কারণ, প্রত্যেকের নিজস্ব একটা কর্মপন্থা আছে। পার্সোনাল ল বোর্ডের একাধিক দায়িত্বশীল সদস্যও সেই দলগুলোর সাথে আছেন, যারা তাদের প্লাটফর্ম থেকে তাদেরই কর্মনীতি অনুসারে দায়িত্ব পালন করছেন। বোর্ড ও সেই সংগঠনগুলো কোনো-কোনো সময় একই জায়গায় সমাবেশ করার কারণে এই সংশয় আরও জোর পেয়ে যায়। আমি নিজেকে পার্সোনাল ল বোর্ডের সাথে এজন্য সম্পৃক্ত রেখেছি যে, এটি মিল্লাতের একটি কর্মতৎপর ও প্রতিনিধিত্বশীল প্লাটফর্ম এবং এর সাথে জড়িত লোকগুলো অধিকাংশই আলেম। তা ছাড়া তার প্রধান লক্ষ্য ইসলামি আইনের সুরক্ষা, সমাজ সংশোধন, মুসলমানদের ধর্মীয়, জাতীয়, ভারসাম্যপূর্ণ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।'[১]

অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এবং একটি জরুরি পদক্ষেপ

দিল্লিতে ৯ জানুয়ারি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মিটিং-এ ৭ সদস্যের কমিটি গঠনের কাজটি এত তাড়াহুড়া ও এমন আবেগময় পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়েছিল যে, তার ফলে বোর্ড তার মেজাজ ও ঐতিহ্য থেকে সরে বাবরি মসজিদের আন্দোলন চালানো এবং খোদ পার্সোনাল ল বোর্ডের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি দেশব্যাপী

১. *'কাওমী আযাদ' : ১৩ এপ্রিল ১৯৯৩ (সংক্ষেপিত)*

আন্দোলনের চিন্তাধারা লালনকারী কতিপয় সংগঠন ও সংস্থার একই জায়গায় এবং একই সময়ে সমাবেশ অনুষ্ঠানের কারণে ভুল বোঝাবুঝি এবং উভয়ের একটি অপরটির মধ্যে একীভূত হয়ে যাওয়ার ধারণা তৈরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল, সেই সংগঠন-সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার স্বীকৃতি, সম্মান, প্রয়োজনের সময় এবং প্রয়োজন অনুপাতে তাদের সহযোগিতা দানের সম্ভাবনা ও বৈধতা মেনে নিয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের স্বাতন্ত্র্য, কর্মপরিধি ও কর্মরীতি স্পষ্টরূপে বজায় থাকবে।

এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে এবং সেইসঙ্গে কতগুলো নতুন বিষয় পর্যালোচনার জন্য মজলিসে আমেলার মিটিং আহ্বানের সিদ্ধান্ত হলো এবং তার জন্য তারিখ ধার্য হলো ১৫ মে ১৯৯৩। আর স্থান নির্ধারণ করা হলো লাখনৌ। বিশেষ প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো যে, এই মিটিং-এ শুধু আমেলার সদস্যগণই অংশগ্রহণ করবেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সাইয়িদ নিযামুদ্দীন সাহেবের আহ্বানে প্রায় সব কজন সদস্য নির্ধারিত তারিখে লাখনৌতে এসে হাজির হলেন এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম-এর হলে মজলিসে আমেলার মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক ৭ সদস্যের কমিটির নাম পরিবর্তন করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড (বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধার) কমিটি নাম ঠিক করা হলো এবং তার সদস্য আরও আটজন বাড়ানো হলো। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, এই কমিটির কর্মপরিধি হবে শুধু বাবরি মসজিদ এবং কমিটি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের চিরচেনা অবস্থানের পরিধিতে কাজ করবে। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, বোর্ড বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কমিটির প্রধান যথারীতি জনাব ইবরাহীম সুলায়মান শেঠ সাহেবই থাকবেন এবং তার সদর দফতর হবে দিল্লিতে। আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলাম, বোর্ড পুরোপুরি দীনি ও শরয়ী লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। কাজেই এর কর্মনীতি এবং ভাষাও দীনি হতে হবে। সেইসঙ্গে এই কমিটি ও বোর্ডকে এমন ধারায় কাজ করতে হবে, যেন নিজেদের স্বাধীন বলে মনে হয়– অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের লেজুড় মনে না হয়।

সমাজসংশোধনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের গঠিত সমাজসংশোধন কমিটি জনসভা ও কনফারেন্সের আয়োজন

করবে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করবে। বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোও পর্যালোচনা করা হলো এবং আইন পর্যালোচনা কমিটিকে পরামর্শ দেওয়া হলো, কমিটির মিটিং তলব করে বোর্ডের পক্ষ থেকে আইনগত প্রস্তুতি খুব শীঘ্র সম্পন্ন করা হোক। ইসলামি আইন সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ যে-কাজটি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা আমীরে শরীয়ত জনাব মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানি সাহেব শুরু করিয়েছিলেন এবং যার সংশোধনির কাজও সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে, তার লিপির কাজ শুরু করতে হবে এবং বাকি অংশটুকুরও সংশোধনির কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তারপর এই গ্রন্থটি ইংরেজি ও হিন্দিতে অনুবাদ করাতে হবে, যাতে আদালতগুলো এবং আইনবিদগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন এবং ইসলামি ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে একে সনদের মর্যাদা দেন।

বোর্ডের এই মিটিং-এর ফলে অনেকগুলো ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটল এবং বোর্ড অনেকগুলো প্রশ্ন, অভিযোগ, সংশয় ও কুধারণা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, যেগুলো দিল্লির মিটিং-এর পর থেকে জনমনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কয়েকটা মৃত্যুর ঘটনা

যেহেতু এই গ্রন্থে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া হয়েছে, লেখকের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় নিপতিত হলে তাদেরও আলোচনায় তুলে আনা হবে, তাই এখানে আমি তিনটা ঘটনা উল্লেখ করব। একটা হলো, আমার প্রিয় সহকর্মী ও সহযোগী মৌলভী আবদুন নুর সাহেব নদবি ওরফে নুর আজীম সাহেব নদবির মৃত্যুর ঘটনা। ঘটনাটা ঘটেছে ৭ শাবান ১৪১৩ হিজরি মোতাবেক ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৩ খ্রি.। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও জামেয়া আযহারের ছাত্র, নদওয়ার চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্যের ধারক, আরবি ভাষায় বক্তৃতা ও লেখনিতে দক্ষতার অধিকারী ও আন্তর্জাতিক রাবেতা আদবে ইসলামীর একজন তৎপর কর্মী ছিলেন। সাহিত্য ও শিক্ষাগত সভা-সংস্থা পরিচালনায় তার মাঝে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আমার ও রাবেতা আদবে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদবির বিশেষ সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। তুরস্কের রাবেতা আদবে ইসলামীর সভা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে-সভাগুলো অনুষ্ঠিত হতো, অতিশয় দক্ষতার সাথে সেগুলোর ব্যাবস্থাপনা ও পরিচালনা করতেন। লেখালিখির জগতেও তিনি আমার এবং নদওয়াতুল উলামার বিশ্বাসযোগ্য মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। আল্লাহপাকের ইচ্ছা

যে, কয়েকটা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি সঞ্জয় হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে দারুল উলূমে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে আসেন এবং ৭ শাবান ১৪১৩ (৩১ জানুয়ারি ১৯৯৩) হঠাৎ সবাইকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। আমি তখন রায়বেরেলিতে ছিলাম। সংবাদটা পাওয়ামাত্র লাখনৌ ছুটে এলাম এবং তার জানাযার নামাযের ইমামত করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তাকে ডালিগঞ্জের কবরস্তানের দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি এক পুত্র যকী নুর আজীম, স্ত্রী ও দুটি কন্যা রেখে যান। আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

দ্বিতীয় হৃদয়বিদারক ঘটনাটা হলো প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, বংশের গৌরব; বরং গোটা ভারতের গৌরব সাইয়িদ মুহাম্মাদ আল-হাসানী মরহুমের বিধবা এবং স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল্লাহ হাসানি, আম্মার আবদুল আলী ও বেলাল আবদুল হাই-এর মায়ের মৃত্যুর ঘটনা। তিন-চার দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করে ২৪ শাওয়াল ১৪১৩ হিজরি (১৭ এপ্রিল ১৯৯৩) গোটা বংশকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

তৃতীয় ঘটনাটা হলো মাদ্রাজের মাওলানা সাইয়িদ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারির মৃত্যুর ঘটনা। আমার কাছে সংবাদটা এই লাইনগুলো লেখার সময় তারের মাধ্যমে আসে। ঘটনাটা ঘটেছে ১১ মে ১৯৯৩ খ্রি.। আমার পুরনো একনিষ্ঠ বন্ধু এবং দেওবন্দে মাওলানা মাদানির দরসে হাদীছ এবং লাহোরে মাওলানা আহমাদ আলীর দরসে কুরআনে আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি দীনি জযবার পাশাপাশি রূহানি তারবিয়াত এবং সুলুকেরও অভিরুচি লালন করতেন। মাদ্রাজসংলগ্ন রায়চুটির (অন্ধ্রপ্রদেশ) মানুষ তার দ্বারা রূহানি উপকার লাভ করছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন।

কয়েকটি চয়ন ও ভাষণ

এখানে মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি মানসিক বিক্ষিপ্ততা-অস্থিরতা এবং বিরুদ্ধবাদীদের গভীর ও সুদূরপ্রসারী নানা ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে কয়েকটি ভাষণের সারাংশ উপস্থাপন করছি, যেগুলো পরিস্থিতির বিবেচনায় খুবই জরুরি।

একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবেলা

কয়েক শতাব্দি পর একটি বিষয় সামনে এল যে, ইহুদি মস্তিষ্ক আর খ্রিস্টীয় শক্তি একজোট হয়ে গেল। অথচ দুটি ধর্মে যত বেশি বৈপরীত্ব ও বিরোধ থাকা সম্ভব, তা ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মাঝে। খ্রিস্টবাদের মূলকথা হলো, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। আর ইহুদিরা হযরত মাসীহ'র ওপর বংশগত অপবাদ আরোপ করে, যেটা কোনো খ্রিস্টান সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা এ-বিষয়টা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু খ্রিস্টানদের বড় ফাদার ইহুদিদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এ-সময়কার জন্য এটা গভীর একটা ষড়যন্ত্র, যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' বা 'মৌলবাদী'। রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা, ব্রিটেন ও সমগ্র ইউরোপের শক্তিগুলো বুঝে নিয়েছে, এখন বিপদ যদি একটা থেকে থাকে, কোনো প্রতিপক্ষ যদি মাঠে আসার মতো থাকে, সে হলো শুধু ইসলাম আর মুসলমান। সে-কারণের তারা খুব সতর্কতার সাথে (এবং একাজে ইহুদি মস্তিষ্কের অংশ সবচেয়ে বড়) এর শিরোনাম দিয়েছে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট'। 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' বলতে তারা বোঝায় মূলের অনুসারী, পুরনো রীতির অনুসারী ও পশ্চাৎপদ। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন একথাটা বোঝাতে 'দাকিয়ানুসী' পরিভাষা ব্যবহার করা হতো। আর এখন

তারই জায়গায় ব্যবহার করা হয় 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' বা 'মৌলবাদী'। এই পরিভাষাটা এত বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে, এত জোরেশোরে ও সুসংগঠিতভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে, মানুষ দ্বিধায় পড়ে গেছে, আমি কি মেনেই নেব, আমি 'মৌলবাদী'! অথচ, একজন ধার্মিক মানুষের জন্য আপন ধর্মীয় বোধবিশ্বাস, নির্ধারিত আইন ও রীতিনীতি, নৈতিক ও চারিত্রিক মাপকাঠির অনুসরণ করা জরুরি। আর ফান্ডামেন্টালিজমের অর্থও এটিই যে, আমাকে আমার ধর্মের অকাট্য বিধানাবলি ও আসমানি গ্রন্থে যা-কিছু এসেছে, তার সমস্ত বক্তব্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। যদি খ্রিস্টান হয়, তাহলে ইনজীল অনুসারে, যদি ইহুদি হয়, তা হলে তাওরাত অনুসারে আর যদি মুসলমান হয়, তা হলে কুরআন অনুসারে চলতে হবে।

বর্তমানে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' পরিভাষাটি এতই ব্যাপক হয়ে গেছে যে, এখন এটি আরব দেশগুলোতেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে এর জন্য 'মুবদিয়ীন', 'রাজঈয়ীন', 'মুতাযাম্মিতীন' ও 'মুতাতাররিফীন' শব্দগুলো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং তার মোকাবেলায় লেখক-বক্তারা 'মুতানাওয়িরীন' ও 'তাকাদ্দুমিয়ীন' (মুক্তমনা ও প্রগতিবাদী) শব্দদুটো ব্যবহার করছেন। এই সম্প্রতি আমার কাছে এক আরব এলাকা থেকে একটি পত্র এসেছে। সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, কট্টরপন্থীদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আমরা কয়েকজন চিন্তাবিদ ও আলেমের নামে একটি প্রশ্নপত্র পাঠাচ্ছি যে, যারা শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের এবং ইসলামি আইন চালু করার দাবি জানাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী?

আরবিতে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট'-এর আসল তরজমা 'মুবদিয়ীন'ই সঠিক। যারা আপন-আপন মূলনীতিতে বিশ্বাসী এবং সেই অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর, তারা-ই 'ফান্ডামেন্টালিস্ট'।

বিরুদ্ধবাদীরা এই চরিত্রের লোকদেরই 'ফান্ডামেন্টালিস্ট', 'মৌলবাদী' বা 'মুবদিয়ীন' বলে। অথচ, বাস্তবতা হলো, সমগ্র পৃথিবীটা যে-অনাচারে ভরে গেছে, তা হলো কোনো মূলনীতি, কোনো ভিত্তির ওপর বিশ্বাস না থাকা এবং প্রত্যেকে যার-যার প্রবৃত্তি অনুসারে চলা চাই তা স্বীকৃত সমস্ত মূলনীতি খেলাফই হোক এবং গোটা সমাজের ওপর, মানবতার ওপর, যুগের ওপর তার প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক; কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিকে শান্তি দিতে হবে। এর নাম ছিল নীতিহীনতা। এই নীতিহীনতা-ই দুনিয়াটাকে আজ সেই জায়গাটায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, যেকোনো সময় তার কেয়ামত হয়ে যেতে পারে। আসল কেয়ামত তো মহান আল্লাহ্ সময়মতো ঘটাবেন। কিন্তু ছোট-ছোট কেয়ামত যেকোনো সময় হতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধও একধরনের ছোট কেয়ামত ছিল। ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও। এরকম যুদ্ধ আবারও হতে পারে। হতে পারে এর চেয়ে বড় যুদ্ধও। প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল ব্রিটেন ও জার্মানির মাঝে। তাতে আরও কিছু শক্তি এসে যোগ দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এমনই ছিল। ওই সময় পরমাণু অস্ত্র ছিল না। এখন আছে। এসবই ছিল নীতিহীনতার ফল। প্রবৃত্তিপূজার ফল। অবাধ স্বাধীনতার ফল। দীন থেকে দূরে অবস্থান করার ফল। তথাকথিত মুক্তমনা, প্রগতিবাদী ও ইসলামবিরোধীদের আসলে কোনো লজ্জাশরম নেই যে, তারা এই পরিভাষাগুলো আবিষ্কার করল। অথচ, বাস্তবতা হলো, তাদের থিওরি পুরোটা-ই অনাচারের জনক। আল্লাহ বলছেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

'মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কিছু-কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১]

১. *সূরা রূম : আয়াত ৪১*

এটা কী? পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির পূর্বাপর সমস্ত আলোচনার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনি জানতে পারবেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ (স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে)-এর পরে এই যে بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ (মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ) বলেছেন, এখানেই আল্লাহ নীতিহীনতা, প্রবৃত্তিপূজা, নির্বিচার স্বাধীনতা, সর্বপ্রকার মিথ্যা এবং যেকোনো মূল্যে মনের শান্তির জোগান দেওয়ার কথা বলেছেন। ফান্ডামেন্টালিজমের বিরোধীদের চিন্তাধারা, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তাদের দাওয়াতে এই সবগুলো জিনিসই বিদ্যমান, যাকে আল্লাহ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কুরআনের অলংকারের প্রতি লক্ষ করুন। বিপর্যয়ের কারণ বলেছেন 'মানুষের হাতগুলোর অর্জন'। সেই মানুষের হাতগুলো কী করেছে, যারা কোনো মূলনীতির ওপর বিশ্বাস রাখে না? যারা কোনো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়? এই শ্রেণির লোকদের জন্য কোনো সীমানা নির্ধারিত নেই যে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। এরা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

সময়টা খুবই নাজুক ও খতরনাক। এই সময়ে লেখার যোগ্যতা, বলার যোগ্যতা, বোঝানোর যোগ্যতা, মতবিনিময়ের যোগ্যতা খুবই জরুরি। এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, যার বিস্তৃতিও ব্যাপক, গভীরতাও ব্যাপক। এত বড় ষড়যন্ত্র অন্তত আমার সীমিত অধ্যয়নের পরিসীমায় আমি পাইনি। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, জগতে ফান্ডামেন্টালিজমের মোকাবেলা করতে হবে। অর্থাৎ– কোনো মূলনীতিই অবশিষ্ট রাখা যাবে না। কোনো সীমানা বাকি রাখা যাবে না। সবকিছুই করতে পার। যার যা মন চায় তা-ই করো। যেমন– ইউনানের (গ্রিক) একটা থিওরি ছিল এপিকিউরিওনিজম (ইন্দ্রিয়বিলাস)। মানে যা স্বাদ লাগে তা-ই করো।

আজকের ইউরোপ ঠিক এই ধারায়ই চিন্তা করে। ইউরোপের গোটা মস্তিষ্কই যেন ইন্দ্রিয়বিলাসী হয়ে গেছে যে, যেখানেই স্বাদ আছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ো। অবশ্য স্বাদকে তারা আরও ব্যাপক করে দিয়েছে। স্বাদ বলতে এখন তাদের কাছে শুধু পেটের স্বাদ আর মুখের স্বাদই নয়– চিন্তার স্বাদ, রাজনৈতিক স্বাদ, বৈজ্ঞানিক স্বাদ এসবও এখন এর অন্তর্ভুক্ত। একটি স্বাদ জয়ের স্বাদ। এটিও এখন এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা এ-সময়কার এত গভীর একটা ষড়যন্ত্র যে, এর চেয়ে বড় আর কোনো ষড়যন্ত্র হতে পারে না। এর নানা ক্রিয়াও চোখের সামনে আসছে। আরব দেশগুলোতেও, উপসাগরীয় অঞ্চলগুলোতেও এ বিষয়টি ঢুকে গেছে যে, মানুষ বলছে, 'কট্টরপন্থী'দের মোকাবেলা করতে হবে। আলজেরিয়া, তিউনিস ও লিবিয়ায় তো এই যুদ্ধ আগে থেকেই সরগরম। ওখানে ধর্মীয় চেতনা, ব্যাপক দীনদারি ও ইসলামকে বিজয়ী আদর্শে পরিণত করে তোলার প্রচেষ্টাগুলোর বিরুদ্ধে ক্রুশেড যুদ্ধ আগে থেকেই চলে আসছে।

'কট্টরপন্থী'দের দোষটা কী? তারা চাচ্ছে, সমাজ ইসলামি শিক্ষার ধাঁচে গড়ে উঠুক। তারা চাচ্ছে, মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ভয় তৈরি হোক, অন্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা হোক এ-ই তো। যারা সমাজে আল্লাহর আইন চালু করতে চাচ্ছে, (ইসলামি দণ্ডবিধি চালু করা তো বড় ব্যাপার) যারা দৈনন্দিন জীবনে ও প্রয়োগযোগ্য সীমানার মধ্যে ইসলামি বিধিবিধান চালু করতে চাচ্ছে, সরকারগুলো তাদেরও ভয় করে! আমেরিকা ও ব্রিটেন ফান্ডামেন্টালিস্টদের ব্যাপারে ঠিক এ-রকমই চিন্তা করছে এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে। বরং তার প্রতিধ্বনি এখন প্রাচ্য দেশগুলো থেকেও কানে আসছে।

এটা একটা বিরাট ও গভীর ষড়যন্ত্র, যার মোকাবেলায় আপনাকে ব্যাপকহারে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। বিশ্বাস, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, দীনের অনুসরণ ও আখেরাতের চিন্তা এসব ব্যাপারে বলা হচ্ছে, এগুলো 'মৌল বিষয়' ও সেকেলে চিন্তাধারা। এরা হালাল-হারাম, আনুগত্য-অবাধ্যতা ও ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাবধান মুছে ফেলতে চাচ্ছে। এর মোকাবেলায় ইসলামি বিশ্বের আলেমসমাজ, পণ্ডিতবর্গ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী অঙ্গন তৈরি করে নিতে হবে। অন্যথায় দীনের ভিত্তিগুলো নড়বড়ে হয়ে যাবে, বিশ্বব্যবস্থা, বিশ্বশান্তির ভিত টলটলায়মান হয়ে যাবে এবং শুধু ধর্মই নয়– গোটা ব্যবস্থাপনা-ই বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। আর তা চরম বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা এবং সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আত্মহত্যার রূপ ধারণ করবে যে, বিশ্বসংসার একদম ওলটপালট হয়ে যাবে।

জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষা

মিল্লাতে ইসলামিয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অবধারিত সত্য যে, তার জন্য শুধু দৈহিক ও বংশগত অস্তিত্ব-ধারাবাহিকতা, জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রগুলো থেকে স্বার্থ উদ্ধারের স্বাধীনতা এবং আরও এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে প্রশাসন ও সরকারে অংশগ্রহণও একেবারেই যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস ও দাওয়াতসমৃদ্ধ এবং একটি আদর্শ জাতির জন্য এটি মানানসই নয়। তার জন্য প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি দেশে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা, ইসলামের প্রতীকগুলোর ধারক হওয়া, নিজের দীনি বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারা, দীনি বিধানাবলির ওপর আমল করার স্বাধীনতা, পারিবারিক আইনের সুরক্ষা, নিজেদের বিশেষ

সভ্যতা ও সমাজ অনুযায়ী জীবন যাপন করা; এমনকি সেই বিশেষ ভাষা-সংস্কৃতিও নিরাপদ থাকাও জরুরি, যেটি তার দীন সম্পর্কে জানাশোনা ও নিজের অতীতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যম। তার জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের এই জামানত ও শর্তগুলো হারিয়ে যায়, তা হলে এমন একটি দেশ কিংবা পরিবেশে মিল্লাতে ইসলামিয়াকে স্বাধীন, নিরাপদ, সসম্মান ও গণতান্ত্রিক জীবনের অংশীদার ও সদস্য হয়ে নিজেকে পরিচিত করে তোলা সম্ভব নয়।

বিশেষ করে এমন একটি দেশে, যে কিনা নিজের মেজাজ, ঐতিহ্য, ধর্মীয় কাঠামো, হাজার-হাজার বছর যাবত একটি ভূখণ্ডে অবরুদ্ধ থাকা এবং বাইরের সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অপরাপর ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলোকে নিজের ধর্ম, সভ্যতা ও জীবনরীতির মধ্যে একাকার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। এমন ভূখণ্ডে এই সামগ্রিক ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অসাধারণ চেষ্টা-সাধনা ও সার্বক্ষণিক সতেচনতা ও সদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। খাজা আলতাফ হুসাইন হালি মরহুম হিন্দুস্তান ও তার সভ্যতা-মেজাজকে 'সর্বজাতিভুক' খেতাব দিয়েছিলেন। তার মানে যে-জাতি-ই এখানে এসেছে, সে-ই এর পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে, নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে এবং 'যে-ই লবণের খনিতে ঢুকেছে, সে-ই লবণ হয়ে গেছে'-এর দৃশ্য সামনে আসতে থাকে। এমন দেশে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও সভ্যতাগত সংবেদনশীলতা, বাস্তবানুগ আত্মপর্যালোচনা ও অপরাপর রাষ্ট্রগুলোর মোকাবেলায় জাতিগত সমালোচনা অতীব জরুরি।

তারপর যখন সেই দেশটিতে, যে-দেশে বিশেষ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং বৈদেশিক

ষড়যন্ত্রের ফলে ইতিহাসের ঘৃণাজনক বিন্যাস তৈরি হয়েছে এবং সেখানে অন্তত পক্ষে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিগত বংশনিধনের কাজ একটা সুকল্পিত পরিকল্পনা ও একটা জাতীয় সিদ্ধান্তের আদলে শুরু হয়ে গেছে, যার সবিস্তার বিবরণ ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের নানা ঘোষণার আকারে আলোচিত হয়েছে, তখন সেদেশে এই দায়িত্বটি দ্বিগুণ; বরং দশ গুণ বেড়ে যায় এবং এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম উদাসীনতা ও শিথিলতা জাতিকে দীনি না হলেও অন্তত মানসিক ও সভ্যতাগত নাস্তিকতায় লিপ্ত করতে পারে এবং এমন একটি দেশকে, যে-দেশে ইসলামি জাতিসত্তার একটি অংশ কয়েকশো বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছে, এবং দেশটিকে একত্ববাদের বিশ্বাস, সাম্য, মানবতার মর্যাদা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও চিন্তার সাথে শুধু পরিচিতই করেনি; বরং সমৃদ্ধ করে তুলেছিল; স্পেন বানাতে পারে।

এই আশঙ্কাটা সেই সময় আরও বেড়ে যায়, যখন মিল্লাতে ইসলামিয়ায় এমন কিছু লোক (হোক তারা সংখ্যায় নগণ্য) মাঠে নেমে আসে, যারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, তাকে শুধু অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং দেশের জন্য, জাতির জন্য ক্ষতিকর বলেও মন্তব্য করে। দীনের কোনো একটি বিষয়কে সমাজে-রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের দাবি তোলা এবং তার জন্য কাজ করাকে তারা বিশৃঙ্খলা তৈরি অপপ্রয়াস এবং একে জাতি ও নেতৃবৃন্দের সরলতা, আবেগময়তা ও অজ্ঞতা মনে করে। এমনকি মুসলমানদের পারিবারিক আইনের সুরক্ষার জন্যও যদি সফল ও ফলপ্রসূ কোনো প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালানো হয়, তাকেও একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং সময় ও শক্তির অপচয়ের সমার্থক মনে করা হয়। এমন দেশে এই

জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখা এবং তার সুরক্ষার জন্য সচেতনতা ও ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা আরও বেশি জরুরি।

আজ থেকে তোরো বছর আগে দারুল উলূম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি সম্মেলনে – যেটি ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখনও এমনসব আশঙ্কা ও ঘোষণাবলি স্পষ্টরূপে প্রচার পায়নি – কয়েক লাখ শ্রোতার উপস্থিতিতে আমি আমার ভাষণে বলেছিলাম :

'আমরা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছি এবং চাচ্ছি, আপনিও ঘোষণা করুন, আমরা এমন জীবজন্তুর জীবন কাটাতে মোটেও রাজী নই, যাদের শুধু খাবার আর নিরাপত্তা দরকার। এমন জীবন কাটাতে এবং এমন অবস্থান গ্রহণ করতে হাজারোবার অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। এই ভূখণ্ডে আমরা আমাদের আযান ও নামাযের সাথে থাকতে চাই। বরং তারাবীহ, এশরাক, তাহাজ্জুদের স্বাধীনতাকেও আমরা ছাড়তে রাজী নই। এক-একটি সুন্নতকে আমরা বুকের সাথে লাগিয়ে রেখে বাঁচতে চাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পদাঙ্ক থেকেও আমরা হাত গুটিয়ে নিতে আমরা প্রস্তুত নই।

তারও আগে যখন ১৯৭৯ সালে শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়ার اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم গ্রন্থটির অনুবাদ 'ইসলাম আওর গায়রে ইসলামী তাহযীব' নামে মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হলো, তখন আমি তার যে-ভূমিকাটি লিখেছিলাম, তার একটি অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'আধুনিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন এখন যেকটি বাস্তবতাকে বিশ্বের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সভ্যতা, সমাজ ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের যেসব

প্রতিক্রিয়ার অনবরত অভিজ্ঞতা বিশেষ করে এই শতাব্দির গোড়া থেকে চলে আসছে, তাতে এই বাস্তবতাটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে, সভ্যতা ও সামাজিকতার ব্যাপারটা এত ভাসাভাসা নয়, যতটা দিনকতক আগে মনে করা হতো এবং যেমনটা এই শতাব্দির শুরুর দিকে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণের আহ্বানকারীরা এবং বর্তমান শতাব্দির মধ্যভাগে জাতীয় ঐক্যের ধ্বজাধারীরা উপস্থাপন করেছিল। এখন এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতায় পরিণত হয়ে গেছে যে, অভ্যাস ও কর্মকাণ্ড, মনের গতি ও ঝোঁক হৃদয় ও মস্তিষ্কে গভীর শিকড় গজায় এবং জাতি-গোষ্ঠীর আকৃতি ধারণ ও ব্যক্তিত্বগঠনে তার অনেক গভীর প্রভাব রয়েছে।

সভ্যতা, চেতনা, ঝোঁক, পছন্দ-অপছন্দ ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রকাশ্য আকার থাকে। সভ্যতার অদৃশ্য বিষয়াশয় ও তার গঠন-উপাদানগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা সম্ভব নয়। তার উপাদানে শিরক, অজ্ঞতা, অহংকার, বিলাসিতার প্রতি ঝোঁক, অলসতা-উদাসীনতার হার কত ভাগ এবং তার কেমন অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত, এই সভ্যতা কোন চিন্তানৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে এবং তার উন্নতির স্তরগুলো অতিক্রম করেছে, তার ওপর সে কতখানি গভীর ও অমোছনীয় ছাপ ফেলেছে, এসব তথ্য খুঁজে বের করা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করার কাজটি সমাজদর্শনের বড়-বড় পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদেরও পক্ষে সহজ নয় এবং তার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়নি, যেখানে এর পরিসংখ্যান, পর্যালোচনা ও গবেষণার কাজটি সফলতার সাথে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। গ্রহণ ও বরণ, অনুসরণ ও চয়ন – যেটি কিনা সভ্যতা ও সমাজের ময়দানে আঞ্জাম পাচ্ছে – জাতির মনস্তত্ত্বের ওপর কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করছে, তাকে তার

আসল অবস্থান থেকে কতখানি সরিয়ে দিচ্ছে, পুণ্য ও পাপ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, ইসলাম ও অজ্ঞতা, লজ্জাশীলতা ও বেহায়াপনা, সুবিচার ও অবিচার, স্বল্পেতুষ্টি ও অপচয়ের মাপকাঠি এর ফলে কীভাবে বদলে যায় এবং সে নিজের বাহ্যিক অবয়ব ও খোলসের মধ্যে অবস্থান করেও ভেতর থেকে কী পরিমাণ পালটে যায়, তার যথাযথ অনুমান ঠিক করা বড়-বড় সূক্ষ্মদর্শী পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকেরও পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি মহাজ্ঞানী আল্লাহপাকেরই সত্তা, যিনি দীন, শরীয়ত, আসমানি কিতাবের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও বিধিবিধানের মাধ্যমে এই জাতির সুরক্ষার ব্যবস্থা করছেন, যাকে দুনিয়াতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের সাথে টিকে থাকতে এবং তার থেকে দাওয়াত ও দিকনির্দেশনার কাজ নিতে হয়।

সাদৃশ্য অবলম্বন ও অনুকরণের ব্যাপারে ইসলামের বাড়তি সতর্কতা এবং ইসলামি শিক্ষার অধিক বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্টিকরণ এবং এসবের ওপর ইসলামি শরীয়তের চাপপ্রয়োগ এ বিষয়টির ফলাফল যে, ইসলাম শুধু কতগুলো বিশ্বাস আর প্রথা-প্রচলনের সমষ্টি নয়; বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনরীতির ধারক ও আহ্বায়ক। ইসলামের স্লোগান হলো, সবাই আল্লাহর রং ধারণ করো। আল্লাহর রঙের চেয়ে ভালো রং দ্বিতীয়টি নেই। ইসলাম প্রত্যের সেই সভ্যতা ও সমাজকে 'জাহেলিয়াত' নাম দেয়, যেগুলোর উৎস আল্লাহর বিধান ও দিকনির্দেশনার পরিবর্তে প্রবৃত্তি, ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা স্রেফ অভিজ্ঞতা ও অনুমান। ইসলামই সর্বপ্রথম এই বাস্তু বাতার মুখোশ উন্মোচন করেছে যে, কোনো মানুষ শুধু বিশ্বাসের ওপর জীবন কাটাতে পারে না এবং সমাজ-সভ্যতাকে মানুষের অভ্যাস, চরিত্র, বোধ-বিশ্বাস ও ধর্মাচারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখা যায় না। এই দুয়ের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা

অস্বাভাবিক, যে-কাজটা পুনরুত্থানের সময় পশ্চিমা সভ্যতা ধর্মকে মানুষের 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' সাব্যস্তের আদলে করেছিল। মানুষের জীবন কতগুলো এককের সমষ্টি নয় যে, যখন মন চাবে মিলিয়ে দেব; আবার যখন মন চাবে আলাদা করে রাখব। বরং এ নিজেই একটি একক, যাকে আপনি 'উবুদিয়াত' (দাসত্ব), 'ইসলাম', 'দীন' ও তা'আত' (আনুগত্য) এসবের যেকোনো একটি নামে ডাকতে পারেন। সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে এই যে আল্লাহপাক বলেছেন, 'তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো' এটি-ই তার ব্যাখ্যা।

কংগ্রেসের সাধারণ সভা এবং তার মুলতবি হওয়া

দীর্ঘদিন যাবত কংগ্রেস একটি গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে শুধু সরকার ও প্রশাসনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আর যেমনটি আমি ওপরেও বলেছি, ভালো কোনো প্রশাসনও আন্দোলনের বিকল্প হতে পারে না। এমন প্রতিজন মানুষ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে পারে, প্রশাসন যার কাজ করে দেয়নি এবং তার স্বার্থ রক্ষা করেনি। আর সরকারের পক্ষে দেশের প্রতিজন নাগরিককে খুশি করা সম্ভব নয়।

শেষের দিকে এসে বোধহয় এই বাস্তবতাটি কিছুটা মাথায় এসেছে এবং তার বিগত ইতিহাসকে স্মরণ করা কিংবা তার মাধ্যমে জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। যাহোক (লক্ষ্য যা-কিছুই হোক) কংগ্রেস একটি বার্ষিক সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিল এবং জায়গাটা ঠিক করল রাজিব গান্ধীর নির্বাচনি এলাকা রায়বেরেলি জেলার কাঠুরা নামক অঞ্চল। তারিখ ঠিক করা হলো ২৯ ও ৩০ মে ১৯৯৩। সমাবেশের জন্য ওখানে রাজকীয় পর্যায়ের আয়োজন শুরু হলো। অনেকগুলো সড়ক তৈরি করা হলো। উপসড়কও বানানো হলো। প্যান্ডেল ও অতিথিদের থাকার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করা হলো, যার পেছনে লাখ-লাখ রুপি ব্যয় হলো।

আমি কংগ্রেসের ইতিপূর্বেকার অনেকগুলো বার্ষিক সম্মেলনের কার্যক্রম পড়েছি ও দেখেছি এবং সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত

আছি। কিন্তু কাঠুরায় যে-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, একে কংগ্রেস কিংবা রাজিবের 'ওরস' নামে ডাকা শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ ২৭ মে দুপুর দুটা-আড়াইটার দিকে রায়বেরেলি ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে এমন প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো যে, অনেকগুলো পাকা ঘর পর্যন্ত গুঁড়িয়ে গেল। নানা জায়গায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটল এবং রায়বেরেলিতে অনেক মানুষ মারাও গেল। কংগ্রেসের সম্মেলনের সমস্ত আয়োজন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। আল্লাহর কী ইচ্ছা, পরদিন ২৮ মে প্রায় একই সময় আবার তীব্র ঝড়োহাওয়া বইতে শুরু করল এবং মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। সম্মেলনের আয়োজক ও সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ সম্মেলন মুলতবির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করে দিলেন। দল ও সরকারের প্রতি অভিযোগ ছিল এবং মনে করত তাদের সঙ্গে অবিচার হয়েছে এমন অনেকে এই ঘটনাটিকে 'আল্লাহর গজব' বলে অভিহিত করলেন। সম্মেলন সে-বছরের অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবি করা হলো। এতে কংগ্রেসের আনুমানিক ৫০ কোটি রুপির ক্ষতি হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা

এবার আমি আমার এই আত্মজীবনীতে এমন একটি নিবন্ধ যোগ করছি, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলি, আল্লাহওয়ালা আলেমে দীন ও মহান সংস্কারকদের নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মপন্থা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেটি প্রতিটি যুগে এবং বিশেষ করে এমন যুগ ও দেশের জন্য কর্মনীতি ও পথের দিশার ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি আলোকবর্তিকার কাজ দিতে পারে। তাওফীক দেওয়ার মালিক আল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

বর্তমান যুগে গোটা ইসলামি বিশ্ব; বিশেষ করে আমাদের দেশ ভারত (যেটি বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত ইসলামি শান-মর্যাদা ও ইসলামি জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল এবং যেখানে এমন জবরদস্ত সংস্কার আন্দোলন, সংস্কারক ও

আল্লাহওয়ালা আলেমে দীন জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের দাওয়াত ও প্রভাব মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্তের দেশগুলো পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল) এমন একটি পরীক্ষার যুগ অতিক্রম করছে, যার নজির বিগত ইতিহাসে কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পরীক্ষার যুগে মুসলমানদের শুধু জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা, দেশ ও সমাজকে সঠিক পথের ওপর চালানো এবং বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তার সঠিক পরিচয়, ইবাদাত সঠিক দীনের প্রতি পথ দেখানোর যোগ্যতা-সক্ষমতা তো বড় বিষয় (অন্তত এই ভারতে) তাদের জীবনের ধারাবাহিক দৈহিক অস্তিত্ব, ইজ্জত-সম্ভ্রম, মসজিদ-মাদরাসা, শত-শত বছরের মহামূল্যবান দীনি ও ইলমি পুঁজিও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। শুধু দূর-দূরান্তের পল্লি-পাড়া গাঁয়েই নয়– বরং বড়-বড় কেন্দ্রীয় শহরেও, যেখানে সে তারা বিপুল সংখ্যায় বাস করে এবং বিশেষ যোগ্যতা, চিন্তাগত নানা স্বাতন্ত্র্য ও দক্ষতার অধিকারী; কিছুদিন যাবত ভয়ের সাথে জীবন অতিবাহিত করছে এবং কোথাও-কোথাও তার চিত্র ঠিক সে-রকম, যেমনটা এঁকেছে জ্ঞানগর্ভ শব্দমালায় পবিত্র কুরআন এভাবে :

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

'পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল।'[১]

এই পরিস্থিতির কোনো দৃষ্টান্ত যদি বিগত ইতিহাসে পাওয়া সম্ভব হয়, তা হলো, সপ্তম হিজরি শতকে (ত্রয়োদশ খ্রিস্টশতক) তুর্কিস্তান, ইরান ও ইরাকের ওপর তাতারিদের আক্রমণ, যে কিনা নগরীর-পর-নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত

১. *সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮*

করেছিল এবং ইসলামি বিশ্বের পায়ে কম্পন ধরে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল একটা আধা হিংস্র জাতির সামরিক অভিযান, যার সঙ্গে কোনো দাওয়াত, সভ্যতা, দর্শন, ধর্মীয় বিদ্বেষ, গোঁড়ামি, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বংশনিধনের কোনো পরিকল্পনা বা প্রত্যয় ছিল না। না তারা কোনো সমান্তরাল সভ্যতা বা দর্শনের বাহক ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময় কিছু হৃদয়বান, রূহানিয়াতের অধিকারী, দীনের একনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী দাঈ-মুবাল্লিগ বিদ্যমান ছিলেন, যাঁদের প্রভাব ও সাহচর্যে গোটা তাতারি জাতি (যাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ) ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শুধু তা-ই নয়; তারা ইসলামে সহযোগী, প্রহরী ও পতাকাবাহী হয়ে গেল। তারা বিশাল-বিস্তৃত একাধিক ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর টি.ডাব্লিউ আরনল্ড তার 'প্রীচিং অফ ইসলাম' (ইসলামের দাওয়াত) নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

'কিন্তু ইসলাম তার বিগত জাঁকজমকের ভস্মস্তূপ থেকে আবারও উঠে দাঁড়াল এবং তার প্রচারকগণ নেই হিংস্র মোঙ্গলদের, যারা হেন নিপীড়ন নেই, যা মুসলমানদের ওপর চালায়নি মুসলমান বানিয়ে নিলেন।'[১]

আজকের পরিস্থিতি, বিশেষ করে যে-দেশগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং অতীতে তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তারা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে অনেকখানি ব্যতিক্রম ও বেশি নাজুক। সেই দেশগুলোতে মুসলমানদের ইতিহাস (একটা শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে) এমনভাবে সংকলিত ও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্টদের মাঝে তারা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি করার পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে। তদুপরি অনেক সময় সেই দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা সাময়িকভাবে উদ্ভূত সমস্যাবলিতে মুসলমানদের

১. *(T.W ARNOLD). THE PREACHING OF ISLAM. LONDON 1935, P227*

পথনির্দেশক ও প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ও দলগুলো ভারসাম্যহীন আবেগ, অপরিণামদর্শিতা এবং সুনাম অর্জনের মোহে পড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাজ করার মতো অনেক ভুল করেছে। ওখানে মুসলমানরা প্রচণ্ড ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারপর শিক্ষা সিলেবাস, সাংবাদিকতা, ও গণপ্রচারমাধ্যমগুলোকে অবলম্বন করে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রথমত সভ্যতা-সংস্কৃতিগত নাস্তিকতা, দ্বিতীয়ত বিশ্বাসগত নাস্তিকতার শিকার বানানোর পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়া হয়েছে এবং এলক্ষ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি শুধু ঈমানি ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং পরিপক্ব দীনি অনুভূতি লালনকারী লোকদের জন্যই নয়, সচেতন যেকোনো সাধারণ মুসলমানের জন্যও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তারা কখনও হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, কখনওবা পরিস্থিতির সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দিতেও বাধ্য হয়ে যায়।

কিন্তু সেই এক আল্লাহর ওপর ঈমান স্থাপনকারী মুসলমানদের পক্ষে – যাঁর হাতে এই বিশ্বকারখানার বাগডোর, যিনি আপন দীনের সংরক্ষক, সত্যের সহযোগী, মজলুম ও অসহায়ের সহায়, অবাধ্য ও অহংকারীর যিনি পতন ঘটান, যাঁর শান হলো, 'সৃষ্টিও আমার, আইনও চলবে আমার' – কোনো বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। এই এক আল্লাহর ব্যাপারে মুসলমানরা সাক্ষ্য দেয় :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

'বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা

কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। কল্যাণ তোমারই হাতে। তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।...

'তুমি রাতকে দিনে পরিণত কর এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমিই মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান কর।'[১]

এমন একটি ক্ষেত্রে, যখন একটি বিজিত সম্প্রদায়ের জয়ী হওয়ার এবং জয়ী রাষ্ট্রের পরাজিত হওয়ার ব্যাপারে না কোনো আশা ছিল, না কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করার দুঃসাহস দেখানো যেত, সে-সময়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ

'...পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত সব আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনগণ উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।'[২]

অবস্থান পরিবর্তন এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হলো আল্লাহর আইন, তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবীর

---

১. *সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬ ও ২৭*

২. *সূরা রূম : আয়াত ৪ ও ৫ ; সপ্তম শতাব্দির গোড়ার দিকে সাসানি সাম্রাজ্য ইরানের বাজিন্তি নি সাম্রাজ্যের (রোম, শাম ও পূর্ব ইউরোপ) ওপর পরিপূর্ণ জয়ী হওয়ার পর তার পিছুহটা, পরাজয় এবং রোমকদের জয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম হিজরি সন এবং ৬১৬ খ্রিস্টসনে রোমাতুল কুবরার ঠিক মুমূর্ষু অবস্থায় কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, রোমকরা নয় বছর পর আবার জয়ী হয়ে যাবে। ঘটেছেও এমনই। প্রখ্যান ইউরোপিয়ন ঐতিহাসিক এডভার গিব্বন লিখেছেন :*

'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরানি জয়মালার ঠিক যৌবনের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বছরকয়েকের মধ্যেই রোমক পতাকা পুনর্বার জয়ের সাথে উড্ডীন হবে। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন এর চেয়ে অযৌক্তিক উক্তি দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু হেরকাল-এর প্রাথমিক বারো বছর রোমক সাম্রাজ্যের আশু ধ্বংস ও পতনের ঘোষণা করে ফিরছিল।' (তারীখে যাওয়ালে রোমান, ৩/৩০৩, প্রকাশিত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ)

শিক্ষামালা, নবীজির আদর্শের অনুসরণ এবং তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবিগণের নমুনা ও কর্ম। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কুরআন, হাদীছ, নবীজির সীরাত ও সাহাবা কিরামের আদর্শের আলোকে কয়েকটি শর্ত ও নির্দেশনা উপস্থাপন করা হলো :

১. এ সময় পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের, বিশেষ করে ভারতের মুসলমানদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ও জরুরি কাজ হলো আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, তাওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দু'আ করা ও আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটি করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[১]

অপর এক আয়াতে বলেন :

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ﴿٦٢﴾

'যিনি আর্ত-অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদাপদ দূর করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান।'[২]

আরেক আয়াতে বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ ﴿٨﴾

---

১. *সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩*

২. *সূরা নামল : আয়াত ৬২*

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের খারাপ কাজগুলো মুছে দেবেন।'[১]

খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তাঁর জীবনে যখনই কোনো পেরেশানির সামনে আসত, সাথে-সাথে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দু'আয় মনোনিবেশ করতেন। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো পেরেশানির সম্মুখিন হতেন, তখন নামায পড়তেন।'[২]

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) বর্ণনা করেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى يسكن الريح . وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر . كان مفزعه إلى المصلى حتى ينجلي

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, কোনো রাতে যদি তীব্র ঝড়োহাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন তাঁর আশ্রয় হতো মসজিদ। সেখানে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতেন, যতক্ষণ-না বাতাস থেকে যেত। আবার আকাশে যদি সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ লাগত, তখন তিনি গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকতেন।'[৩]

কাজেই এ সময়ে আমাদের বেশি-বেশি দু'আ-মুনাজাত, কুরআন তেলাওয়াত, বিশেষ করে সেই আয়াত ও

---

১. *সূরা তাহরীম : আয়াত ৮*
২. *আবুদাউদ*
৩. *তিবরানি*

সূরাগুলো বিশেষভাবে তেলাওয়াত করা দরকার, যেগুলোতে শান্তি-নিরাপত্তা, জয়-সাহায্যের আলোচনা বিদ্যমান। যেমন– সূরা ফীল, কুরাইশ; আয়াত লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা... ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় শর্ত, জরুরি ও তাৎক্ষণিক কাজটি হলো বিপদাপদ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা, সব ঘরনের হক আদায় করা। এ-ক্ষেত্রে খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ. মৃত্যু ১০১ হিজরি)-এর একটি আদেশনামা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে চাই, যেটি তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

'আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে মনসুর ইবনে গালিবের নামে। সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করবে। কেননা, আল্লাহর তাকওয়া-ই হলো সর্বোত্তম পাথেয় এবং সবচেয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা ও প্রকৃত শক্তি। নিজের ও সাথিদের জন্য শত্রু অপেক্ষা আল্লাহর নাফরমানিকে বেশি ভয় করো। কেননা, আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষের জন্য শত্রুর কৌশলের চেয়ে বেশি ভয়াবহ। আমরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করি আর তাদের গুনাহের কারণে তাদের ওপর জয়যুক্ত হই। আল্লাহর নাফরমানিতে যদি আমরা তাদের সমান হয়ে যাই, তা হলে শক্তি ও সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী বলে প্রমাণিত হবে। নিজের গুনাহের চেয়ে কারও শত্রুতা থেকে বেশি চৌকস হয়ো না। যথাসম্ভব নিজের গুনাহের চেয়ে বেশি আর কোনো বস্তুর চিন্তা করো না।'[১]

৩. অমুসলিমদের ইসলামের সাথে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এধরনের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করা যাবে না। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় শক্তিটি হলো সেই সহজাত, যুক্তিগ্রাহ্য, আকর্ষণীয়, মন ও মস্তিষ্ককে জয়কারী দীন, পবিত্র কুরআনের অলৌকিক গ্রন্থ,

১. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত ১/৪৫, ৪৬

সর্বশেষ নবীর চিত্তাকর্ষী ও হৃদয়গ্রাহী জীবনচরিত এবং ইসলামের বোধগম্য, অনুসরণযোগ্য ও সুস্থ বিবেকের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী শিক্ষামালা, যেটি যদি খোলা মাথা ও স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে পড়া হয়, তা হলে ক্রিয়া না করে পারে না এবং এই শিক্ষামালা পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল, সভ্য ও প্রতিভাবান জাতিগুলোকে নিজের আসক্ত ও অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে এবং রাষ্ট্রের-পর-রাষ্ট্র তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে এবং ইসলামের দাঈ ও মুবাল্লিগ হয়ে গেছে।

এটা একটা তিক্ত বাস্তবতা যে, এ দেশে এই কর্তব্যটি পালনে এবং নিজের দায়িত্বের অনুভূতিতে অনেক ত্রুটি করা হয়েছে। তারই ফলে এখানকার বেশিরভাগ মানুষ ইসলামের সাধারণ-সাধারণ ব্যাপারে এমনসব প্রশ্ন করে বসে, যার ফলে হাসির পরিবর্তে নিজেদের অবহেলার জন্য কাঁদা দরকার। নিত্যদিনকার প্রয়োজনীয় ইসলামের অতি সাধারণ বিষয়গুলোও মুসলামান জানে না, যা কিনা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। এ কাজে উরদু, ইংরেজি ও হিন্দিতে ইসলামের পরিচিতিমূলক যে-গ্রন্থগুলো বাজারে আছে, সেগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।[১]

৪. এসবের সাথে এই দেশটিতে – যেখানে শত-শত বছর যাবত মুসলমান বাস করে আসছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের এ দেশেই থাকতে হবে – সহাবস্থান, মানবীয় নাগরিক ভিত্তির ওপর ঐক্য ও সহযোগিতা, মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্ভ্রমের সুরক্ষা, মানুষকে ভালোবাসা প্রচার ও উপদেশদান একান্ত জরুরি, যা কিনা এই দেশটির পরিবেশকে স্থায়ীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তি ময়; বরং আরামদায়ক ও সম্মানজনক রাখার গ্যারান্টি এবং যা ব্যতীত এ দেশের উন্নয়ন, সুখ্যাতি, শান্তি ও নিরাপত্তার

---

১. *যেমন– মাওলানা মানযূর নুমানিরচিত 'ইসলাম কেয়া হায়?', আমার লেখা 'হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নজর মে', মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদবিরচিত 'রহমতে আলম' ও 'রাসূলে ওয়াহদাত', আমার লেখা 'মোহসেনে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানসুরপুরীরচিত 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও ডক্টর হামীদুল্লাহরচিত 'ইন্ট্রোডাকশন অফ ইসলাম' ইত্যাদি।*

সাথে জীবন কাটানো সুকঠিন। এই আন্দোলন 'পয়ামে ইনসানিয়াত' নামে কয়েক বছর আগেই শুরু হয়েছে এবং ভারতের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় শহরে তার সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলোতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অমুসলিম পণ্ডিত, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজপতি অংশগ্রহণ করেছেন।

৫. একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, মুসলমানদের মাঝে (বিশেষ করে যেখানে তারা সংখ্যালঘু এবং নানা বিপদাপদ ও পরীক্ষার আশঙ্কা বিদ্যমান) আপসকামিতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্যদানের মানসিকতা, উদারতা, দৃঢ়তা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহর পথে বিপদাপদ সহ্য করার এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা, জান্নাত ও আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা, আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের মর্যাদার অনুভূতি সব সময় মাথায় জাগরূক থাকা দরকার। এর জন্য তাদেরকে সাহাবা কিরামের জীবনচরিত ও ইসলাম প্রচারকদের কীর্তিমালা অধ্যয়ন ও আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখা জরুরি, যাঁরা আল্লাহর পথে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন, বড়-বড় কুরবানি দিয়েছেন এবং তাকে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভের সবচেয়ে বড় উপায় মনে করেছেন।

এই দিনকতক আগেও শিক্ষিত পরিবারগুলোতে আল্লামা ওয়াকিদির 'ফুতূহুশ শাম'-এর উরদু কাব্যানুবাদ 'সামসামুল ইসলাম' ব্যাপকহারে পড়া হতো এবং মানুষের ওপর তার অনেক প্রভাবও সৃষ্টি হতো। এখনও শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেব সাহারানপুরী (রহ.)-এর 'হেকায়ায়ে সাহাবা', হাফীয জালান্ধরির 'শাহনামায়ে ইসলাম' ও আমার রচিত গ্রন্থ 'জব ঈমান মেঁ বাহার আয়ী' দ্বারাও কাজ নেওয়া যেতে পারে। এগুলো মসজিদে-মসজিদে, মজলিসে-মজলিসে এবং ঘরে-ঘরে পড়ার প্রচলন শুরু করা দরকার।

৬. বেশি জরুরি ও সর্বশেষ কথাটি হলো, এসময় প্রতিটি পরিবারের দায়িত্বশীলগণ, সন্তানদের পিতামাতাগণ, বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকগণ আপন-আপন সন্তানদের, নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে দীনের আবশ্যকীয় জ্ঞানের সঙ্গে, ইসলামি বোধবিশ্বাস, দীনি ফরজসমূহ ও ইসলামি চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার ও মৌলিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব বরণ করে নিতে হবে এবং তাদের তাকে নিজেদের এমন মানবিক ও ইসলামি কর্তব্য মনে করবে, সন্তানদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারটাকে যেমন কর্তব্য মনে করে। বরং প্রকৃতপক্ষে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি, বিশ্বাসের প্রশিক্ষণ, নির্ভুল ইসলামি আকিদার সুরক্ষা ও তাকে শক্তি জোগানোর কাজ শারীরিক ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি সম্পাদন ও তার জোগানদানের চেয়েও বেশি জরুরি। এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা দৈহিক প্রয়োজনাদি থেকে উদাসীনতা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কারণ, দীনি শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও সঠিক ইসলামি বোধবিশ্বাসের ব্যাপারটি একটি অক্ষয় ও চিরন্তন জীবনের পরিণতি ও ভালো-মন্দ ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহপাক পরিষ্কার ভাষায় আদেশ জারি করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম ও কঠোরস্বভাব ফেরেশতারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহর আদেশ আর আল্লাহ তাদের যা-যা করতে বলেন, তারা তা-ই পালন করে।'[১]

---

১. *সূরা তাহরীম : আয়াত ৬*

সহীহ্ হাদীছে এসেছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা সবাই রাখাল। আর সবাই তোমরা আপন-আপন রায়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

মানে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমরা প্রতিজন মানুষ এক-একজন শাসক ও যার-যার অধীন লোকদের দায়িত্বশীল। কাজেই তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তোমার অধীন লোকগুলোর সব ধরনের হক আদায় করেছ কি-না। তাই ঘরে-ঘরে, পাড়ায়-পাড়ায়, মসজিদে-মসজিদে, মাদরাসায়-মাদরাসায় শিশুদের দীনি শিক্ষার আয়োজন হতে হবে এবং প্রতিজন বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান অভিভাবককে এই দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হবে।

পাটনা সফর ও পয়ামে ইনসানিয়াতের অসাধারণ সমাবেশ

১৯৯৩ সালের জুন মাসের শেষের দিনগুলোতে পাটনায় কয়েকটি অনুষ্ঠান ও সমাবেশের আয়োজন হলো। স্বাস্থ্যের দুর্বলতা ও ব্যস্ততার আধিক্য সত্ত্বেও এই সমাবেশগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য সফর করা জরুরি ও উপকারী মনে করলাম। এই সমাবেশ ও অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ছিল জমিয়তে শাবাবুল ইসলাম-এর একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল, যেখানে পাটনা ও দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে যুবকরা এসে অংশগ্রহণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক সাইয়িদ সুলায়মান নদবি। পরে আরও জানতে পারলাম, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সাইয়িদ নিযামুদ্দীন ও পাটনার প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় সার্জন ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেব এই আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন। তাঁরা পয়ামে ইনসানিয়াতেরও বড়সড় আকারের একটি সমাবেশ করতে চাচ্ছেন।

একে আমি একটি মানবিক, নৈতিক ও দীনি কর্তব্য জ্ঞান করে দাওয়াতটি কবুল করে নিলাম এবং কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে ২৮ জুন রায়বেরেলি থেকে পাটনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। পাটনা স্টেশনে শহরের বেশ কজন সম্মানিত ব্যক্তি, আমার বন্ধু-সুহৃদ ও নদওয়ার থেকে

শিক্ষাসমাপণকারী আলেমে দীন আমাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। উঠলাম গিয়ে ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের সুবিশাল ও শানদার বাড়িতে। ওখানে আমি শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল করীম পারিখ সাহেব ও অপরাপর বন্ধু-সহকর্মীদের সঙ্গে অবস্থান নিলাম। ওখানে আরামের এমনসব ব্যবস্থাপনা ও আয়োজন ছিল, যেমনটি বড় কোনো হোটেল বা কোনো জমিদারের বাড়িতেও সহজে পাওয়া যায় না। এর মূলে ছিল ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক, ভালোবাসা, উদারতা এবং দীনি ও ইলমি মর্যাদার অনুভূতি।

শাবাবুল ইসলামের সমাবেশে

১৯৯৩ সালের ২৯ জুন আনজুমানে ইসলামিয়ার হলে জমিয়তে শাবাবুল ইসলাম-এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে যুবকদের উদ্দেশে ভাষণদানের প্রোগ্রাম ছিল। আমি সূরা কাহ্‌ফের اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ আয়াতটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললাম, বিপ্লব সাধনকারী এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনকারী লোকের সংখ্যা সব সময়ই কম থাকে। তারপর বললাম, এই আয়াতে তাদের কাজ, পদক্ষেপ ও উন্নতির যে-বিন্যাস দেখানো হয়েছে, ঘটনাগুলো সেই অনুপাতে সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি নিজের মধ্যে অনেক তাৎপর্য ও উপদেশ বহন করে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রথম বিষয়টি হলো ঈমান, যার পথ মানুষের নিজের অতিক্রম করতে হয়। আল্লাহ বলেছেন اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ (তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল)। তারপর আসে আল্লাহর দিকনির্দেশনা ও ঈমানি উন্নতির ধাপ। আল্লাহ বলেছেন وَزِدْنٰهُمْ هُدًى (আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছি)। তারপর আসে বিরোধিতা, নির্যাতন-নিপীড়ন ও সম্পর্কচ্ছেদের ধাপ, যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃঢ়তা, আত্মিক বল, সমর্থন, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ও ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক সঙ্গ নেয়। তারপর আল্লাহ বলেছেন وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (আমি তাদের চিত্তগুলো দৃঢ় করে দিলাম)। নবীদের অনুসারী, নিজ-নিজ কালে হেদায়াত ও সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্ব পালনকারী লোকদের ঘটনাবলি এর বাস্তবতা সত্যায়ন করছে।

তারপর এই আয়াতের আলোকে বলেছি, শুধু হিন্দুস্তানেই নয়; গোটা পৃথিবীতে ঈমানের পরিপক্বতা, চরিত্রের মহত্ত্ব ও সুন্দর আদর্শের প্রয়োজন। এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ যুবক দরকার, যারা চেয়ার, পদমর্যাদা ও বস্তুবাদের

মনোলোভা প্রতারণার উর্ধ্বে অবস্থান করে একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থভাবে মানবতার সেবা করবে এবং অমুসলিমদের সামনে এমন একটি পবিত্র নমুনা পেশ করবে, যাকে দেখে তারা ইসলাম নিয়ে ভাবতে এবং এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে বাধ্য হবে। ইতিহাস বলছে, তারা ছিল জনকতক যুবামাত্র, যারা মানুষের চোখ ও মনগুলোকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়েছিল এবং রোমান সমাজে যার পেছনে ছিল একটা প্রবঞ্চক সভ্যতা, একটা অতি উন্নত সংস্কৃতি এবং জাগতিক উপকরণের প্রাচুর্য। এই যুবকরা তৎকালের সর্ববৃহৎ রাজত্বের যুগে সর্বত্র ছেয়ে থাকা বস্তুপূজার বিরুদ্ধে আল্লাহপূজা, দীনি দৃঢ়তা, নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল। আজও সেরকম কয়েকজন যুবকেরই প্রয়োজন, যারা কোমরে গামছা বেঁধে মাঠে নেমে আসবে এবং প্রমাণ দেবে, পদমর্যাদা, সম্মান, সম্পদ ও ক্ষমতা-ই সব কিছু নয়। আসল বিষয় হলো চরিত্রের সুষমা, ঈমানের পরিপক্বতা, ত্যাগ ও নৈতিকতা। আজকের যুগে 'রিযিকদাতা'র ধারণা-ই পালটে গেছে। বিশেষ ধরনের প্রচেষ্টা, জীবনের একটা বিশেষ মানদণ্ড ও বিশেষ চরিত্র গোটা জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই বিষয়গুলো, লেখক-সাহিত্যিকসমাজ, পণ্ডিতবর্গ, রাজনীতিক ও শিক্ষকশ্রেণির চিন্তারীতিকেই পালটে দিয়েছে, যার ফলে বস্তুবাদ গোটা জগতে একটা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আজ অর্থ আর চেয়ারের পূজারি হয়ে গেছে।

দেশের বিদ্যমান নৈতিক সংকটের প্রতি ইঙ্গিত করে আমি বলেছি, এমন সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আপনাদের মতো যুবকরা যদি নৈতিক সাহসকে পুঁজি বানিয়ে কাজ করে ঈমানের পরিপক্বতা ও চরিত্রের মহত্ত্বকে সপ্রমাণ করতে পারেন এবং বলে দিতে পারেন কোনো দামেই আপনারা বিকাতে পারেন না, কেউ আপনাদের কিনতে পারবে না, তা হলে নিশ্চিত জেনে নিন, এ দেশে বিপ্লব আসবেই এবং বাতাসের গতি বদলাবেই।

পয়ামে ইনসানিয়াতের অসাধারণ ও ঐতিহাসিক সম্মেলন

১৯৯৩ সালের ৩০ জুন (৯ মুহাররম ১৪১৪ হিজরি) পাটনায় শ্রী কৃষ্ণলাল হলে মাগরিবের নামাযের পর 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ৩২০ আসনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলটি ভরে কি-না এবং সম্মেলন আশানুরূপ সফল হয় কি-না সন্দেহ ছিল। কোনো-কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেবকে পরামর্শ দিলেন, এত টাকা (সে-সময় এই হলের ভাড়া ছিল রোজ ১৪০০ রুপি)। এত অর্থ

খরচ না করে সম্মেলনটি গান্ধী মাঠে হোক। কিন্তু মাওলানা আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং এই খেয়ালেও যে, মওসুমটা বর্ষার; সম্মেলনের বৃষ্টিবাদল আসতে পারে সম্মেলন হলেই রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঘোষণাও করে দিলেন। কিন্তু সম্মেলন আশার চেয়েও বেশি সফল হলো এবং বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হলো। এই সাফল্যে মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেবের এখলাস এবং ডাক্তার আহমাদ আহমাদ আবুদল হাই সাহেবের আন্তরিকতার বিরাট দখল ছিল।

আমি মাগরিবের নামাযের পর যখন হলের দিকে রওনা হলাম, তখন মনে-মনে ভাবছিলাম হলটা ভরল কিনা। কিন্তু যখন সাথীদেরসহ হলে পা রাখলাম, তখন দেখলাম, হল কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। পরে জানতে পারলাম, হলের বাইরেও বিপুলসংখ্যক শ্রোতা দাঁড়িয়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার লালুপ্রসাদ ইয়াদু, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর জগন্নাথ মিশরা, পুলিশের আইজি মিস্টার মেকুরাম, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা জেনারেল এস কে সিনহা, খ্রিস্টান গির্জাঘরে পরিচালক ফাদার পল জেকসন, মেজর বলবীর সিং, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সাইয়িদ নিযামুদ্দীন সাহেব, মাওলানা আবদুল করীম পারিখ সাহেব ও ডক্টর আহমাদ আবদুল হাই সাহেব।

'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর সাধারণ সমাবেশগুলোর নিয়ম লংঘন করে সম্মেলন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হলো এবং মাথার ওপর নিম্নলিখিত চরণলিখিত একটি পতাকা উড়ছিল :

مرا پیام محبت ہے جہاں تک پہونچے

আয়াতগুলোর ইংরেজি এবং হিন্দি অনুবাদও উপস্থাপন করা হলো। ডাক্তার সাইয়িদ আহমাদ আবদুল হাই সাহেব স্বাগত ভাষণ দিলেন, যেখানে তিনি পয়ামে ইনসানিয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বর্তমান ভারতে তার গুরুত্ব, উপকারিতা ও প্রয়োজনীতার ওপর আলোকপাত করেন। সেদিনই ৩০ জুন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাটনা এডিশন আমার একটি সাক্ষাৎকার ও পয়ামে ইনসানিয়াতের আন্দোলন, তার দাওয়াতের লক্ষ্য ও প্রেক্ষাপট বিষয়ের ওপর একটি সচিত্র নিবন্ধ প্রকাশ করে। তাছাড়া, হিন্দি, ইংরেজি ও উরদু পত্র-পত্রিকাগুলোতেও কনফারেন্সের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিশেষ সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেজন্য পয়ামে ইনসানিয়াতের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সবগুলো সমাবেশের মধ্যে এই সমাবেশটি সবচেয়ে বেশি সফল সমাবেশ

ছিল, যেটি সন্ধ্যা সাতটায় মাগরিবের নামাযের পর শুরু হয়ে ঠিক দশটায় শেষ হয়।

আমার ভাষণ

আমি বিহারের আধ্যাত্মিক নেতা, গোটা ভারতের গৌরব, সপ্তম ও অষ্টম হিজরি শতকের বুযুর্গ, সংস্কারক ও দাঈ হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনীরি (৬৬১-৭৮৬ হিজরি)-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে শুরু করি। 'দেশের কাহিনী দেশের মাটিতে' বলে আমি বিহারের সেই মহান ব্যক্তিত্বের বর্ণিত একটি ঘটনার মাধ্যমে শুরু করি, যেটি এই স্থান ও পাত্রের অনুকূলই নয়; এই বিষয়টির জন্য খুবই উপযোগী। হযরত মুনীরি (রহ) নিজের এক মুরীদের কাছে লেখা একটি পত্রে লিখেছিলেন :

> 'একব্যক্তি একপাহাড়ের চূড়ায় প্রাসাদ নির্মাণ করল। ওখানে সে নানা ধরনের, নানা প্রকারের নেয়ামতের সমাবেশ ঘটাল। যখন জীবনের শেষ সময়টি ঘনিয়ে এল, তখন পুত্রকে অসিয়ত করল, এই মহলে তোমার যত খুশি, যেমন খুশি রদবদল করতে পার। কিন্তু একজায়গায় আমি একটা সুগন্ধময় ঘাস রেখে যাচ্ছি। ওটা যতই শুকিয়ে যাক-না কেন, ওকে বের করবে না।...
>
> 'পাহাড়ের চূড়ায় বসন্ত এল। পাহাড়-ময়দান সব সবুজ হয়ে গেল। অনেক তরতাজা ও সুগন্ধিময় ঘাস জন্মাল, যেগুলো ওখানকার পুরনো ঘাসের চেয়েও বেশি তরতাজা। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো ঘাস ও ফুল এই প্রাসাদে এল, যেগুলোর সুঘ্রাণ গোটা প্রাসাদকে সুরভিত করে তুলল এবং সেগুলোর তলে পুরনো শুকনো ঘাসের ঘ্রাণ চাপা পড়ে গেল। ছেলে চিন্তা করল, আমার পিতাজি তো এই পুরনো ঘাস এই মহলে এজন্য রেখেছিলেন যে, এগুলো সুগন্ধি ছড়াবে এবং এই জায়গাটা এর দ্বারা সুরভিত হবে। এখন এই শুকনা ঘাস কোন কাজে আসবে। সে আদেশ দিল, এই ঘাসগুলো বাইরে ফেলে দাও।...
>
> 'যেইমাত্র ওই ঘাসগুলো থেকে প্রাসাদ শূন্য হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা কালো সাপ গর্ত থেকে মাথা জাগাল

এবং ছেলেটাকে দংশন করল। ছেলেটা মারা গেল। এই ঘাসের দুটা উপকারিতা ছিল। এক হলো এ সুগন্ধি দেবে। অপরটা হলো, এই ঘাস যেখানে থাকে, তার আশপাশে সাপ আসতে পারে না। যেন এই ঘাসটা ছিল সাপের প্রতিষেধক। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য কারও জানা ছিল না। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য ছেলের খুব গর্ব ছিল। সে মনে করত, যা আমার জ্ঞানের আওতায় নেই, কুদরতের ভান্ডারেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। 'আল্লাহ মানুষকে অল্পই জ্ঞান দান করেছেন' এই তথ্য তার জানা ছিল না। লোকটা তার বুদ্ধি-বিচক্ষণতার অহমিকার গ্যাঁড়াকলে আটকে মারা গেল।'

এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর আমি বললাম, এ ছিল ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডের ব্যাপার, যেখানে একটা ঘাসের উপকারিতার ব্যাপার ছিল এবং সেগুলো বাগান থেকে বের করে দেওয়ার ফলে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে এসে মালিককে দংশন করেছিল এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশ (ভারত) বিশাল এক ভূখণ্ড। এখানে কমপক্ষে এমন তিনটা চারা ছিল, যেগুলো অবশিষ্ট থাকা জরুরি ছিল এবং সেগুলো নষ্ট করে দেওয়ার ফলে এ দেশের মাটির গর্ত থেকে বড়-বড় তিনটা সাপ বেরিয়ে এল। একটার নাম অহিংসা। একটার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। একটার নাম গণতন্ত্র।

অহিংসার চারাটা সরিয়ে ফেলার এবং ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে বেরিয়ে এসেছে হিংসার মতো বিরাট একটা অজগর। এই অজগর সারা ভারতে হত্যা ও লুটমারের তাণ্ডব চালাল, নিপীড়ন ও রক্তক্ষয়ের মাঠ গরম করে তুলল। একই দেশের অধিবাসী এক মানুষ আরেক মানুষের ওপর হাত তুলল। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর সাথে নির্মমতা ও পাষাণতার মহড়া দেখাল, যার নমুনা হিংস্র জীবজন্তুদের মাঝে কমই দেখা যায়।

কবি বলেন :

ستم یہ ہیں کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے

'দুঃখের বিষয় হলো, মানুষই আজ মানবজাতির শিকারী।'

আমি কখনও শুনিনি; আপনারাও বোধহয় কোনোদিন শোনেননি, কোনো বনাঞ্চলের এক এলাকার নেকড়েরা বাহিনী গঠন করে আরেক এলাকার নেকড়েদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। দোষ নেবেন না, কোনো শহরের এক মহল্লার কুকুরগুলো দল পাকিয়ে আরেক মহল্লার কুকুরদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ওপর শক্তি পরীক্ষা করেছে এমন খবরও কেউ কোনোদিন শোনেনি। কিন্তু যে-ভারত তার শান্তিপ্রিয়তা, মানবপ্রেম ও 'অহিংসা'র জন্য বহির্বিশ্বে বিখ্যাত ছিল, সেখানে আজ নিত্যদিন এমনসব ঘটনা ঘটছে, যেগুলো এই দেশটির মুখে কলঙ্ক লেপে দিচ্ছে এবং বিদেশে গিয়ে এদেশের মানুষদের মাথা অবনত করে থাকতে হচ্ছে। আমি আপনাদের কোনো রাখঢাক না করেই বলতে চাচ্ছি, ১৯৯৩ সালের ৯ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সঙ্গে দিল্লিতে আমার দেখা হয়েছিল। সে-সময়ে আমার কাছে মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কার পক্ষ থেকে – আমি যার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য – আমন্ত্রণপত্র এল এবং সফরের সকল আয়োজন সম্পন্ন ছিল। কিন্তু আমি যাব না বলে জানিয়ে দিলাম। কারণ, যদি ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা ও তার পরের দাঙ্গাগুলোর আলোচনা আসে এবং আমাকে প্রশ্ন করা হয়, তা হলে আমি কী উত্তর দেব? মিথ্যাও বলতে পারব না, সত্যও বলতে পারব না। সেজন্য আমি না যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলাম। এমন ঘটনা আরও এক-দুবার ঘটেছিল।

তদুপরি এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোতে না মহিলাদের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, না শিশুদের ওপর দয়া করা হয়, না বৃদ্ধদের সমীহ করা হয়। শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোতেই নয়– কাঙ্ক্ষিত যৌতুক না আনা এবং এটা-ওটা ফরমায়েশ পূরণ না করার অপরাধে অবোলা, অবলা, সম্ভ্রান্ত, লাজুক ও

নিরপরাধ বিবাহিত নারীদের যেভাবে পোড়ানো হয়, বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়, তা-ও এমন একটি নির্মম; বরং হিংস্র আচরণ, যার দৃষ্টান্ত অপর কোনো দেশে তো দূরের কথা, ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই আচরণের ভয়াবহতা সতীদাহ প্রথাকেও ছাড়িয়ে গেছে, যেখানে বিধবা স্ত্রী নিজেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিত।

এসব হলো অহিংসার মূলনীতি পরিহারের কুফল। সহিংসতার বৈশিষ্ট্য হলো, সে একই ধরন ও একই বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে বিস্তার লাভ করে এবং নতুন-নতুন রূপ ধারণ করে। তার যখন বাইরের শিকার মিলে না, তখন ভেতরেই শিকার খুঁজে বের করে নিজের পিপাসা নিবারণ করে। কোনো এক আরব কবি কয়েকশো বছর আগে একটা পঙ্‌ক্তি বলেছিলেন :

اَلنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَّمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ

'আগুন যখন খাওয়ার মতো (বাইরের) কোনো বস্তু (কাপড়, কাঠ ইত্যাদি) পায় না, তখন নিজেকেই খেয়ে ফেলে।'

এই সহিংসতা যখন কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মাঝে এসে পড়ে, তখন শুধু পরধর্মের অনুসারীরা-ই নয়– তাদের সধর্মের অনুসারী, গোত্র, বংশ ও পরিবারের সদস্যবর্গ, দুর্বল ও অসহায় মানুষ এবং যার সঙ্গে সামান্য বিরোধ দেখা দেয়, তারা-ই তাদের টার্গেটে পরিণত হয়।

অহিংসার এই চারাটিকে (যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি দেশের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিজ্ঞজনের মাঝে দেশের স্বাধীনতার আগেই জাগরূক হয়েছিল। সকল ধর্ম এবং নীতি-আদর্শও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এর শিক্ষা দিয়েছে) উপড়ে ফেলার ফলে দাঙ্গা, রক্তক্ষয় ও মানবনিধনের ধারা ভয়ংকররূপে এবং ব্যাপক আকারে শুরু হয়ে গেল। আমি আশঙ্কা করি, (আমাকে মাফ করুন) সহিংসতার এই প্রচলন উঁচু জাতের মানুষ নিম্নজাতের মানুষদের ওপর, বিত্তবানরা বিত্তহীনদের ওপর, অফিসাররা

তাদের অধীন লোকদের ওপর এবং এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর ওপর শুরু করে দেবে।

এবার আসুন ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে। ক্ষমতাশীল দল এই দেশটিতে (যেটি বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন হস্তলিপির, বিভিন্ন বিদ্যা ও শিল্পের লীলাভূমি ছিল এবং এটি তার স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের বিষয় ছিল) শুধু এক ধর্মই নয়– একই সভ্যতা, একই ভাষা, একই কালচার এবং একই ধরনের প্রথা-প্রচলনের অনুসারী বানানো এবং একই ধাঁচে গড়া দেখতে চায় এবং এর জন্য গোটা শিক্ষাব্যবস্থা, ভাষা ও লিখনরীতি বদলে ফেলতে, দেশের গোটা জনগোষ্ঠীকে তার অনুগামী বানাতে শুধু চেষ্টা-ই করছে না; বরং ইতিহাসকেও পালটে ফেলার চেষ্টা শুরু করে দেয় এবং এমন একটি ইতিহাসের ভিত রচনা করে, যার ফলে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নেয় এবং যে-কাজটা ইংরেজ ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা করতে পারেনি, সেটি আঞ্জাম দেওয়া হয়। তার ফলে অন্যান্য ধর্মগুলোর অনুসারী ও সংখ্যাগরিষ্টদের চেতনা ও বোধবিশ্বাস আহত হয়, তাদের মাঝে আপন ধর্ম, আত্মবিশ্বাস, মস্তিষ্কের প্রশান্তি এবং বংশগতভাবে ধর্মীয় ও সভ্যতাগত ধারাবাহিকতাকে অটুট রাখার চিন্তা তৈরি হয় এবং যে-যোগ্যতা, শক্তি দেশ গড়ার ও দেশের উন্নতি সাধনে সম্মিলিত কাজে ব্যয়িত হওয়া দরকার ছিল, সেটি নিজেদের সুরক্ষা ও নিজেদের প্রিয় সম্পদগুলোর অস্তিত্বরক্ষা ও সংরক্ষণের কাজে ব্যয় হয়ে যায়, যার ফলে জাতি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তৃতীয় বিষয়টি হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের ব্যাপারে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবী এখন গণতন্ত্রাত্রিক ব্যবস্থাকে আবশ্যিক বলে ধরে নিয়েছে এবং প্রতিটি দেশেই আজ এই ব্যবস্থা কার্যকর। লাগামহীনতা, শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। যেখানে এখনও এসব বহাল আছে, সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

অপর যে-ব্যাধিটা এই দেশটিকে প্রচণ্ডরূপে ও ব্যাপকহারে আক্রমণ করে ফেলেছে এবং গোটা সমাজ ও জীবনের জন্য একটা জঞ্জাল হয়ে গেছে, তা হলো অর্থের মাত্রাতিরিক্ত মোহ এবং ইবাদাতের মতো পবিত্র ও সম্মানিত মনে করা। সম্পদ যেভাবে এবং যেপথে হাতে আসুক, তাকে অর্জনের চেষ্টা করা হয় এবং এর জন্য সকল পন্থা ও উপায়কে বৈধ মনে করা হয়। অফিসগুলোতে ঘুসের বাজার গরম। আপনার হাতে অর্থ আছে তো যে-কাজ খুশি করিয়ে নিন। দেশের গোপন তথ্য বিক্রি করা হয়, ব্যাংকের শেয়ার ও তার দালালিতে কোটি-কোটি টাকার ঘাপলা করা হয়। নির্বাচনে প্রকাশ্যে ঘুসের লেনদেন চলে এবং ভোট বেচাকেনা হয়। দৈনন্দিন জীবন কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে।

এই দেশটির বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পদকে উপেক্ষা করে চলা, নৈতিক সাহস, সম্পদশালী ও শক্তিমানদের তোয়াক্কা না করে সত্য কথা বলার হিম্মত, দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে জীবন যাপন করা এবং নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া ও আত্মত্যাগের নমুনা ও ঐতিহ্য। তারপর বাইরে থেকে চরিত্রের শিক্ষকরা এলেন। তাঁরা সরল জীবন; এমনকি প্রয়োজন হলে না খেয়ে জীবন কাটানোও এমন নমুনা পেশ করলেন, যার নজির বাইরের কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এটি-ই এখানকার সনাতন আবাদি ও সংখ্যাগরিষ্টতার স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্য ও গর্বের বিষয় বিষয় ছিল। কিন্তু ব্যাপার এখন উলটো। সম্পদ ও শক্তি এখন জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, সফলতার প্রমাণ ও আলামত এবং একধরনের পূজনীয় বস্তু।

সুধীমণ্ডলী! আমি যদি আমার হৃদয়টাকে চিরে, চোখ ভরে অশ্রু ঝরিয়ে এই দেশটির পাহাড়-পর্বত, গাছগাছালি ও নদনদীর মাধ্যমে বেদনাহত এই দেশটির গোঙানি আপনাদের শোনাতে পারতাম, তা হলে এই গোঙানি অবশ্যই আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতাম। বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তুরা যদি কথা বলতে পারত, তা হলে ওরা আপনাদের বলে দিত, এই দেশটির বিবেক বিক্ষত হয়ে

গেছে, এর মর্যাদা ও সুখ্যাতির গায়ে আঁচড় লাগানো হচ্ছে এবং দেশটি পতন ও পরীক্ষার বিরাট এক ঝুঁকির মুখোমুখি।

আজ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ, ধর্মের অনুসারীবৃন্দ, পণ্ডিত, লেখক ও শিক্ষকদের মাঠে নেমে এসে ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে পানি ছিটানো এবং সম্প্রীতির বাতি জ্বালানোর খুবই প্রয়োজন। এই দেশের নদনদী, হিমালয় পাহাড়, প্রতিটি অণুও আপনার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছে, যেন আপনি মানুষের রক্ত না ঝরান, ঘৃণার বীজ বপণ করা থেকে বিরত থাকুন, নিষ্পাপ শিশুদের এতিম, নারীদের বিধবা হওয়া থেকে রক্ষা করুন। ভারতকে যেলোকগুলো স্বাধীন করেছিলেন, তাঁরা অহিংসা, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্রের চারাগুলো টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের ওপর সোপর্দ করে গেছেন এবং বলে গেছেন, এই চারাগুলোর গায়ে হাত লাগিয়ো না। কিন্তু আমরা তার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছি, যার ফলে হিংস্রতা ও সংঘাতের দৈত্য আমাদের সম্মুখে মুখ হাঁ করে দাড়িয়ে গেছে, ঘৃণা ও হিংসার আগুন আমাদের সমস্ত ঐতিহ্যকে পুড়িয়ে দিতে উদ্ধত, যার জন্য সারা বিশ্বে আমরা বিখ্যাত ছিলাম এবং জগত আমাদের সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। আমাদেরই নানা ভুল বহিঃরাষ্ট্রে আমাদের মাথাগুলোকে নীচু করে দিয়েছে এবং আমরা মুখ দেখানোর অধিকার হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আমি নিরাশ নই। আজকে আপনার এতগুলো মানুষ এখানে এসে সমবেত হওয়া, এমন আগ্রহ ও স্থিরচিত্তে কথা শোনা প্রমাণ করছে, দেশের বিবেক একেবারে ঘুমিয়ে পড়েনি (মরে যাওয়া তো দূরের কথা) এবং এই অবস্থাটা অস্বাভাবিক, বেশিদিন টিকে থাকার যোগ্যতা তার মাঝে নেই। কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে অতখানি প্রয়াস চালাতে হবে, বরং তার চেয়েও বেশি কাজ করতে হবে, যতখানি করা হয়েছিল এই দেশটিকে মুক্ত করার কাজে।

আমার পরে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীদের বেশিরভাগ আমার বক্তব্যের সমর্থনে ভাষণ দান করেছেন। সম্মেলনের সভাপতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ ইয়াদুও বক্তৃতা করেন। গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের মাঝে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর জগন্নাথ মিশরা, পুলিশের আইজি মিস্টার মেকো রাম, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল এসকে সিনহা, খ্রিস্টান গির্জাঘরের প্রধান ফাদার পল রেকসন, মেজর বলবীর সিং বিহার সরকারের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাইয়িদ নিযামুদ্দীন সাহেব ও মাওলানা আবদুল করীম পারিখ। বক্তাদের মধ্যে যথারীতি ও আশানুরূপ মাওলানা আবদুল করীম পারিখ সাহেবের ভাষণ সবচেয়ে বেশি জোরালো, প্রমাণসিদ্ধ ও ক্রিয়াশীল ছিল এবং শ্রোতারা তাঁর ভাষণটি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনেছেন। বিহারের জনপ্রিয় কবি কালীম আজেয সাহেব একটি ক্রিয়াশীল কবিতাও পাঠ করেছেন, যেটি সেই জায়গার উপযোগী করে লেখা হয়েছিল।

পাটনার অপরাপর ব্যস্ততাসমূহ

পাটনা এসে এমারাতে শরইয়্যা ও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় অফিসে যাওয়া, মাওলানা আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ সাজ্জাদ সাহেব মেমোরিয়াল হাসপাতালটি পরিদর্শন করা এবং ফুলওয়ারি শরীফ গিয়ে ওখানকার বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাৎলাভে ধন্য হওয়া একান্তই জরুরি ছিল। সেকারণে তার জন্যও সময় বের করা হলো এবং এই কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে নিজেকে ধন্য করলাম।

এমারাতে শরইয়্যার দফতরে মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেব আমাকে আইন ও ফতোয়ার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে ভাষণদানের সুযোগ করে দেন। সেই ভাষণে আমি এ কাজটির গুরুত্ব এবং ভারতে, বিশেষ করে বিহারে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন ও উপস্থিতিকে ভারতের বিরাট এক বৈশিষ্ট্য ও গর্বের বিষয় আখ্যায়িত করেছি এবং এ কাজের নাজুকতা ও দায়দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোশ আইনে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের এই সাফল্যের (যার নজির দীনি আন্দোলন ও

প্রয়াসগুলোতে কমই দেখতে পাওয়া যায়) কারণগুলোও বর্ণনা করেছি, তার ইতিহাস এবং মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ সাহেবের স্বাতন্ত্র্য, তাঁর কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করেছি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

ফুলওয়ারি শরীফ গিয়ে ওখানকার গদিনশিন মুহতারাম শাহ রেজওয়ানুল্লাহ সাহেব এবং আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠণের এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রটির এক বিশিষ্ট আলেমে দীন ও ব্যক্তিত্ব মাওলানা শাহ আউনুল্লাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

লাখনৌর মাওলানা আবদুশ শাকুর হলে শোহাদায়ে ইসলামের স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

৫ মুহাররম ১৪১৪ (৮ জুলাই ১৯৯৩) শোহাদায়ে ইসলামের স্মরণে লাখনৌর মাওলানা আবদুশ শাকুর হলে 'দারুল মুবাল্লিগীন' আয়োজিত সম্মেলনে প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও নানা চিন্তা ও পেরেশানি সত্ত্বেও আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। সেখানে একটি ভাষণের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি মুসলমানদের একটি বার্তা দিয়েছি। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সেই ভাষণটি আমি এখানে তুলে ধরলাম।

আমি আমার ভাষণে 'শোহাদায়ে ইসলাম'-এর সম্মেলনগুলোর মাহাত্ম্য এবং তার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেবে মরহুমের নিষ্ঠার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি, পয়লা মুহাররম থেকে অদ্যাবধি এই সম্মেলনগুলোতে যেসব সম্মানিত আলেম বক্তৃতা করেছেন, আমার অন্তরে সেই সবগুলো ভাষণ-বক্তৃতার খুবই গুরুত্ব রয়েছে। এ-মুহূর্তে আমি আপনাদের শুধু এমন একটি বার্তা দিতে চাই, যেটি আপনাদের জীবনে বিপ্লব এবং সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের উদ্দেশে নির্দেশনামূলক কোনো মূলনীতি পেশ করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।

একজন অভিজ্ঞ পর্যটক এবং ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে আমি বলতে চাই, নবীদের পরে সর্ববৃহৎ ইতিহাসনির্মাতা, বিপ্লবাত্মক ও জগতস্রষ্টা উক্তি, যেটি একটি নতুন ইতিহাসের ভিত রচনা করেছিল, মস্তিষ্কে বিপ্লব তৈরি করেছিল, হাজার-হাজার সংস্কারক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, মহামানব তৈরি করেছিল, বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যসম্ভারে, ধর্মগুলোর ইতিহাসে এবং সমাজের

ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বাক্যগুলোর তালিকায় কেউ এত ক্রিয়া ফেলতে পারেনি, যতখানি ফেলেছিলেন বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও কর্মের ইতিহাসে সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর اينقص الدين وانا ح (আমি বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি হবে?) বাক্যটি। এটি এমন একটি বাক্য, যেটি হৃদয়ের পাতে অঙ্কিত করে রাখার যোগ্য। আল্লাহ সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)কে দীনকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি যদি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কাজ না নিতেন, তা হলে ইসলামের অস্তিত্ব ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আজ যাকাত অস্বীকারকারীরা ইসলামের একটি রোকনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। কাল ধীরে-ধীরে অন্যান্য রোকনগুলোরও ওপর হামলা চালাবে। অপরাপর ধর্মগুলোর ইতিহাস বলছে, বিয়োজন ও বিকৃতির ধারা যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আর তা থামে না। সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর এই মূল্যবান ও ওজনদার বাক্যটি কবিদের কাব্যসম্ভার ও ইসলামি সাহিত্যে বিশেষ এক মর্যাদার অধিকারী।

ভাষণের ধারা অব্যাহত রেখে আমি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, বর্তমানে দেশে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, দীনি বোধবিশ্বাস ও ইসলামি প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। ভাষা ও লিখনরীতি বদলানো চেষ্টা চলছে। সারা দেশে একই রকম সিভিল কোডের জন্য পথ রচনা করা হচ্ছে। আপনি যদি আরএসএস ও শিবসেনার নেতা বাল থ্যাকারের গ্রন্থগুলো পড়েন, তখন এই সবগুলো ষড়যন্ত্রের খোঁজ পেয়ে যাবেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাভাবনা ও আইনগত বিচক্ষণতার সাথে এমন নকশা প্রস্তুত করা হচ্ছে যে, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধর ভাষা ও পোশাকের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। সেজন্য আমাদেরকে নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষার জন্য সিদ্দীকি স্লোগানকে নিজেদের ঘোষণাপত্র বানিয়ে নিতে হবে। ঘর লুণ্ঠিত হবে হোক, জীবন চলে যাবে যাক; কিন্তু ঈমান যেন না যায়। না খেয়ে জীবন কাটাব; কিন্তু নামায ছাড়ব না। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশ বদলে ফেলুন। নবী-রাসূলদের সীরাত ও সাহাবাদের ঘটনাবলি বাচ্চাদের শোনান। তাদের মাঝে দীনের ওপর অটল থাকার, তার জন্য সব ধরনের ত্যাগ ও ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার সাহস ও প্রত্যয় তৈরি করুন। ইসলাম ও ঈমানের জন্য গর্ব করা শেখান। তাদের মাঝে কুফর, শেরক ও বিজাতির অনুসরণের ঘৃণা সৃষ্টি করুন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দিন। নবীর সীরাত ও সাহাবাদের কীর্তিমালা ও ইসলামের ইতিহাসে সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন।

আমার ভাষণের পর মাওলানা কারী মুহাম্মাদ সিদ্দীক সাহেব বান্দুবি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন, যেখানে তিনি আমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেন এবং দু'আর মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত করে দেন।

কয়েকটা তিক্ত বাস্তবতা ও উদ্বেগজনক ঘটনা

আমার কারওয়ানে যিন্দেগী তার সফরের সামনের মনযিলগুলো অতিক্রম করার এবং সফরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করার আগে মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটি অপ্রিয়; অথচ জরুরি কর্তব্য জ্ঞান করে এমন দুটি তিক্ত ও কষ্টদায়ক বাস্তবতার উল্লেখ করব, যেগুলো একদিকে ইসলামি বিশ্বের জন্য উদ্বেগজনক, অপর দিকে তার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং মুসলিম সমাজে তার প্রভাব পড়ছে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে অতি দ্রুত তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

'মৌলবাদী' ও 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্বজনীন অভিযান

কিছু-কিছু সারগর্ভ কবিতা এমন আছে, যেগুলো অধিক ব্যবহার ও স্থানে-অস্থানে সেগুলো দ্বারা কাজ নেওয়ার ফলে নিজের অন্তর্বিষয়গত ভাব, গভীরতা, আবেদন ও স্পর্শকাতরতা হারিয়ে ফেলেছে। এমন ঘটনা প্রত্যেক ভাষার সঙ্গেই ঘটেছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো কবি সাওদার এদুটি চরণ :

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑے زمانہ میں

تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

তোমার তির শিকারকে রক্ষা করেনি কোনোকালেই।

পাখির বাসায় কম্পাসের কাঁটা কেঁপে উঠেছে বারবার।

ইসলামি মনমানস, বোধবিশ্বাস, চিন্তা-দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলিম সমাজ ও প্রতিবেশকে বিভিন্ন সময়ে অনেক অস্থিরতাজনক, বিভ্রান্তিকর কিংবা সংশয়বাদী আন্দোলন ও দাওয়াতের সম্মুখিন হতে হয়েছে। যেমন– এ'তেযাল (মু'তাযিলি মতবাদ), খালকে কুরআনের বিশ্বাস, গ্রিস দর্শন দ্বারা মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবিত হওয়া এবং সেই অনুসারে দীনের গূঢ়তত্ত্ব ও বিশ্বাসের ব্যাখ্যাপ্রদান, তারপর শেষ যুগে এসে পশ্চিমা দর্শন ও পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা

প্রভাবিত হওয়া, তার সামনে আত্মসমর্পণ ও সে অনুসারে দীনের এবং কোনো-কোনো সময় কুরআনের ব্যাখ্যা; অবশেষে নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়া, যা কিনা আধুনিক শিক্ষা ও পশ্চিমা ক্ষমতার ক্রিয়ায় বহুসংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্র ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির লোকদের মাঝে তৈরি হয়েছে।

কিন্তু সেগুলোর কোনো একটিও (নিজের সমকালীন ও স্থানীয় জাদুময়তা এবং চিত্তাকর্ষণ সত্ত্বেও) ইসলামের অস্তিত্ব ও টেকসইয়ের জন্য ঝুঁকি এবং তাকে জীবন থেকে বের করা এবং সব ধরনের ক্রিয়া ও সফলতা থেকে বঞ্চিত করার একটা গভীর ষড়যন্ত্র এবং তারপর গোটা ইসলামি বিশ্বের জন্য একটা চ্যালেঞ্জের মর্যাদা রাখত না। কিন্তু আমেরিকা থেকে উঠে আসা মৌলবাদ ও মৌলবাদীবিরোধী স্লোগান, চেষ্টা-প্রয়াস একটা সুপরিকল্পিত বিশ্বজনীন আন্দোলন ও দাওয়াত, যেখানে ইহুদি দেমাগ, আমেরিকা ও ইউরোপের ধর্মীয়, বিদ্যাগত, চিন্তাগত, দাওয়াতের মিশনে হীনম্মন্যতা, ইসলামের পরিধির বিস্তৃতি, খোদ পাশ্চাত্যে তার প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতার আশঙ্কা, অবশেষে রুশবিপ্লবের পর ইসলাম ও একটি শক্তিশালী ইসলামি দুনিয়ার (যেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ, ইসলামি শিক্ষামালার ওপর আমল করার জযবা পাওয়া যায় এবং তার মাঝে পৃথিবীর সম্মুখে একটি জাদুময় নমুনা উপস্থাপনের যোগ্যতা বিদ্যমান) বস্তুপূজারি পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী রণাঙ্গন তৈরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার ভূমিকা রয়েছে। এসবই হলো এই মৌলবাদী ও মৌলবাদবিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার মূল কারণ।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যারা ইসলামকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান এবং মানুষকে ইসলামের বিধিবিধান অনুসারে জীবন কাটানোর দাওয়াত দেন, তাদের প্রতি ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। খোদ মুসলিম ও আরব দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন শ্রেণি, শিক্ষাব্যবস্থা, সাংবাদিকতা ও প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণিটির মাঝে এই ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, যদি এই ইসলামপ্রিয় শ্রেণিটি (যার জন্য 'মৌলবাদী' পরিভাষা আবিষ্কার করা হয়েছে) সফল হয়ে যায়, তা হলে এরা সরকার ও নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মৃত্যুর বার্তা বয়ে আনবে, তাদেরকে সব ধরনের ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বরং তাদের সেই দেশগুলোতে জীবন কাটানো দুষ্কর হয়ে যাবে, যেখানে তারা সাদা-কালোর মালিক এবং লাগামহীন শাসক।

এই চিন্তাধারা মুসলিম ও আরব দেশগুলোতে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে। কোনো-কোনো দেশে (যেগুলোর

মধ্যে কয়েকটি আরব দেশ, আলজেরিয়া, তিউনিস ও লিবিয়া তালিকার শীর্ষে রয়েছে)। মিশরও এখন সেই বৃত্তের মাঝে পা রেখেছে। এখন সম্পূর্ণ মনোযোগ ও প্রয়াস সেই শ্রেণি ও দলটিকে প্রভাবহীন বানিয়ে দেওয়া; বরং তাদের আশঙ্কা থেকে স্থায়ীভাবে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার ওপর নিবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা প্রকাশ্যে ইসলামের নাম উচ্চারণ করছেন, সমাজকে দীনি শিক্ষা, ইসলামের সামাজিক, নৈতিক ও শরীয়তের শিক্ষামালার ধারক, বাহক ও তার নমুনা দেখতে চান। কোথাও এই শ্রেণিটির জন্য 'মুতাশাদ্দিদীন' (কট্টরপন্থী) শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, কোথাও 'মুতাযাম্মিতীন', কোথাও 'রাজঈয়্যীন' (পশ্চাৎপদ), কোথাও 'মুবদিয়্যীন', কোথাওবা 'উসূলিয়্যীন' (মৌলবাদী)। সরকারের বড়-বড় দায়িত্বশীলগণ তাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বের আলেমদের কাছে তাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। সরকারের মুখপত্র কিংবা সমমনা পত্রপত্রিকাগুলোতে নিবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে। কনফারেন্স ও সেমিনার হচ্ছে। এখন ভয়টা হলো, পাছে কবির

تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

এই পঙ্‌ক্তিটি সত্যে পরিণত হয়ে যায় কিনা। বরং আরও সামনে অগ্রসর হয়ে কম্পাসের কাঁটার মুখ থেকে সেই শব্দগুলোই বের হয়ে যায় কি-না, যেগুলো এই প্রগতিবাদী দেশগুলো এবং আমেরিকার তল্পিবাহীরা অবলীলায় ও নিঃশঙ্কচিত্তে বলে বেড়ায়। বর্তমানে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে (যা কিনা ইসলামি বিশ্বের জন্য ক্রুশেড যুদ্ধ ও তাতারি আক্রমণগুলোর চেয়েও বেশি ভয়াবহ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নানা উপায়ে কার্যকর প্রয়াস চালানো আবশ্যক। কারণ, ইসলামকে যদি জীবন থেকে বের করে দেওয়া হয়, ইসলামের মূলনীতি, বৃত্ত ও সীমানাগুলোকে যদি মুছে ফেলা হয়, তা হলে সেই দিন কোথায় টিকে থাকবে, যেটি কুফর, ঈমান, তাওহীদ ও শিরক; এমনকি সুন্নাত ও বিদআত, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য বিধান করে এবং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে :

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

'সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন একটি মজবুত হাতল ধরে ফেলল, তার কোনো ভাঙন নেই। আল্লাহ সর্বাশ্রোতা ও প্রজ্ঞাময়।'[১]

এবং তার দাবি হলো :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[২]

কুরআন আরও ঘোষণা করেছে :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

'দীন আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলাম।'[৩]

সেজন্য বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সবচেয়ে শঙ্কা সেই আন্দোলন ও পশ্চিমা ষড়যন্ত্র, যাকে 'মৌলবাদ' ও 'মৌলবাদী' নাম দিয়ে বিশেষ করে এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছে।

মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও চরিত্রনাশের অভিযান এবং ইসলামি শরীয়ার প্রতি অনাস্থা ও চিন্তাগত অস্থিরতার আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানদের তাদের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব, সভ্যতা-সংস্কৃতি; বরং স্বতন্ত্র বোধবিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত করার পরিকল্পিত যে-আন্দোলন বিগত কয়েক বছর যাবত চলে আসছিল এবং যার বিস্তারিত বিবরণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ এই গ্রন্থের শুরুর দিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার দাবি ছিল, জাতির মাঝে যথাসম্ভব চিন্তার ঐক্য, পারস্পরিক আস্থা; বরং বিদ্যাগত সহযোগিতা, আলেমসমাজ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকবে এবং তাঁদের সঙ্গে (শোনাকথা কিংবা খুঁটিনাটি বিরোধের সূত্রে) সমালোচনা ও ভর্ৎসনা-তিরস্কারের আচরণ করা হবে না।

---

১. *সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬*
২. *সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮*
৩. *সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯*

কারণ, তার ফলে জাতির সেবায় নিয়োজিত লোকদের মনোবল ভেঙে যায়, তাঁদের কথার ওজন কমে যায় এবং জনসাধারণের মাঝে শুধু আলেম আর নেতাদের ব্যাপারেই নয়; বরং দীন ও শরীয়তের ব্যাপারেও একটা বিভ্রান্তি, অনাস্থা এবং তারও চেয়ে বড় করে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। কোনো-কোনো দেশ এবং ইতিহাসের কোনো-কোনো কালে এমন অভিজ্ঞতাও সামনে এসেছে এবং তার অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে আছে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো; এবং বড় একটা বিপদেরও লক্ষণ যে, ভারতের ইতিহাসের এ-সময়টায় (যেটা বিশেষ করে ভারতবর্ষের বিভক্তির পর থেকে শুরু হয়েছে) এই দুঃখজনক পরিস্থিতি অভিজ্ঞতায় আসছে যে, নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে দীন, নিষ্ঠাবান নেতৃবর্গ, জনহিতকর সংগঠন-সংস্থা ও আন্দোলনগুলো নানা অভিযোগ, সংশয় ও বিরোধিতামূলক অপপ্রচারের শিকারে পরিণত। এতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঠিক শব্দে 'নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা' এবং দায়িত্বহীন ও আল্লাহভোলা সাংবাদিকতার বিরাট হাত আছে। এর ফলে প্রায় গোটা জাতির মাঝে এক ধরনের কুধারণা, অনাস্থা, হতাশা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনসাধারণের ভাববাচ্য অনেক সময় বলতে শুরু করে, এখন কে দেবেন আমাদের নেতৃত্ব?

তার একটি দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য হলো, ভারতে যখন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তার নেতৃবৃন্দ, হিন্দি ও ইংরেজি প্রচারমাধ্যম মুসলমানদের নিজস্ব পারিবারিক আইনের সুরক্ষার প্রয়াস, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধাচরণ এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় পরিবর্তন করানোর প্রচেষ্টাকে এমন চোখে ও এমন অনুভূতির সাথে দেখছিল, যেন ভারতের ওপর কোনো বহিঃশক্তি আক্রমণ করে ফেলেছে কিংবা দেশটির ও বজ্রপাত পতিত হওয়ার উপক্রম কিংবা ভূমিকম্প হতে যাচ্ছে। এমনি পরিস্থিতিতে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড তার দাবি ও চেষ্টা-প্রয়াসে এমন সাফল্য অর্জন করল, যার দৃষ্টান্ত দীর্ঘ দিন যাবত কোনো জাতীয় বা দীনি আন্দোলন কিংবা কোনো গণদাবি আদায়ের আন্দোলনের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৫ মে পার্লামেন্ট প্রকাশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই বিলটি পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বদলে দেয় এবং একটা না-হওয়ার মতো বিষয় হয়ে গেল। এ বিষয়ে এটি ফল ছিল মুসলমানদের ঐক্য, তাদের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ সমর্থন, দেশব্যাপী সভা-সেমিনার ও হাজার-হাজার তারবার্তার, যেগুলো এই দাবির পক্ষে প্রদান করা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় বিষয়টি ছিল সেই কর্মকৌশল, গঠনমূলক মানসিকতা ও ইতিবাচক কর্মপন্থা, যেগুলো এ লক্ষ্যে অবলম্বন করা হয়েছিল। এই

সাফল্যের সঙ্গে আরও একটি দিক বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মুসলমানদের এই কর্মনীতি, আন্দোলনের এই পন্থা এবং নিজেদের দাবিকে বিদ্যাগত ও ইতিবাচক ধারায় উপস্থাপনের এই সুফলও পাওয়া গেল যে, ইসলামি আইন যে সুবিচারমূলক, প্রজ্ঞাপূর্ণ, সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য আইনের মোকাবেলায় পূর্ণাঙ্গ, তার স্বীকৃতি ও প্রতিক্রিয়া অনেক অমুসলিম ও আইনবিশেষজ্ঞদের অঙ্গনে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমি শুধু তৎকালীন প্রদানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব, যেটি তিনি মাদ্রাজের পাক্ষিক তামিল পত্রিকা 'তুঘলক'-এর সম্পাদক চোরানা স্বামীকে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

> 'নারীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় ইসলামি আইন আমাদের আইনের চেয়েও বেশি গ্যারান্টি বহন করে। মুসলিম আইনবিদ, পণ্ডিতবর্গ, আলেম ও আধুনিক শিক্ষিতদের সঙ্গে মতবিনিময় করে আমি জানতে পেরেছি, মুসলিম পার্সোনাল আইনের সীমানায় অবস্থান করে নারী-অধিকারের যথেষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে। মুসলমানরা মনে করে, আদালতগুলো মুসলিম পার্সোনাল আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আদালতগুলো যদি ইসলামি আইনের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়, তা হলে আর কোনো আপত্তি থাকবে না।'

এবার বুকের ওপর হাত রেখে এবং অনুশোচনায় মাথাটা খানিক নত করে একে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করুন। পার্সোনাল ল বোর্ড যখন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ করছিল, দেশে সমাজসংশোধনের আন্দোলন চালাচ্ছিল, যৌতুকের দাবি ও অপচয়-অপব্যয়ের প্রবল বাড়াবাড়ির মধ্যে যার প্রয়োজনীতা তীব্র ছিল এবং পারিবারিক আইন, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে শুধু অমুসলিমদের মাঝেই অমর্যাদা নয়; মুসলমানদের মাঝেও অনাস্থা তৈরির কোনো সুযোগ ছিল না, ঠিক এমনি সময়ে এক তালাক-তিন তালাকের আলোচনা সামনে নিয়ে আসা হলো। অথচ, এটি এমন একটি বিষয়, যার আলোচনা পত্রপত্রিকা, চায়ের দোকানে, চৌরাস্তায় আসবার কোনো সুযোগ ছিল না। চিন্তা-গবেষণার দাওয়াত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলই যদি, তো এর স্থান ছিল ইলমি ও ফিকহি সভা-সমাবেশ, বিদ্যাগত আলোচনার আসর, কেন্দ্রীয় ও উঁচু স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইসলামি বিদ্যাপীঠগুলোর দারুল ইফতা ও তার বিশেষজ্ঞগণ।

কিন্তু খুবই আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, কোনো-কোনো সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে এক মজলিসের এক তালাক ও তিন তালাকের বিষয়টি পত্রিকার পাতায় চলে এসেছে এবং আলোচনাটিকে তারা চৌরাস্তায় তুলে দিয়েছেন। উরদু পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে সাদামাটা লেখা; এমনটি মহিলাদের চিঠিপত্র পর্যন্ত ছাপতে শুরু করল। এমন কোনো দিন ছিল না, যেদিন এ বিষয়ে কোনো ছাপা হয়নি। এসব লেখা ও নিবন্ধগুলোতে এমন তাচ্ছিল্যমূলক ও আক্রমণাত্মক ধারা অবলম্বন করা হলো, যার ফলে অন্তত জনসাধারণের মনে ইসলামি শরীয়ত এবং তার আদর্শ ও মানসম্পন্ন যুগ এবং তার বিশেষজ্ঞশ্রেণি ও প্রতিনিধিদের ব্যাপারে সংশয় তৈরি হয় এবং বিষয়টি নিজের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ও ভাষণ-বক্তৃতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

তার একটা বেদনাদায়ক; বরং লজ্জাজনক ফলাফল সামনে এল যে, হিন্দি ও ইংরেজি পত্রিকাগুলো তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও মশকারা-পরিহাসের একটা বিষয় এবং মুসলমানদের দীনি ব্যবস্থাপনা, ইসলামি শরীয়ত ও আইন অবমাননার একটা অস্ত্র পেয়ে গেল। সেই দিনগুলোতে যারা হিন্দি ও ইংরেজি পত্রপত্রিকার পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে লেখা নানা ধরনের অবজ্ঞা ও পরিহাসমূলক নিবন্ধ পাঠ করেছেন, লজ্জা ও অনুশোচনায় তাদের মাথা নত হয়ে গিয়েছিল, ইসলামি শরীয়ার অবমাননামূলক লেখা পড়ে তাদের গায়ের রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল, তাদের কপাল ঘর্মসিক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মাঝে এই অনুভূতি জেগেছিল যে, আমাদেরই অদূরদর্শী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই মওকাটা দিয়েছিল।

জীবনের দীর্ঘমত সফর

আমি এমনিতেই ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘ সফর করেছি, যার আলোচনা 'কারওয়ানে যিন্দেগী'র বিগত খণ্ডগুলোতে বিস্তারিতভাবে এসেছে। প্রথমে জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড) অবস্থিত ইসলামিক সেন্টারের অনেকগুলো সমাবেশে অংশগ্রহণের নিমিত্ত কয়েকবার যাওয়া হয়েছে। আবার এই সফরগুলোর মধ্যখানে ইংল্যান্ড ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনও ঘুরে এসেছি, যেগুলোর আলোচনা 'কারওয়ানে যিন্দেগী' দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তারপর ১৯৭৭ সালে করেছি আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি ও দীর্ঘ দূরত্বের সফর। এই সফরে আমেরিকার প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহর ও কেন্দ্রে যাওয়া হয়েছে, কানাডা সফরও যার অন্তর্ভুক্ত এবং যেটি ১৯৭৭ সালের ২৮ মে থেকে শুরু করে ৬ আগস্টে গিয়ে শেষ হয়। তারপর ১৯৮৩

সালের জুলাই মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাকে তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এই সূত্রে প্রথমবার ১৯৮৩ সালের ২০ ও ২১ জুলাই স্নেহাস্পদ মৌলভী রাবে' নদবিকে সাথে করে লন্ডন যাওয়া হয়। তারপর প্রতিবছর ইসলামিক সেন্টারের সম্মেলনগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য ইংল্যান্ড যাওয়ার ধারা শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে লাক্সামবুর্গ (বেলজিয়াম) যাওয়া হয়েছিল, যেখানে আমি একটি ইসলামি গবেষণা কমিটিতে অংশগ্রহণ করেছি। তার পর থেকে সেন্টারের সম্মেলনগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় প্রতিবছর সফরের ধারা চলতে থাকে।

কিন্তু ১৯৯৩ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে যখন বয়স ও স্বাস্থ্য দীর্ঘ সফর, বড় কোনো দায়িত্বের ভারবহন ও কঠিন কোনো ব্যস্ততার (স্বাভাবিক ও বাহ্যিকভাবে) যোগ্য রইল না, তখন জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘদূরত্ব, বিচিত্র জায়গা ও গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশগুলোতে অংশগ্রহণ এবং কোনো-কোনোটির সভাপতিত্বের জন্য সফর করতে হলো, যেটি ছিল সে-সময় পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সফর। সেই সফরে তিনটি মহাদেশ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া অন্তর্ভুক্ত। এই সফর ইস্তাম্বুল (প্রাচীন কুস্তুন্তুনিয়া), লন্ডন, অক্সফোর্ড, শিকাগো, নিউইয়র্ক ও জেনেভা (সুইজারল্যান্ড) হয়ে পবিত্র হেজায গিয়ে সমাপ্ত হয়। এই সফরে আমার মদীনা তাইয়িবার যিয়ারত ও মক্কা মুয়াজ্জমার হাজিরির সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

এই সফরে একটা পরীক্ষার বিষয় এবং চিন্তা ও দ্বিধার একটা কারণ ছিল, আমার এই ক্ষুদ্র বংশে নিকট অতীতে প্রচণ্ড আঘাতের চারটা ঘটনা ঘটেছিল, যার দুটা ছিল একান্তই আমার নিজের পরিবারে। সেই রুগ্ন লোকগুলোকে শয্যাশায়ী রেখে এত দীর্ঘ সফরে বের হওয়া বিরাট একটা পরীক্ষা ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ও নানা দাবির কাছে অপারগ হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমাকে সফরে বেরিয়ে পড়তে লাগল এবং পুরো সফরে সুস্থতা ও রোগনিরাময়ের দুআ করতে থাকি।

এই দীর্ঘ ও নানা স্থানের অনুষ্ঠাগুলো এভাবে সাজানো হলো যে, রাবেতা আদবে ইসলামীর মজলিসে উমানা (সেক্রেটারিয়েট) ও সাধারণ পরিষদের বৈঠক ৩ রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরি (২০ আগস্ট ১৯৯৩) কিংবা ৮ রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরি (২৫ আগস্ট ১৯৯৩) ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, যেখানে আমি অধমের সভাপতি হিসেবে এবং স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদবির সহসভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ

জরুরি ছিল। অপর দিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজ-এর বার্ষিক সভা ১ ও ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল, যার জন্য আমাদের ২৮ কিংবা ২৯ আগস্ট লন্ডন পৌছা জরুরি ছিল।

এর ওপর বাড়তি প্রোগ্রাম হলো, শিকাগোতে (আমেরিকা) নানা ধর্মের একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল, যেটি ২৮ আগস্ট ১৯৯৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত চলার কথা ছিল এবং যেখানে বিভিন্ন ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, পণ্ডিতবর্গ ও প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি একশো বছর আগে ১৮৯৩ সালে ঠিক এই জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কথিত আছে, সেই সম্মেলনে প্রখ্যাত ভারতীয় ধর্মনেতা স্বামী বিবেকানন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন। একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও স্তর থেকে এই কনফারেন্সের আয়োজনটা করা হয়েছিল। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মের পরিচিতি, বিশ্লেষণ ও উপকারিতার বর্ণনা এবং বস্তুপূজা, প্রবৃত্তিপূজা, ধর্মবিমুখতা ও নাস্তিকতার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তাদের যোগ্যতা তুলে ধরা এবং ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ ও আত্মিকতার প্রতি মানুষের অনীহার মোকাবেলায় একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করা।

এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য কনফারেন্স ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। (৫ আগস্ট ১৯৯৩-এর তারিখ এবং চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরসম্বলিত) এই আমন্ত্রণপত্রটি সরাসরি নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ-এর ঠিকানায় এসে পৌঁছেছিল। পত্রে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল, এই কনফারেন্সে বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ৪ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন এবং তার কার্যবিবরণি ও আলোচনা-গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের বন্দোবস্ত আছে।

আমি সাধারণত এ ধরনের কনফারেন্সের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত ছিলাম, যেগুলোর পেছনে কোনো নিষ্ঠাবান, দরদী ও আল্লাহর মদদপুষ্ট কোনো দল বা ব্যক্তির হাত ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। আমার এই সন্দেহও ছিল যে, এর পেছনে আমেরিকার হাত থাকতে পারে। হয়তোবা মৌলবাদবিরোধী প্রচারণার ফলে তার যে-দুর্নাম হয়েছে, তাকে দূর করার জন্য এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে কিংবা এতে তার ইঙ্গিত আছে। তা ছাড়া মনে সংশয় জাগল, হয়তো যাব; কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ পাব না এবং এত দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের মূল্য উসুল করতে পারব

না। সেইসঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা এবং সফরের দীর্ঘতা তো আছেই। সব মিলিয়ে এই সফরের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমার পাটনার বন্ধু ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের পরপর কয়েকটি পত্র ও টেলিফোন এল। তিনি আমাকে এই কনফারেন্সে যোগদানের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করলেন। যুক্তি দেখালেন, আমার এক সহোদর হামেদ আবদুল হাই (যিনি দীর্ঘদিন যাবত হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার হিসেবে শিকাগোতে অবস্থান করছেন) এই কনফারেন্স আয়োজনে একজন মুসলমান ও সম্মানিত নাগরিক হিসেবে সম্পৃক্ত। তিনি এই সম্মেলন উপকারী হবে বলে আশাবাদী। ফলে মনে-প্রাণে কামনা করছেন, এতে মুসলমানদের চমৎকার একটি প্রতিনিধিত্ব হোক। তিনি বিশেষভাবে আশা পোষণ করছিলেন এবং চেষ্টাও চালাচ্ছিলেন, যেন আমি এই কনফারেন্সে যোগদান করি এবং ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি। এই পীড়াপীড়ি ও তাগাদা এত দীর্ঘ ও শক্তিশালী হলো যে, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হলো না। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব বলে ওয়াদা দিতে বাধ্য হলাম। এই বিশেষ সফরের জন্য তিনি ভাইয়ের মাধ্যমে লন্ডন থেকে আমার ও আমার সহকর্মী মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদবির জন্য সফরের সকল আয়োজন সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। অবশেষে এটিও আমার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

বিশেষ একটি কারণে শিকাগোর সঙ্গে নিউইয়র্ককেও যুক্ত করে নিতে হলো। আমার এক বন্ধু আছেন ওছমান সাহেব। আমেরিকান নাগরিকত্বের অধিকারী। নিউইয়র্কে নিজস্ব বাড়িও আছে। পরিবার-পরিজন ওখানেই থাকে। নিজের সৌদি এয়ারওয়েজে ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন যাবতই আমেরিকা গিয়ে তার ওখানে কিছু সময়ের জন্য হলেও বেড়াতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। এই গোটা সফরে আমার সঙ্গে থাকতে এবং বিশেষ করে আমাকে আরাম দিতে সৌদি আরব থেকে দিল্লি আসবার প্রোগ্রাম নিয়েছেন, যেন যেতে ও আসতে পুরো সফরে আমার সাথে থাকতে পারেন এবং আমাকে সঙ্গ ও সহযোগিতা দিতে পারেন। তা ছাড়া নিউইয়র্কে আরও একাধিক সুহৃদ ছিলেন। ওখানে কিছু দাওয়াতি বক্তৃতাও হতে পারত। সেজন্য নিউইয়র্ককেও এই সফরের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হলো। লন্ডন থেকে শিকাগো যেতে পথে নিউইয়র্কে যাত্রাবিরতি দিলে বিশেষ আরামও হয়। কারণ, শিকাগো তারও পশ্চিমে। ওখান থেকে শিকাগো যাওয়া সহজ।

শিকাগো থেকে পবিত্র হেজায গমন এবং একটি মহৎ কাজের মাধ্যমে এই সফরের ইতি টানা একটি সহজাত, আবেগময় ও দীনি তাগাদা ছিল। সেজন্য

এই সফরের সঙ্গে আমি হেজাযকেও শামিল করে নিলাম। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে জিদ্দার জন্য সরাসরি কোনো সার্ভিস ছিল না। নিউইয়র্ক থেকে জেনেভা যেতে হবে। জেনেভা থেকে জিদ্দার জন্য বিমান ধরতে হবে। সেজন্য জেনেভাও এই সফরে যুক্ত হয়ে গেল। তার বিশেষ একটি কারণ এটিও ছিল যে, সাঈদ রমজান মিশরির সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার দরকার ছিল। ইনি আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্নার জামাত এবং ইসলামিক সেন্টার জেনেভার প্রতিষ্ঠাতা। অনেক দিন হলো, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। বিমানের জন্য চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কাজটি সেরে নেব। টেলিফোনের মাধ্যমে প্রোগ্রামটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হলো। তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর পর সাক্ষাতের এই সুযোগটা পেলাম।

এই দেশগুলোর ঠাণ্ডা এবং নিজের স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমেরিকা থেকে জিদ্দা হয়ে মদীনা তাইয়িবায় হাজিরির নিয়ত করে ফেলি এবং ওখান থেকে এহরাম বেঁধে মক্কা চলে যাব। তাতে স্বাস্থ্যের প্রতিও যত্ন হবে আবার এহরামও মদীনা থেকে বাঁধা হবে, যেটি নবীওয়ালা আমল এবং বিদায় হজের সুন্নতের অনুরূপ।

এ হলো এই সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণি। এবার আসুন খানিক বিস্তারিত জেনে নিই।

দিল্লি থেকে ইস্তাম্বুল

১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় দিল্লি থেকে আবুধাবির উদ্দেশে রওনা হলাম। কারণ, তখন দিল্লি থেকে ইস্তাম্বুলের জন্য সরাসরি কোনো সার্ভিস ছিল না। এই সফরে স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' ছাড়াও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক এবং বিশেষ বুলেটিন আর-রায়িদ (আরবি)-এর সম্পাদক স্নেহাস্পদ মৌলভী সাইয়িদ ওয়াজেহ রশীদ নদবি, দারুল উলূমের শিক্ষক ও নায়েবে মুহতামিম এবং আল-বা'ছুল ইসলামী (আরবি)-এর সম্পাদক মৌলভী সাঈদুর রহমান নদবি আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। এরা দুজন রাবেতা আদবে ইসলামীর মজলিসে উমানা ও তার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

যোহরের সময় বিমান আবুধাবি গিয়ে পৌঁছল। ওখানে ব্যাপকভাবে জানাজানি না করা সত্ত্বেও আবুধাবি ও শারেকার অনেক বিশিষ্ট নাগরিক, ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত বিপুলসংখ্যক লোক

উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে শায়খ আবদুল্লাহ আল-আযীয, শায়খ সালেম ইবনে আলী আল-মাহমুদ, শায়খ সাঈদ আহমাদ লূতাহ (ইসলামী ব্যাংকের মালিক) এবং ভটকল ও ভারতে একাধিক সুহৃদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভটকল ও ভারতের যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের কয়েকজন হলেন সাঈদ নাওয়ায়েত সাহেব ভটকলি, ভাই মুহাম্মাদ ইসমাঈল, মৌলভী আবদুল আযীয ও কারী আবদুল হামীদ নদবি। শারেকার গভর্নর শায়খ সুলতান কাসেমি – যার সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল – সে-সময় ইউরোপ ছিলেন। অনুরূপ বিশিষ্ট দীনি ব্যক্তিত্ব শায়খ সাইফুল গারীরও দেশে ছিলেন না। আবুধাবির আওকাফ মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা ওমর আল-মাদফা'-এর বাড়িতে দুপুরের খানা খেলাম, যেখানে আহারের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল। আবুধাবি আমার কয়েকবারই যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার গিয়ে বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম যে, এই বছরকয়েকের মধে দেশটি সংস্কৃতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে এতখানি এগিয়ে গেছে যে, একে একটি ইউরোপীয় নগরী বলে ভ্রম হয়। পুরোটা শহর বিশাল-বিশাল ভবনে ভরে গেছে, যেটি দীনের কোনো দাঈ এবং জাযীরাতুল আরবের মর্যাদা ও বার্তার সাথে পরিচিত ও ভক্ত কোনো ব্যক্তির জন্য তেমন কোনো আনন্দের বিষয় নয়।

ইস্তাম্বুলে

আবুধাবিতে ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অবস্থান করে প্রায় ৫টায় আছর নামাযের সময় আমরা ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে শারেকা এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হলাম। রাত প্রায় ৯টার সময় আমরা ইস্তাম্বুল পৌঁছে গেলাম। আমাদের স্বাগত জানাতে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইস্তাম্বুলের লালি নামক স্থানে সুলতান হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। ওখানে গিয়ে জেনে খুশি হলাম, আমার পুরনো সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদবিও এসেছেন এবং এই হোটেলেই অবস্থান করছেন। আমরা দুজন পরস্পর মিলিত হয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। মাওলানা খুবই দুর্বল হয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও এই দীর্ঘ সফরের সাহস করেছেন। সামনে যথাস্থানে তাঁর সঙ্গে আমার পরনো দিনগুলোর স্মৃতি ও তাঁর মজলিসগুলো নিয়ে আলোকপাত করব।

পরদিন সৌভাগ্যক্রমে জুমাবার ছিল। আমি জুমার নামায সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ (কুস্তুন্তুনিয়া বিজেতা) জামে মসজিদে আদায় করলাম, যেটি মুসল্লীদের দ্বারা কানায়-কানায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তুর্কিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে

উপস্থিত সকল মুসল্লী কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামাযে রত ছিল কিংবা আদবের সাথে চুপচাপ বসে ছিল। নামাযের পর সুলতান মরহুমের কবরে – যার অবস্থান মসজিদের সংলগ্নই – ফাতেহা পড়লাম এবং কল্যাণের দু'আ করলাম।

পরদিন ২০ আগস্ট থেকে রাবেতার মজলিসে উমানার (সেক্রেটারিয়েট) সভা শুরু হয়ে গেল, যেটি দুদিন অব্যাহত ছিল। ২২ থেকে ২৫ আগস্ট পযন্ত রাবেতার সাধারণ পরিষদের সভা এবং ২৬ ২৭ তারিখে মজলিসে উমানার আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। পরিষদের মূল বিষয়বস্তু ছিল تقريب المفاهيم لقضايا الأدب الاسلامى দেখে আমি খুবই আনন্দিত হলাম যে, স্থানের ভিন্নতা এবং দূরত্ব ও সফরের কঠিনতা সত্ত্বেও পরিষদে বেশ ভালোই প্রতিনিধিত্ব আছে, যাদের মধ্যে আরব দেশগুলোর সিরিয়া, সৌদিআরব, বাহরাইন, জর্ডান ও কুয়েতের প্রতিনিধিও রয়েছেন। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৩। শুধু মিশর থেকেই এসেছেন ১০জন প্রতিনিধি। সিরিয়া থেকে ৪জন, সৌদি আরব থেকে ১০জন, জর্ডান থেকে ৫জন, বাহরাইন ও কুয়েত থেকে ২জন। তাঁদের ছাড়াও তুরস্ক থেকে এমন কতিপয় আগ্রহী পণ্ডিত এসেছেন, যারা হয় আরবি বুঝতেন, নাহয় অনুবাদের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারতেন। অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা ছিল সুলতান হোটেলে। প্রায় প্রত্যেককে আলাদা কক্ষ দেওয়া হলো। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মৌলভী জিয়াউল হাসান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লির আরবি সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ও প্রধান এবং রাবেতার সদস্য। এই সম্মেলনের জন্য তিনি আরবি নিবন্ধও লিখে এনেছিলেন, যেটি কনফারেন্সে পাঠ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

সাধারণ পরিষদের প্রথম বৈঠক

৩ রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরি (২০ আগস্ট ১৯৯৩) হোটেলের হলে মজলিসে উমানার (সেক্রেটারিয়েট) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হল কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল। কুরআন পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। তারপর সভাপতি হিসেবে আমি ভাষণ প্রদান করি।

খুতবাপাঠ, হামদ-সালাত ও সমাগতদের স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি শ্রোতাদের কাছে অনুমতি চাইলাম, আমি আল্লামা ইকবালের কয়েকটা পঙ্‌ক্তি দ্বারা ভাষণ শুরু করতে চাই, যেগুলোর মধ্যে রাবেতা আদবে ইসলামীর বিষয়বস্তু, এই সংস্থাটির লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তার সর্বোত্তম তরজুমানি বিদ্যমান। আমি উরদুতে এবং অনেক জোশ ও সুরেলা কণ্ঠে ইকবালের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করলাম :

اے اہل ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا
جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا
شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

ঘটনাচক্রে ওখানে আমার 'নাযরাতুন ফিল আদাবি' গ্রন্থটি পেয়ে গেলাম, যার মধ্যে এই পঙ্‌ক্তিগুলোর অনুবাদ লেখা ছিল। আমি সেখান থেকে অনুবাদটি পড়ে শোনালাম।

পরে এই কবিতাগুলোর আলোকে আমি বললাম, সাহিত্যের বড় একটি বৈশিষ্ট্য ও শক্তি হলো, সে আকর্ষণ, কর্ম, চিন্তারীতি, চরিত্র ও বিপ্লবের প্রেরণা তৈরি করে। সেজন্য সাহিত্য খুব উপকারীও হতে পারে, আবার অনেক ক্ষতিকরও হতে পারে। সাহিত্য একটি গঠনমূলক শক্তিও, আবার ধ্বংসমূলকও। তাই একে কোনো অবস্থাতেই উপেক্ষা করা যায় না। একে গঠনের জন্যও ব্যবহার করা যায়, আবার ধ্বংসের জন্যও ব্যবহার করা যায়। এই দুটিরই বহিঃপ্রকাশ আমরা প্রতিটি যুগেই দেখতে পাচ্ছি। সে সমাজকে সৃষ্টির করতে পারে, সরকারগুলোকে নির্মাণ করতে পারে। সেজন্য রচনায়, বক্তৃতায়, গদ্যে, পদ্যে সাহিত্যকে সঠিক গতির ওপর তুলে দিতে হবে এবং একে ধ্বংস, চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্তকরণ, বিনোদন ও প্রবৃত্তিলালনের উপায় বানানোর পরিবর্তে কল্যাণকামিতা, সংশোধন, আল্লাহভীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সঠিক দিকনির্দেশনার হাতিয়ার বানাতে হবে।

সুলতান হোটেলের হলে ২০ ও ২১ আগস্ট রাবেতার মজলিসে উমানার (সেক্রেটারিয়েট) এবং ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রাবেতার সাধারণ সভা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ২৬ ও ২৭ তারিখ মজলিসে উমানার আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে উমানার সভায় স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবি পুরোপুরি পাবন্দির সাথে উপস্থিত ছিল। আমি বিশ্রাম ও পুরনো বন্ধু মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদবির সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগ পেতাম। তিনি আমার কক্ষে আসা-যাওয়া করতেন এবং দু-তিন ঘণ্টা দুজন বসে কথা বলতাম। ১৯৩৯ সাল থেকে আমি ও তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করি এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি দারুল উলূমে একজন শিক্ষক এবং কিছুকাল মুহতামিম হিসেবে

কর্মরত ছিলেন। মধ্যখানে কিছু দিনের জন্য জামেয়া ইসলামিয়া ডাভেলে আরবি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে চলে গিয়েছিলেন। আমরা দুজন যখন বসতাম, তখন দারুল উলূমের চৌদ্দসালা অবস্থানের কিতাব খুলে যেত, যেখানে আমার, তাঁর এবং মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব নদবি মরহুমের আলোচনার আসর, আরব সাহিত্যিক ও তাঁদের গ্রন্থাবলির ওপর পর্যালোচনা, আল্লামা ইকবালের কাব্যের স্বাদ উপভোগ ও জাতীয় আন্দোলনগুলোর ওপর মতপ্রকাশের ধারা চলতে থাকত এবং অতীতের দিনগুলো জীবন্ত ও অঙ্কিত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াত।

রাবেতার সাধারণ সভা ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকল। ২৬ ও ২৭ তারিখ মজলিসে উমানার আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভার বিগত রীতি অনুযায়ী এক দিন বিলগ্রেড বনে – যেটি খুবই মনোরম জায়গা এবং সাথেই একটা হোটেলও আছে – একটি কবিতাপাঠের আসর অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে বেশ কজন কবি কবিতা পাঠ করেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন খালেদ কাহমিয়াও (মিশরি সাহিত্যিক ও যাহরান ইউনিভার্সিটির কবি) অংশগ্রহণ করেছিলেন। কবিতাপাঠের এই আসরে তরুণ কবি (যিনি জন্মভূমি ও জাতীয়তায় সৌদি) আবদুর রহমান উছমাবির কবিতা বিশেষভাবে খুবই পছন্দ করা হয়।

সর্বশেষ বৈঠকে আমি সমাপণি ভাষণ দিলাম। সেই ভাষণে আমি বললাম, ইসলাম ও কুরআন যে একটি মুজেযা এবং আরবি ভাষার বিশ্বজনীনতার একটি প্রমাণ হলো, রাবেতা আদবে ইসলামীর সভা – যার মূল আলোচ্য হলো আরবি সাহিত্য – তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার ভাষা আরবি নয় – তুর্কি আর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন একজন ভারতীয়, যার মাতৃভাষা উরদু। শেষে বললাম, এই সভা এবং রাবেতার সদস্যবর্গকে শুধু সাহিত্য, ভাষা ও রচনায়ই নয়– কাজে-কর্মে-চরিত্রেও ইসলামি সাহিত্যের নমুনা এবং তার বাস্তব প্রমাণ হতে হবে।

তুরস্কের এই আটরোজা অবস্থানে দুবার ইস্তাম্বুলের এশীয় অংশে যেতে হয়েছে। একবার আমার এক সুহৃদ এবং আমার অনেকগুলো গ্রন্থের অনুবাদক ইউসুফ কাররাজার (যিনি নদওয়াতুল উলামা ও লাখনৌ অবস্থান করে ভালো উরদু শিখে নিয়েছিলেন এবং আমার এক ডজনেরও বেশি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন) বাড়িতে যেতে হয়েছিল এবং তাঁর ওখানে রাতের খানা খেয়েছি। তারপর খানা এশিয়াতে খেয়ে ইউরোপ গিয়ে ঘুমিয়েছি। আরেকবার গিয়েছিলাম ওয়ালিকুই মানতাকায় হাসান কামেল এলমাযের

বাড়িতে, যেটি বসফরাস প্রণালীর কূলে অবস্থিত। আমার এক পুররো বন্ধু আমীন সিরাজের সাথে গিয়ে মাগরিবের পর ওখানে খানা খেয়েছি। সামনে সমুদ্র ও তার কূলের এমন সুন্দর দৃশ্য ছিল, যেটি কম জায়গায়ই চোখে পড়ে। সাথীদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন তুর্কি আর ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদবি। ওখান থেকে আবার ইস্তাম্বুলের ইউরোপিয়ান অংশে চলে আসি এবং সুলতান হোটেলে আপন ঠিকানায় ফিরে আসি।

ইস্তাম্বুলের এই আটরোজা অবস্থানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অনুষ্ঠানটি – যাকে এই সফরের সারনির্যাস বলা চলে – ছিল সেই জনসভা, যেটি একটি মাদরাসা কিংবা সংস্থার হলে ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে আমি নিরেট একটি দাওয়াতি ভাষণ প্রদান করি। বিষয়বস্তু এমনভাবে সামনে এসে হাজির হলো, যাকে এলহামি বলা যেতে পারে। আমি পবিত্র কুরআনের

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

'আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ করুণাময় ও দয়ালু।'[১]

আয়াতটি পাঠ করে বললাম, আমি যখন এই আয়াতটি পড়ি, তখন আমার মস্তিষ্ক তুর্কি জাতির দিকে ধাবিত হয় এবং মাথায় ভাবনা আসে, আল্লাহ যেন তুর্কিদেরই উদ্দেশ করে বলছেন, তোমাদের কাছে ঈমানের যে-দৌলত ছিল এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসলামপ্রিয়তার যে-শানদার প্রমাণ দিয়েছেন, জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছেন, বাজিন্তিনি রাজত্বের রাজধানী কুস্তুন্তুনিয়া জয় করেছেন, খেলাফতে ইসলামিয়ার জিম্মাদারি বরণ করে নিয়েছেন, পবিত্র স্থানসমূহের (ফিলিস্তিন, কুদ্‌স, ও হারামাইন শরীফাইন) সুরক্ষা করেছেন। শুধু এতটুকুই নয়– ইউরোপের ওপরও ইসলামের ছাপ বসিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তাঁদের সেই কীর্তিগুলোকে বিনষ্ট করবেন না এবং এই প্রজন্মকে এর থেকে বঞ্চিত হতে দেবেন না।

বলতে পারেন, এ তো অনেক আগের ঘটনা। মধ্যখানে কয়েকশো বছর কেটে গেছে এবং অন্ততপক্ষে এক শতাব্দিকাল তো অবশ্যই যে, এখানকার জীবন থেকে খেলাফত হারিয়ে গেছে এবং তুর্কি জাতির সম্পর্ক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

---

১. *সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩*

ইতিহাসের পাতা থেকে ধরে এনে এখন আর সেই ঈমানি যুগ ও ইসলামি কীর্তিমালার অবতারণা করলে লাভ কী হবে? তো আমি বলব, এই ধারণা ও সংশয়ের অপনোদনের লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা কাহফে হযরত মূসা ও খিজির (আ.)-এর কাহিনি বর্ণনা করেছেন যে, দুজন একটি লোকালয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা (মুখের কথায় কিংবা অবস্থার ভাষায়) ওখানকার লোকদের আতিথেয়তার সেই কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যা একটি সম্ভ্রান্ত জনবসতি থেকে আশা করা যায়। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের সেই বাসনা পূরণ করেনি। ওখানে একটা দেওয়াল ধসে পড়ার উপক্রম ছিল। হযরত খিজির (আ.) সেটি তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এর জন্য হযরত মূসা (আ.) বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন, এ আপনি কী করলেন? এরা আমাদের খবর নিল না, আমাদের খাওয়াল না; আর আপনি এদের দেওয়ালটা ঠিক করে দিলেন! অন্তত যদি বিনিময় নিয়ে কাজটা করতেন, তা হলেও তো আমাদের উপকার হতো; তা গিয়ে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারতাম!

হযরত খিজির (আ.) উত্তর দিলেন এবং নিজের এই কাজের পক্ষে যুক্তি দেখালেন, দেওয়ালটা এখানকার দুটা এতিম ছেলের, যাদের পিতা সৎকর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। দেওয়ালের নিচে গুপ্তধনের ভান্ডার আছে। যদি দেওয়ালটা পড়ে যেত, তা হলে গুপ্তধনের ভান্ডারটা বেরিয়ে আসত এবং তা মানুষের হাতে পড়ে যেত। ফলে সৎ মানুষটার এতিম ছেলেরা বঞ্চিত হয়ে যেত।

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿۸۲﴾

'আর প্রাচীরটা; ওটা ছিল নগরবাসী দুই এতিম কিশোরের এবং তার নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন, তারা বয়সপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজেরে থেকে কিছু

করিনি। তুমি যে-বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলে, এ হলো তার ব্যাখ্যা।'[১]

তো সেই জাতির ঈমানি প্রাচীর ভেঙে পড়তে এবং মাটির সাথে মিশে যেতে দেওয়া যায়, যে কিনা কয়েকশো বছর যাবত ইসলামের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল এবং মুসলমানদের মান-মর্যাদার হেফাজত করেছিল? আপনার জানা দরকার, কাবা শরীফের বর্তমান ইমারত সুলতান মুরাদের তৈরী এবং মসজিদে নববির আসল ইমারত (যেটি বর্তমান সম্প্রসারিত অবয়বের আগে ছিল) সুলতান আবদুল মজীদ ছানির নির্মিত। হযরত খিজির ও মূসা (আ.)-এর কথোপকথন উল্লেখ করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, একজন নেক ও ঈমানদার মানুষের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তার আমলকে বিনষ্ট করেন না এবং তার সন্তান ও উত্তরাধিকারীরা তার উসিলায় কল্যাণ লাভ করতে থাকে। তাই এর জন্য বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া উচিত যে, মহান আল্লাহ বর্তমান তুর্কি প্রজন্মকে পুনরায় ঈমানি দৌলত (ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে) দান করবেন এবং তাদের পূর্বসূরীদের ঈমানি শক্তি ও ইসলামের সেবার প্রতিদানে তাদের পুঁতে রাখা ধন ও রেখে যাওয়া সম্পদের হেফাজত করবেন।

যদি বলেন, এতদিন পর ইসলামের এই নির্জীব হয়ে-যাওয়া চারাটা কীভাবে সজীব-সতেজ হবে এবং দীনের এই সম্পর্ক, যা কিনা একের-পর-এক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের নিশানা হচ্ছে আবার কীভাবে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হবে? তোর এর জন্য আল্লাহ তা'আলা আরেকটি ঘটনার (সম্ভবত হযরত ওজায়র নবীর) অবতারণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আছে, হযরত ওজায়র (আ.) এমন একটি লোকালয়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যেটি একদম মাটির সাথে মিশানো ছিল। দেখে তিনি বিস্মিত হলেন যে, একে আল্লাহ কীভাবে নবজীবন দান করবেন! আল্লাহ তাঁকে একশো বছরের জন্য মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে জীবিত করে দেখিয়ে দিলেন, তুমি নিজেই জীবিন হওনি, তোমার খাদ্যপানীয়বস্তুগুলোও যেমনটা তেমনই রয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁর মৃত গাধাটাকেও নবজীবন দান করলেন। এবার তিনি বলে উঠলেন, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[২]

এই ঘটনা বলে দিচ্ছে, কালের বিবর্তন, নানা বিপ্লব, ঘটনা-দুর্ঘটনা ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণে কোনো জাতি কিংবা দীনের নবজীবন থেকে নিরাশ না হওয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ জমিনকে মৃত্যুর পরই জীবন দান করেন।

---

১. *সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৮২*
২. *সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৯*

তুরস্কের এই গৌরবময় অতীতের ধারক জাতি এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ পূর্বসূরীদের স্থলাভিষিক্ত সম্প্রদায়, শানদার ইতিহাসের ধারক জাতিকে ইসলামের দৌলত ও ঈমানের নতুন বাহার ও ইসলামের খেদমতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলো এবং বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে আমরা এই পাঠই শিখতে পারছি এবং মনে প্রশান্তি লাভ করছি।

তারপর বলেছি, এর জন্য ইসলামি শরীয়ার শিক্ষা ও প্রকৃতির আইন অনুসারে নিজেরাও চেষ্টা চালাতে হবে। আপনারা ঘরে-ঘরে সেই পরবেশ তৈরি করুন, নবীর সীরাত ও সাহাবাদের আদর্শের পাশাপাশি তুর্কি বিজেতা, মুজাহিদীন, ও ঈমানি আত্মমর্যাদার ঘটনাগুলো বাচ্চাদের শোনান এবং তাদের দীন শিক্ষা দিন। তারপর স্বাধীন দীনি প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসার জাল সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। এ ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানে আমরা নতুন প্রজন্মের দীনি ও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যেসব প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নিধন থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে যেসব প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সেগুলোও আলোচনায় এনেছি।

সেইসঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের খেলাফতে ওছমানিয়ার সহযোগিতা, নানা কুরবানি, জোরদার আন্দোলন এসবেরও আলোচনা করেছি। তার দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলমানদের মাঝে সচেতনতা তৈরি, পশ্চিমা ক্ষমতা ও সভ্যতার প্রতি অনীহা সৃষ্টির শক্তিশালী যে-ঢেউ তৈরি হয়েছিল, সেসবের কথাও উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে আমি সেকালের বিখ্যাত দুটি চরণও আবৃতি করেছি :

بولیں اماں محمد علی کی

جان بیٹا خلافت پہ دے دو

মুহাম্মাদ আলীর মা বললেন, জীবনটা খেলাফতের জন্য দিয়ে দাও বেটা!

زوال دولت عثمان زوال ملک وملت ہے

عزیزو! فکر فرزند وعیال وخانماں کب تک؟

ওছমানি সাম্রাজ্যের পতন মূলত দেশ ও জাতিরই পতন। বৎসরা! পরিবার-পরজনের ভাবনা আর কত কাল ভাববে?

এই আলোচনায়ও তুর্কি শ্রোতাদের ওপর খুবই প্রভাব ফেলে এবং দীনি জযবার সাথেই আমার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

২৬ আগস্ট ছিল শুক্রবার। এই জুমার নামায সুলতান সুলায়মান কানুনি জামে মসজিদে পড়ি। ফাতেহ জামে মসজিদের মতো মুসল্লীতে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ ছিল, একদম প্রশান্ত ছিল এবং সকল মুসল্লীর মাঝে আদবের বহিঃপ্রকাশ ছিল। এটি সম্ভবত ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বড় মসজিদ।

পাঁচ দিন লন্ডনে

২৮ আগস্ট যোহরের সময় লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হলাম। স্নেহাস্পদ মৌলভী সাঈদুর রহমান নদবি, মৌলভী মুহাম্মাদ ওয়াজেহ নদবি ও মৌলভী জিয়াউল হাসান নদবি হেজাযের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ওখানে তারা ওমরা ও যেয়ারত সম্পন্ন করে সরাসরি ভারত ফিরে যাওয়ার কথা। লন্ডনের উদ্দেশে ইস্তাম্বুল থেকে যদিও যোহরের সময় রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু সফর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে হওয়ার কারণে যখন লন্ডন বিমানবন্দরে নামলাম, তখন হানাফি হিসাবমতে আসরেরও সময় হয়নি। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর খালীক আহমাদ সাহেব নেযামি, বন্ধুবর ডক্টর ফারহান আহমাদ নেযামি এবং স্নেহাস্পদ মাসরুর আহমাদ লাখনবি ও মৌলভী মুহাম্মাদ আকরাম নদবি বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমোক্তজনের সাথে সোজা অক্সফোর্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম, যার অবস্থান ছিল লন্ডন থেকে মাইলপঞ্চাশেক দূরে।

অক্সফোর্ডে ডক্টর ফারহান আহমাদ নেযামির বাড়িতে অবস্থান নিলাম, যেখানে তাঁর পিতা প্রফেসর খালীক আহমাদ সাহেব নেযামি আগে থেকেই অবস্থানরত ছিলেন। সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজের সভা ১ ও ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ফলে এখানে আমাকে তিন দিন থাকতে হলো। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর খালীক আহমাদ সাহেবের আসরগুলো ছিল মজাদার ও উপকারী ব্যস্ততা। দিনের বেশিরভাগ সময় আমার সেই আসরগুলোতেই কেটে যেত এবং খুবই তথ্যপূর্ণ ও উপকারী আলোচনা চলতে থাকত। প্রফেসর সাহেব আমার 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' ৫ম খণ্ড দ্বারা (যেটি হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব রহ.-এর আলোচনায় সমৃদ্ধ) খুবই প্রভাবিত। প্রতিটি আসরেই তার আলোচনা থাকত এবং এ-বিষয়টিকে তিনি নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল মনে করতেন।

এ-সময়ে আমি ও মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' সেন্টারের নানা কর্ম ও প্রকল্প দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং তাতে খুবই আনন্দিত হয়েছি। সেন্টারে ইসলামি বিশ্বের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র প্রস্তুতির কাজ চলছিল এবং সেইসঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের ওপর বৃহৎ কলেবরে ১২ খণ্ডে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থও প্রস্তুত হচ্ছিল। এই কাজটি ইসলামের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ইসলামি পাণ্ডুলিপিগুলোরও তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। একটি বিষয় দেখে আমি খুবই আনন্দিত হলাম যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই সাহেব (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর আটটি খণ্ড কম্পিউটারাইজ করে নেওয়া হয়েছে। আপনি যে-ব্যক্তিত্ব বা যে-গ্রন্থ কিংবা যে-স্থান সম্পর্কে জানতে চাইবেন, অল্প সময়ের মধ্যেই কম্পিউটার থেকে সেটি জেনে নিতে পারবেন। জানতে পেরেছি, এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদের পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

১ ও ২ সেপ্টেম্বর সেন্টারের অনেকগুলো বৈঠক ছিল, যেগুলোতে স্থানীয় সদস্যবৃন্দ এবং ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও ডক্টর আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রাবেতা আলমে ইসলামী এবং বর্তমানে ভাইস চেয়ারম্যান মজলিসে শূরা), শায়খ ইউসুফ আল-কারজাবি, ব্রুনাই সরকারের প্রতিনিধি ও সেন্টারের সদস্য হিসেবে ওখানকার শিক্ষামন্ত্রী শায়খ আবদুল আযীয উপস্থিত ছিলেন।

আমি প্রথমে আরবিতে হামদ ও ছানার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত জানালাম এবং তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম, আল্লাহ আমাদের জীবনে এতখানি দীর্ঘতা দান করেছেন যে, আবারও এই উপকারী মজলিসে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছি। তারপর সংক্ষেপে ইংরেজিতে আমার এই বৈঠকের সভাপতিত্বের দায়িত্ব ডক্টর আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ-এর দিকে স্থানান্তর করলাম। কারণ, সভার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে ইংরেজিতে আর একাজে তিনি বেশ দক্ষতার অধিকারী। আবার সভার সভাপতির দায়িত্ব পালনে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

উজবেকিস্তানে ইমাম বোখারির সমাধির সন্নিকটে একটি স্মৃতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও পরিকল্পনা দীর্ঘদিন যাবতই আলোচনাধীন রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভও বেশ

আগ্রহী। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাদীছশাস্ত্রের সাথে ভালো সম্পর্ক ও দক্ষতা রাখেন এমন বিখ্যাত আলেমদেরও আহ্বান জানানোর চিন্তা আছে। এর জন্য অক্টোবরের শেষ দশককে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উজবেক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের সাথে ইসলামিক সেন্টারের এ-ব্যাপারে একটি চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে।

২ সেপ্টেম্বর এই সভাটি সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হলো, যেটি র‍্যান্ডলফ হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সভাশেষে দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হলো এবং প্রায় সবকজন অতিথি সেখান থেকেই বিদায় নিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে স্নেহাস্পদ আতাউল্লাহ পাকিস্তানি গাড়ি নিয়ে এল এবং অক্সফোর্ড থেকে লন্ডনে মাসরুর সাহেবের বাড়িতে চলে গেলাম। পরদিন ছিল শুক্রবার। আমরা তারই নির্মিত শানদার 'নর্থ লন্ডন মসজিদে' জুমার নামায আদায় করলাম এবং মূল ঠিকানায় ফিরে এলাম। ওখানে কিছু সময় অবস্থান করে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ওখানে আমরা আসর নামায আদায় করলাম এবং সূর্যাস্তের আগে-আগেই নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ভাই মুহাম্মাদ উছমান সাহেব আগেই হুইল চেয়ার ও সামনের দিককার ফার্স্ট ক্লাস সিটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সাত ঘণ্টার সফর সত্ত্বেও আমরা ঈশার নামাযের পরপর নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে আমার ওস্তাদ মাস্টার সামী' সিদ্দীকি সাহেব মরহুমের তিন পুত্র ডক্টর আহমাদ মুতী' সিদ্দীকি, ফাসীহ আহমাদ সিদ্দীকি, ডক্টর রজি আহমাদ সিদ্দীকি, নদওয়তুল উলামার কোষাধ্যক্ষ জনাব হেদায়াত হুসাইন সাহেবের পুত্র সাজেদ হুসাইন সাহেব, মরহুম আমীন সালুনবি সাহেবের পুত্র ডক্টর এরফান আমীন এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রাতে ওছমান ভাইয়ের বাংলোয় আরাম করে ৪ সেপ্টেম্বর শিকাগোর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

শিকাগোতে

জনসংখ্যা, আয়তন ও দালান-কোঠার উচ্চতার দিক থেকে শিকাগো সম্ভবত আমেরিকার সর্ববৃহৎ কিংবা দ্বিতীয় পর্যায়ের শহর। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার। ১৯৯৭ সালে যখন এমএসএ-তে অংশগ্রহণ এবং চোখের চিকিৎসার সূত্রে আমেরিকা সফর করেছিলাম, যার দৈর্ঘ্য ছিল দুমাস, তখন তিনবার শিকাগো যাওয়া হয়েছিল। তৃতীয়বার সাইয়িদ আজমতুল্লাহ সাহেব কাদেরি হায়দরাবাদির (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

শিকাগো) বাড়িতে দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এবারও যখন আমি আমেরিকা যাব বলে জানতে পারলেন, বেশ কবার লাখনৌ টেলিফোন করলেন যে, এলে কিন্তু আমার বাড়িতেই থাকতে হবে। পরে বারবারই মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে' নদবিকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, মাওলানার অভিরুচি কী? তিনি কোন-কোন জিনিস বেশি পছন্দ করেন, বাছবিচার কী করেন ইত্যাদি। সেজন্য সিদ্ধান্ত নিলাম, শিকাগোতে যেকদিন থাকব, তারই বাড়িতে অবস্থান করব।

সকাল ৭/৮টার দিকে নিউইয়র্ক থেকে শিকাগোর উদ্দেশে কেনেডি বিমানবন্দর থেকে উড়াল ছিল। কিন্তু হঠাৎ জানতে পারলাম, আমাদের ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। অগত্যা নিউইয়র্কেরই আরেক বিমানবন্দর থেকে উড়াল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। শিকাগোর মেজবানগণ এবং সেই বন্ধুদের ব্যাপারটা জানানো দরকার ছিল, যারা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে শিকাগো বিমানবন্দরে আসবেন বলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, ফ্লাইট বদলে গেছে। কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে সেই সুযোগ আর মিলল না। বন্ধুবর ওছমান সাহেব বিমানে বসে বিমান উড়াল দেওয়ার পর সেখান থেকেই টেলিফোন করলেন। আমি প্রথমবারের মতো জানতে পারলাম, আমেরিকায় বিমানেও টেলিফোন করার ব্যবস্থা আছে। আমরা ৯/১০টা দিকে শিকাগো পৌঁছে গেলাম। নেমে ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেব, তাঁর ভাই হামেদ আবদুল হাই সাহেব ও সাইয়িদ আজমতুল্লাহ সাহেবকে ওখানে উপস্থিত পেলাম। দিনটা ছিল ৪ সেপ্টেম্বর এবং আন্তঃধর্মীয় কনফারেন্সের শেষ অধিবেশন। আমার তাতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। জানতে পারলাম, আমার যে-নিবন্ধটি ইংরেজিতে টাইপ করে পাঠানো হয়েছিল, সেটি ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছে, যার নাম ছিল 'মানবতার ওপর ইসলামের নবীর অবদান এবং তার বিশ্বজনীন দান ও বিপ্লব'। শিকাগো থেকে প্রকাশমান মুসলিম জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় তার প্রথম কিস্তিটিও প্রকাশিত হয়েছে।

কনফারেন্সে ভাষণ-বক্তৃতার আসনে বসতে না পারার কারণে বন্ধুবর ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেব ও তার সহকর্মীরা, যারা এই কনফারেন্সে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন পরামর্শ দিলেন, মাগরিবের পর শেষ অধিবেশনে, যেটি শেষ কথা ও প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত আমি তাতে অংশগ্রহণ করব এবং দু'আর সময় দু-চারটা দাওয়াতি কথা বলে দেব। তারা সভার পরিচালকদের সাথে কথা বলে একে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নিলেন।

কিন্তু এখানেও আমি খুব দ্বিধান্বিত ছিলাম যে, না জানি কী দেখতে হয়, কী শুনতে হয়। মাথায় আরও চিন্তা ছিল, দালাইলামা ও অপরাপর ধর্মনেতারা এর কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু বন্ধুরা বললেন, আপনার সফর এই কনফরেন্সে অংশগ্রহণের নামে হয়েছে এবং অনেকেই আশাবাদী আপনি আসবেন এবং অংশগ্রহণ করবেন। এখন যদি আপনি অংশগ্রহণ না করেন, তা হলে তা কী বলবে! আমি মনের ইচ্ছার বিপরীতে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলাম এবং আছরের পর আমার মেজবান ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কনফারেন্সস্থলে পৌঁছে গেলাম, যার অবস্থান ছিল বেশ দূরে। গিয়ে দেখলাম, আমার অবোধ্য এক ভাষায় 'যিক্‌রে জলী' হচ্ছে। যিকিরটা কার নামে হচ্ছে– আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদের নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। শ্রোতাদের মাঝে একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম, মাঠে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশি। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, সামনে আরও কী দেখতে বা শুনতে হয় কে বলবে! ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই মঞ্চে আমার আগমনের সংবাদ পৌঁছিয়েও দিয়েছিলেন এবং আমার দু'আ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের মঞ্জুরিও নিয়েছিলেন। কনফারেন্সের উচ্চ পর্যায়ের এক দায়িত্বশীল পাদরি বাইরে এসে আমাকে স্বাগতও জানিয়েছেন। কিন্তু মন আমাকে সায় দিল না। শ্রদ্ধেয় হামেদ আবদুল হাই সাহেব আমার প্রতিক্রিয়া ও মুখে চিন্তার ছাপ দেখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং মঞ্চে গিয়ে ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবকে সংবাদটা জানাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। ওখানে ট্যাক্সি পাওয়াও দুষ্কর ছিল। কিন্তু আল্লাহ এমন একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলেন, যার চালক ছিল জর্ডানের এক মুসলমান। আমরা অবস্থানের জায়গায় ফিরে এলাম।

কিন্তু ডাক্তার আহমাদ আবদুল্লা হাই আমার এই কর্মনীতিতে মনে কষ্ট পেলেন কিনা এবং অপমানিত বোধ করলেন কিনা সেই চিন্তায় সারাটা রাত দ্বিধার মধ্যে কাটালাম। সকালে মুহাম্মাদ রাবে' নদবিকে বললাম, তুমি টেলিফোনে কথা বলে আহমাদ আবদুল হাই-এর মনের অবস্থা আন্দাজ করো। দুজনে কথা হচ্ছিল। মধ্যখানে আমি রিসিভার হাতে নিয়ে নিলাম এবং ক্ষমা চাওয়ার ধারায় কথা বললাম। তিনি বললেন, মাওলানা! অংশগ্রহণ না করে আপনি ভালোই করেছেন। অন্যথায় আমাকে খুবই লজ্জিত হতে হতো। ওখানে নাচও হয়েছে। শুনে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

শিকাগোর তিনরোজা অবস্থানে আগত বন্ধু-বান্ধবদের থেকে এবং অন্যান্য লক্ষণাদি ও অনুমানের ভিত্তিতে জানতে পারলাম, এই আন্তর্জাতিক ধর্মীয় কনফারেন্সটি ছিল মূলত একটা সঙ্গীতানুষ্ঠান, যেন এখানে আপন-আপন ধর্মের শানে গজল পাঠ করা হয়েছে। না ধর্মের পক্ষে কোনো অনুসন্ধানের জযবা ছিল, না বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা বস্তুবাদ, প্রবৃত্তিপূজা ও ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলোর মোকাবেলার কোনো প্রত্যয় ছিল। তবে মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে কারা বক্তৃতা করেছেন, কী বলেছেন এবং তার কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সেসব জানতে পারিনি। শেষমেশ নিশ্চিত হতে পারলাম, অংশগ্রহণ না করে আমার ফিরে আসা-ই সঠিক হয়েছে।

৫ সেপ্টেম্বর ম্যালকম এক্স কলেজ হলে 'স্টেট অফ উম্মাহ কনফারেন্স' শিরোনামে মুসলমানদের একটি কনফারেন্স ছিল। আমি সকাল ১০টায় তাতে অংশগ্রহণ করলাম এবং প্রবন্ধ পাঠ করলাম, যার বিষয়বস্তু ছিল পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা এবং তার থেকে হতাশা ও অভিযোগ। মূলত এটিই ছিল আমার শিকাগো; বরং আমেরিকা সফরের সারাংশ।

সেদিনই সন্ধ্যায় মাগরিবের আগে সেই হলে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। হলটা প্রায় ভরে গিয়েছিল। আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। মাওলানা আবদুল্লাহ সালীম সাহেব পরিচিতিপর্বের দায়িত্ব পালন করলেন। সভার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল ডাক্তার আহমাদ আবদুল হাই সাহেবের হাতে। শ্রোতারা বেশিরভাগই ছিল ভারতীয় ও পাকিস্তানি। আমি উরদুতে নিবন্ধ পাঠ করলাম, যার শিরোনাম ছিল 'পাশ্চাত্যে অবস্থানরত মুসলিম যুবকদের নামে একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা'। এই প্রবন্ধে আমি বলেছি তারা ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করে কী স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে, অপরকে কী স্বার্থ দিতে পারে, কীভাবে ওখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং ওখানকার অধিবাসীদের মাঝে (নিজের কথা, কাজ ও জীবনরীতি দ্বারা) সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি, ফাঁকফোকর, অসমতলতা ও বিপদাপদের অনুভূতি জাগাতে পারে, যেগুলো পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজে পাওয়া যায় এবং বাইরে অবস্থান করে যেগুলো চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। সবাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমার নিবন্ধটি শ্রবণ করেন।

৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় আমি তাবলীগি মারকাযে গেলাম, যেখানে একটি হেফযখানাও আছে।। আমি ওখানকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে ভাষণ দিলাম।

শিকাগোর এই অবস্থানে আমার বেশ কজন পুরনো বন্ধু ও আলেমের সাথে দেখা হলো, যারা কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তাদের মধ্যে ডক্টর সাইয়িদ সালমান নদবি (আল্লামা সুলাইমান নদবির পুত্র), ডক্টর সাইয়িদ হাবীবুল হক নদবি, ডক্টর মুযযাম্মিল হুসাইন সিদ্দীকি নদবি (যিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে দাওয়াত ও শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন) এবং পাকিস্তানের দাঈ ও একটি ইসলামি আন্দোলনের খ্যাতনামা নেতা ডক্টর আসরার আহমাদ সাহেবের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় এক জায়গায় থাকার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এদের ছাড়াও ডাক্তার ইসমাঈল মার্চেন্ট সাহেব শিকাগোতে এসে পড়েছিলেন এবং ওখানকার পুরো অবস্থানের সময়টায় কাদেরি সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করে আমার আসরগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ইনি শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সাথীদের একজন ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত মদীনায় হাসপাতাল চালিয়েছেন। এখন বাফালুতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখেন।

নিউইয়র্কে

শিকাগো থেকে আবারও নিউইয়র্ক যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং সেখান থেকে পবিত্র হেজাযের উদ্দেশে বিমান ধরতে হবে। নিউইয়র্কে কাটিয়েছিলাম মাত্র একটা রাত। একাধিক বন্ধু-সুহৃদের ঐকান্তিক কামনা ও এবং বন্ধুবর মুহাম্মাদ ওছমান সাহেবের নিষ্ঠাপূর্ণ ও সহযোগিতামূল সাহচর্যের দাবি ছিল কিছু সময় তার বাড়িতে বেড়িয়ে যাই। ফলে ৬ সেপ্টেম্বর আছরের সময় নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হলাম। পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গেল। ওছমান সাহেবের বাড়িটার অবস্থান নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় অংশের খানিক দূরে লং আইল্যান্ডে। ওখানে রাতের খাবার খেলাম এবং আরাম করলাম। ৭ তারিখে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাস্টার মুহাম্মাদ সামী' সিদ্দীকির (প্রাক্তন ইংরেজি শিক্ষক নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ) পুত্র আহমাদ মুতী'র বাড়িতে তার অন্যান্য ভাই ও বন্ধুদের সাথে দুপুরের খানা খেলাম এবং বিশ্রাম নিলাম। মাগরিবের পর নিউইয়র্কের মক্কী মসজিদ নামক একটি মসজিদে এক সভার আয়োজন ছিল। সেখানে আমি ভাষণ দিলাম। সেই ভাষণে আমি আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের প্রথমে বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, সভ্যতা ও সামাজিকতর দিক থেকে দৃঢ়তার অধিকারী মুসলমান হিসেবে থাকতে এবং

পরে স্বতন্ত্র ইসলামি জীবন যাপনের পরামর্শ দিয়েছি, যা এখানকার অধিবাসীদের ইসলাম অধ্যয়ন, তার মূল্যায়ন ও স্বতন্ত্র গুণাবলি স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এখানে ইসলামের প্রসার-প্রসারে সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে।

ভাষণের পর সাজেদ হুসাইনের বাড়িতেই রাতের খাবার খেলাম। এখানে আমার গ্রন্থাবলির বড়সড় একটি সংগ্রহও দেখতে পেলাম, যেগুলো তিনি ও তাঁর বন্ধুরা পাঠ করছেন।

৮ তারিখ দিনটাও নিউইয়র্কেই অবস্থান করলাম। সন্ধ্যায় জিদ্দার উদ্দেশে রওনা হলাম। জানতে পারলাম, এখান থেকে কোনো বিমান সরাসরি জিদ্দা যায় না। জেনেভায় বিমান পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে ৪ ঘণ্টা সময় এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হবে। স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে'র মনে পড়ে গেল, জেনেভায় ডক্টর সাঈদ রমজান থাকেন, যিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তিনি মিশরের আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এর প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসানুল বান্নার জামাতা এবং তাঁর ও তাঁর সংগঠনের বড়মাপের একজন মুখপাত্র। অনেক দিন হলো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নেই। সেই তাঁকে সংবাদ জানানো যুক্তিসঙ্গতই মনে হলো। শুনলে তিনি খুশিই হবেন আর দেখা পেলে আমি আনন্দ পাব। অবশেষে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো।

আমি জেনেভা এয়ারপোর্টে পৌঁছতে-পৌঁছতে তিনিও এসে পৌঁছে গেলেন। সাথে করে দুই পুত্রকে নিয়ে এলেন। তিনি পরম আগ্রহ ও জযবার সাথে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পরিস্ফুট। আমার পাশে যতক্ষণ বসা ছিলেন, পরম আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা প্রকাশ ঘটাতে থাকেন। আক্ষেপের বিষয় হলো, তাঁর মিশর যাওয়া কিছুদিন যাবত আইনত নিষিদ্ধ। সৌদি আরবের সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ, যেকজন লোকের উদ্যোগে রাবেতা আলমে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তিনি তাঁদের একজন এবং রাবেতার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে তার কর্মব্যস্ততার বিবরণ জানা সম্ভব হয়নি। আল-মারকাযুল ইসলামী সম্পর্কেও কোনো আলোচনার সুযোগ হয়নি।

পবিত্র হেজাযে

ইউরোপ-আমেরিকার সফরে ওখানকার শীত এবং নিজের স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখান থেকে এহরাম বাঁধব না। আগে মদীনা তাইয়িবার হাজিরি হোক; পরে ওখান থেকে এহরাম বাঁধা যাবে এবং ওমরার নিয়ত করা যাবে। বিমান দুপুরের সময় রওনা হলো এবং সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় জিদ্দা গিয়ে পৌঁছল। একটা দৃশ্য দেখে আমার আফসোস লাগল যে, পুরোটা বিমান ইউরোপিয়ান যাত্রী, হেজাযে কর্মরত অমুসলিম কিংবা সেই লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ, যাদের ব্যাপারে ধারণা নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, ওরা কোন ধর্মের লোক। মহিলাও ছিল অনেক এবং বেপরদা। বোধহয় এহরাম অবস্থায় এবং ওমরার জন্য ভ্রমণকারী গোটা দুই-তিনেক চোখে পড়ল, যারা খুবসম্ভব মিশরি ছিল। জিদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছার পর পাসপোর্ট-ভিসা চেক করার এবং নিয়মের কাজগুলো সম্পন্ন হতে অনেক সময় লেগে গেল। কিন্তু অফিসের কেউ-কেউ ওছমান ভাইকে চিনে ফেলল। সংশ্লিষ্ট এক অফিসারের সঙ্গে বোধহয় আমারও পরিচয় দিলেন। ফলে আমাদের কাজগুলো খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়ে গেল এবং আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলাম। বেরিয়ে আসার পর আমার পুরনো ও স্থায়ী মেজবান আলহাজ মুহাম্মাদ নূর আবদুল গনী নূর অলী সাহেবে, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ অলী আবদুল্লাহ নূর অলী ও তাঁদের ছেলেরা আমাদের স্বাগত জানালেন এবং কালবিলম্ব না করে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ওখানে আমরা মাগরিব ও ঈশার নামায আদায় করলাম এবং খানা খেয়ে বিশ্রাম নিলাম।

আলহাজ মুহাম্মাদ নূর সাহেব আমাদের পৌঁছার আগেই আমাদের অজান্তে আমাদের তিনজনের জন্য (আমি, মুহাম্মাদ রাবে' ও সাইয়িদ হাসান আসকারি তারেক) সকালের ফ্লাইটে মদীনার টিকিট নিয়ে রেখেছেন। পরদিন ছিল শুক্রবার। আমরা সকালে গোসল করে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। বিমান ১০টার দিকে মদীনা পৌঁছে গেল। আমরা প্রশান্ত মনে মসজিদের সম্প্রসারিত এক অংশে জুমার নামায আদায় করলাম। মুহাম্মাদ নূর অলী সাহেব তাঁর পুত্র আবদুল হামীদ নূর অলীর মাধ্যমে একটা ভবনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ভবনটার অবস্থান মসজিদের নববির সন্নিকটে একটা

বাজারে। দুটা এয়ারকন্ডিশন্ড কক্ষ ও দুটা বাথরুম ছিল। ভবনে লিফটের ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার ব্যবস্থা যথারীতি সাইয়িদ হাসান আসকারি তারেক সাহেবের বাড়িতে ছিল, যিনি মদীনায় টেলিফোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং হযরত শায়খুল হাদীছের মৃত্যুর পর মদীনাতে তিনিই আমাদের আতিথেয়তা করে আসছেন।

আমি এক তো গেঁটে বাতের রোগী। তাছাড়া বেশি পথ হাঁটার শক্তিও আমার নেই। মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানে এটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তার একটি সমাধান বের করে দিলেন। বন্ধুবর আবদুর রশীদ সাহেব হায়দরাবাদি – যিনি মসজিদের সম্প্রসারণ ও নির্মাণের কাজে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত – গাড়ি বাবুস সালামের দরজা পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিলেন। তিনি কিংবা অন্য কোনো চালক গাড়িটা সে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতেন, যেখানে জুতা খোলা হয়। সাধারণত নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে প্রত্যহ মাগরিব ও ঈশার নামায মসজিদেই পড়তাম এবং সালাত ও সালাম পেশ করতাম। কোনো-কোনো দিন যোহরের নামাযেও যাওয়া হতো।

মদীনা তাইয়িবার হাজিরির সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, থাকার জায়গা থেকে বের হয়ে মসজিদে নববি ও মুওয়াজা শরীফ ব্যতীত আর কোথাও যাব না। উদ্দেশ্য ছিল, আমার এই মদীনা অবস্থানের খবর জানাজানি হতে দেব না। ছিলও গোপনই। এই সফরে কোনো মিটিং কিংবা অন্য কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের কর্মসূচি ছিল না। সফরটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। কোনো আসরে অংশগ্রহণ না করার এবং পত্রিকায় সংবাদ না বেরুনোর কারণে কেউ জানতেও পারেনি। কিন্তু তারপরও কয়েক ব্যক্তির কাছ থেকে গোপন থাকতে পারিনি। তাদের একজন হলেন মদীনার প্রভাবশালী নাগরিক শায়খ সালেহ আল-হুসায়্যান, যিনি রাবেতার সদস্যও বটে। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক পুরনো। আমার গ্রন্থাদির বিশেষ মূল্যায়নকারী ও প্রচারক। স্নেহাস্পদ মৌলভী আলী আহমাদ নদবির কাছে – যে কিনা একই বিমানে রিয়াদ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল – আমার আগমনের সন্ধান পেয়ে যান এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে বিদায়ের সময় এসে হাজির হন। আরেকজন হলেন জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তাইয়িবার ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর আবদুল্লাহ যায়েদ,

আমার সঙ্গে যার প্রগাঢ় সম্পর্ক। কয়েকবারই তিনি আমার জন্য লেকচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। মসজিদে নববিতে তিনি আমাকে দেখে ফেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং অনেকক্ষণ যাবত বসে থাকেন। আরেকজনের নামটা আমি ভুলে গেছি। হাদীছবিশেষজ্ঞ ছিলেন। কোনোভাবে সন্ধান পেয়ে এলেন এবং আমার কাছ থেকে হাদীছের সনদ নিলেন। এদের ছাড়াও জামেয়া ইসলামিয়ার শিক্ষক আবদুর রহীম মাদ্রাজি ও স্নেহাস্পদ মৌলভী আজমল ইসলাহি নদবি প্রতিদিন আছরের পর আসতেন এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন।

১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার বিদায়ি সালাম জানিয়ে এহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশে রওনা হলাম। বন্ধুবর মুহাম্মাদ ওছমান সাহেব বেশ চমৎকার একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সুহৃদ হাসান আসকারি তারেকও আমাদের সঙ্গ নিলেন। মক্কায় থাকতে হলে আজ বেশ ক-বছর যাবত মানসুর রোডে অবস্থিত ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির বাড়িতেই থাকা হচ্ছে। আজও ওখানে গিয়েই নামলাম। সেদিনই দুপুরের আগে ওমরা করলাম। শারীরিক দুর্বলতা ও খানিক অক্ষমতা সত্ত্বেও পায়ের ওপর ভর করেই তাওয়াফ করার হিম্মত করলাম। তবে সাঈ করলাম হুইল চেয়ার গাড়িতে করে, যেমনটা আজ কয়েক বছর যাবতই করে আসছি।

ওমরা থেকে অবসর হয়ে প্রথমে মাদরাসা সাওলাতিয়ায় গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে বন্ধুবর মরহুম মাওলানা শামীম সাহেবের ছেলেদের শোক জানানোর দায়িত্ব পালন করলাম। কিছু সময় বসে পরে অবস্থানের জায়গায় ফিরে এলাম।

শোক জানানোর আরও একটি কর্তব্য রয়ে গিয়েছিল। ইনি হলেন আমার পুরনো বন্ধু, আফগানিস্তান, ইরান ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে আমার সফরসঙ্গী (১৯৭৩) ও সহযোগী শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ জামাল। ইনি সৌদি আরবের মজলিসে শূরার একজন সদস্য, বাদশাহ আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটি জিদ্দার ইসলামি সংস্কৃতির শিক্ষক, সৌদি আরবে ইসলামি বিষয়ের ওপর একজন নামকরা লেখক এবং বহিঃরাষ্ট্রে শিক্ষাগত সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ ও দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। কিন্তু ব্যস্ততা, শারীরিক দুর্বলতা ও রোগব্যাধির কারণে এই কাজটি করা সম্ভব হলো না, যার জন্য আমার মনে আক্ষেপ রয়ে গেছে।

পবিত্র মক্কায় আরও দুটি জায়গায় যাওয়া হয়েছে। সমকালের একজন বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও লেখক আছেন শায়খ আলী তানতাবি। মক্কা নগরীর সুদূরে আল-আযীয নামক এক পল্লিতে বাস করতেন। শারীরিক অক্ষমতার কারণে সব সময় বাড়িতেই অবস্থান করতেন– চলাফেরা করতে পারতেন না। আমি তাঁকে বর্তমান কালের শীর্ষস্থানীয় আরবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট লেখক মনে করি। তিনি আমার কয়েকটি গ্রন্থে ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। তিনি আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে গেছেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম। দুজন নিরতিশয় আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে মিলিত হলাম এবং দীর্ঘ সময় বসে কথাবার্তা বললাম।

বন্ধুবর ডক্টর ইবাদুর রহমান নাশাত (জামেয়া উম্মুল কুরার ইংরেজির প্রফেসর) সাহেবের বাসায় রাতের খানা খাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। পরে রাতে থাকারও কথা ছিল সেখানেই। কিন্তু বিশেষ কিছু প্রয়োজনে ওখান থেকে চলে আসতে হলো এবং নিজের অবস্থানের জায়গায়ই রাত কাটানো সিদ্ধান্ত হলো। তিনি পরম যত্ন, নিষ্ঠা ও মহব্বতের সাথে দাওয়াত করলেন। এমনিতেও আমার এখানে তাঁর আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। তাঁর দীনি চিন্তা ও দাওয়াতি জযবা দ্বারা ইউনিভার্সিটি অনেক উপকৃত হচ্ছিল এবং সঠিক নির্দেশনা পাচ্ছিল।

পবিত্র মক্কায় আমার আগমনের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার পায়নি। কিন্তু তারপরও দুজন লোক জেনে ফেলেছেন। তাঁদের একজন হলেন রাবেতা আলমে ইসলামীর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শায়খ নাসের আল-উবুদী। অপরজন রাবেতার সাংবাদিকতা বিভাগের ইনচার্জ শায়খ মুহাম্মাদ আল-হাফেয নদবি। এরা দুজন আমার অবস্থানের জায়গা মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছু সময় কথাবার্তা বলেন। মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির নিয়ম ছিল, আমি যখন মক্কায় অবস্থান করতাম, তখন আমার পুরনো বন্ধুবান্ধব, সুহৃদ, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানাতেন, যার ফলে কিছু সময়ের জন্য হলেও চমৎকার একটা আসর জমে উঠত এবং রাতের আহারের ব্যবস্থা হতো। এবার তিনি ভারতে থাকার কারণে এই অনুষ্ঠানটি হতে পারেনি এবং অনেকেরই সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বাকি রয়ে গেল।

মক্কায় অবস্থানকালে স্নেহাস্পদ আবদুল লতীফ জৌনপুরির মেহনত ও খেদমতের কথা আমি ভুলতে পারব না, যিনি আমাকে হারাম শরীফের লনে নিয়ে যাওয়া এবং মক্কায় চলাফেরার জন্য নিজের গাড়ি ও সময়কে আমার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন এবং সর্বক্ষণ আমার খোঁজখবর নিতেন।

বাকি থাকল মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির ছেলেদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কথা, যারা কেউ মক্কায়, কেউবা জিদ্দা ও তায়েফে অবস্থান করছে। আমার প্রতি ওরা যে-আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছে, কৃতজ্ঞতা আদায়ের কথা বলে আমি তার মর্যাদাকে খাট করতে চাই না। তার মূল্যায়ন ও প্রতিদান একমাত্র আল্লাহরই পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

১৭ সেপ্টেম্বর বিদায়ি তাওয়াফ করি। একান্ত অপারগতাহেতু এই তাওয়াফ হুইল চেয়ারে বসে করতে হলো।

এবার দেশে ফেরার পালা। জিদ্দা থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছিলে স্নেহাস্পদ জিয়া আবদুল্লাহ। আমরা তারই সঙ্গে জিদ্দার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ওখানে এক রাত থাকলাম। ওখান থেকে সাইয়িদ মিসবাহুন্নবী হাসানির বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং তার সন্তানদের দেখলাম। ফেরার সময় আলহাজ নূর মুহাম্মাদ নূর সাহেবের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে ও বিদায় জানাতে আসা লোকদের বিরাজ ভিড় লেগে গেল। নূর সাহেবের ফরমায়েশে কিছু বক্তৃতাও করলাম, যেখানে পবিত্র হেজাযে অবস্থানকালীন দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তার আদব, দাবি ও উপকারিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

১৮ সেপ্টেম্বর সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হলাম। মাগরিবের সময় দিল্লি এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। ডক্টর মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবি, নিয়ায আহমাদ ও অপরাপর অনেক ভক্ত-সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে নিয়ে উখলায় অবস্থিত ডক্টর মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবির বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কাটিয়ে এবং ওখানে আপনজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে সেদিনই রাতে লাখনৌ মেইলে লাখনৌ ফিরে এলাম।

আমার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একটি নির্ভুল ব্যাখ্যান

জীবনের দীর্ঘতম সফরের (যেটি ছিল তিনটি মহাদেশব্যাপৃত) সংক্ষিপ্ত বিবরণি শোনালাম এবং তার শুভ সমাপ্তির (হারামাইন শরীফাইনের যেয়ারতের) আলোচনাও উপস্থাপন করলাম। এবার এক বন্ধুর একটি পত্রের বিষয়বস্তু পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যেখানে আমার চিন্তা, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সঠিক ব্যাখ্যান ও চমৎকার একটি সারমর্ম উঠে এসেছে। এটি হলো বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থানরত আমার সুহৃদ সুহাইল আহমাদ সাহেবের একটি পত্র, যেখানে তিনি শিকাগোতে বন্ধুদের একটি আসরের এক আলোচনার বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটি পাঠকদের সম্মুখে আসবার আসবার মতো বিষয়। কারণ, সেখানে আমার চিন্তা ও অধ্যয়নের চমৎকার একটি সারমর্ম ও ব্যাখ্যান এসে পড়েছে। তিনি লিখেছেন :

> '২৫ রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরির সন্ধ্যার চায়ের পর মাওলানা আলী মিয়ার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর খলীফ ডক্টর মুহাম্মাদ ইসমাঈল মাইমান, সাউথ আফ্রিকা থেকে আগত মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি (রহ.)-এর ডক্টর সালমান নদবি এবং ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আগত ডক্টর মুয্যাম্মিল সিদ্দীকি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মজলিসে মুসলমানদের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মাওলানা বলেছেন, আজ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নিজেদের যতসব ধর্মীয় দূরত্ব ও বিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক জায়গায় সমবেত। খ্রিস্টানদের উপকরণ আর ইহুদিদের মাথা কীভাবে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে ইসলামি বোধবিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বের করে ফেলা যায় সেই চেষ্টায় রত। কাজেই এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন থেকে প্রতিজন মুসলমানকে আত্মসমালোচনা করা উচিত যে, আমি আমার অজান্তে ইহুদি-খ্রিস্টানদের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাচ্ছি না তো আবার।

ইসলামি বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও চালু হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা বলেছেন, এর দুটি পন্থা হতে পারে। দীন-ঈমানওয়ালাদের সিংহাসনের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে কিংবা দীন-ঈমানওয়ালাদের সিংহাসনওয়ালাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম পন্থায় একটা সমস্যা আছে, সিংহাসনওয়ালারা সিংহাসন ছাড়ার পরিবর্তে সিংহাসন ভেঙে ফেলাকে প্রাধান্য দেবে এবং ফলাফল ভালোর পরিবর্তে মন্দ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পন্থাটি সময়সাপেক্ষ অবশ্যই; তবে টেকসই। আর সম্ভবত এটি ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানির সংস্কার আন্দোলন থেকেও এই কর্মরীতিরই দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায় যে, চেয়ার চেয়ারওওয়ালাদেরই কাছে থাকুক। দীনদাররা তো তাদের সংশোধন চায়– চেয়ার চায় না।

মাওলানা বললেন, প্রতিটি যুগেরই বড় একটি চ্যালেঞ্জ থাকে। আমাদের বুযুর্গানে দীন অত্যন্ত সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সেইসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন। বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, মুসলিম জাতির তরুণ শিক্ষিত শ্রেণিটির মনে ইসলামকে একটি জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের তরুণ শিক্ষিতসমাজের ঈমান আজ টলটলায়মান। আর তারই ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ শ্রেণিটি ইসলামকে চৌদ্দশো বছরের পুরনো একটি ধর্ম জ্ঞান করে তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কোনো গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নয়। কোথাও-কোথাও তো এরা সরাসরি ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের যে-কাজটি করতে হবে, সেটি হলো, এই শ্রেণিটির কাছে যেতে হবে এবং বিদ্যাগত মানদণ্ড

অনুপাতে তার মাঝে ইসলামকে একটি জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানরূপে বহাল করতে হবে।

মাওলানা বলেছেন, এই লক্ষ্য অর্জনে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাসিলেবাস ও শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং তাতে ইসলামি শিক্ষা, বোধবিশ্বাস ও দীনি প্রশিক্ষণ এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যেন তারা আধুনিক বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ও সৈনিকে পরিণত হয়। কোনো ইসলামি আন্দোলন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ কোনো কর্মী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রতি এ যাবত কোনো গুরুত্ব দিতে সক্ষম হয়নি। কাজটি করতে পারলে তার ফলে এমন শিক্ষিত মুসলমান তৈরি হবে, যারা একদিকে যেমন দীনি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মর্যাদাবোধ দ্বারা সুসজ্জিত হবে, তেমনি তারা ইসলামকে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণরূপে চালু করতে সচেষ্ট হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের পর এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মাওলানা বলেছেন, পাশ্চাত্য আজ তার বিপুল জাগতিক উন্নতির চিত্র মানুষের সামনে পেশ করছে। কিন্তু এই পশ্চিমা সভ্যতা মানবতার নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিকভাবে যে-পরিমাণ ক্ষতি করেছে, তা তার পরিপূর্ণ ব্যর্থতার প্রমাণ। এ যুগের মুসলমান যুবসমাজের বিশেষ করে একটি দায়িত্ব হলো, তারা নিজেদের পুরো জীবনকে ইসলামের ধাঁচে গড়ে তুলবে এবং নিজেদের আত্মিক ও চারিত্রিকভাবে এমনভাবে গড়ে তুলবে, তাদের জীবনধারা, কর্ম ও চরিত্র দেখে মানুষ প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাদের জীবনধারাটাই ইসলামের আপাদমস্তক একটি দাওয়াতে পরিণত হবে। মাওলানা বলেছেন. শুধু নিজের জীবনটাকে আল্লাহওয়ালা জীবন বানালেই একজন মুসলমানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নিজের জীবন

দ্বারা ইসলামকে অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাদের পালন করতে হবে। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের জীবন ও দাওয়াতে দীন এর জীবন্ত প্রমাণ। আল্লাহপাক আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।'

রাজস্থানের জেপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলন

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ আমি পবিত্র হেজায থেকে লাখনৌ ফিরে এলাম। এই দীর্ঘ সফরের আগেই অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের (যার সভাপতিত্বের দায়িত্ব আমার কাঁধে ন্যস্ত) মজলিসে আমেলা (কার্যকরি পরিষদ) সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল, জেপুরে বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ৯ ও ১০ অক্টোবর ১৯৯৩। বোর্ডের এই সম্মেলন রাজস্থানে এ-ই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত যাচ্ছিল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, সম্মেলনটি মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরই প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া হেদায়াত'-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আমার ফিরে আসার পর সময় আর বেশি বাকি ছিল না। বাইরে বেশি দিন কাটাতে গেলে এতদিনে নানা ব্যস্ততা, নানা দায়িত্ব-কর্তব্য ও ডাকের বিরাট একটি স্তূপ জমে যায়। সভাপতির ভাষণটি দ্রুত লিখে ফেলা এবং ছাপিয়ে ফেলা জরুরি ছিল। আল্লাহরই সাহায্য বলতে হবে, শারীরিক ক্লান্তি ও কাজের ভিড়ের মধ্যে লেখাটা তৈরি হয়ে গেল এবং ছাপার জন্য প্রেসেও চলে গেল। সে-সময় অবধি কারওয়ানে যিন্দেগির কোনো খণ্ডে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কোনো আন্দোলন বা ইসলামি পারিবারিক আইনের কোনো সম্মেলনের সভাপতির কোনো ভাষণ উপস্থাপিত হয়নি। অথচ, এটি ইতিহাসের একটি আমানত, বিরাট একটি শঙ্কা ও চ্যালেঞ্জের চিত্রাঙ্কন এবং তার মোকাবেলা ও ইসলামি শরীয়ার সুরক্ষার চেষ্টা-প্রয়াসের সংরক্ষণযোগ্য ইতিহাস। সেজন্য এই সম্মেলনের সভাপতির ভাষণটি এখানে হুবহু তুলে ধরা সঙ্গত মনে করি। আগে ভাষণটি উপস্থাপন করি। পরে সম্মেলনের বিবরণ তুলে ধরব।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَدَعٰى بِدَعْوَتِهِمْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

সুধীমণ্ডলী!

আপনারা যারা ভারতে মুসলিম উম্মাহ এবং ইসলামি শরীয়তের বিভিন্ন অঙ্গনে ও বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আল্লাহপ্রদত্ত তাওফীক অনুসারে দীন ও দীনি শিক্ষার প্রসারে কাজ করছেন, তাদের স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের এই সম্মেলন যথাসময়ে একটি ঐতিহাসিক, দীনি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জেপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই ঐতিহাসিক শহরটির অদূরেই সেই নগরীটির (টুঙ্ক) অবস্থান, যেখানে ত্রয়োদশ হিজরির মাঝামাঝিতে বালাকোটের শাহাদাতগাহ থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ সেই কাফেলাটি এসে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, যাদের জন্য মহান আল্লাহ শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহর পরিবর্তে ইসলামের পক্ষাবলম্বন ও শরীয়তের প্রচার-প্রসারের জন্য সৌভাগ্য নসিব করেছিলেন।

আমি যাঁদের কথা বলতে চাচ্ছি, তাঁরা হলেন ত্রয়োদশ হিজরির মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদে আজম হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলি (রহ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের সেই লোকগুলো, যারা তাঁর মিশনের সহযাত্রী ছিলেন। এবং সেইগুলোও আমার উদ্দেশ্য, যাঁরা তাঁর হিজরত ও জিহাদের সফরের সেইসব দুঃসাহসী, শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যাদের জন্য মহান আল্লাহ শারীরিক শাহাদাতের পরিবর্তে ঈমানি, ভাষাগত,

শরয়ী ও দীনি জীবনের বাস্তব নমুনা দেখানোর সৌভাগ্য ও সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যেটি মূলত নিম্নলিখিত আয়াতেরই ব্যাখ্যা :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

'মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ-কেউ শাহাদাত বরণ করেছে আবার কেউ-কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো প্রকার পবিবর্তন আনেনি।'[১]

এই কাফেলাটি সাইয়িদ সাহেবের এক পরম নিষ্ঠাবান ও অন্তরঙ্গ মুরিদ টুঙ্ক-এর ঈমানদার বাসিন্দা রাজ্যপতি নবাব উজিরুদ্দৌলাহর (মৃত্যু : ১২৮১ হিজরি মোতাবেক ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) শুধু দাওয়াতেই নয়– পীড়াপীড়ি ও তোশামোদের ফলে টুঙ্ক স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তারা নগরীর যে-অংশটায় এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'কাফেলা'। আজও অঞ্চলটি এ নামেই পরিচিত। টুঙ্ক-এ অবস্থান গ্রহণকারী সেই মুহাজির ও মুজাহিদদের জন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা শুধু আকায়িদ, ফারায়িজ ও ইবাদাতেই নয়– স্বভাব, চরিত্র, লেনদেন, বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠানগুলোতেও শরীয়ত এবং সুন্নতের অনুসরণ করে চলতেন। অমুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশা, ওঠাবসা, দীন ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে ভারতের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে যেসব কুপ্রথার প্রচলন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো শরীয়তের স্থান দখল করে নিয়েছিল, সেসব থেকে তাঁরা পুরোপুরি নিরাপদ ছিলেন, এগুলোকে তাঁরা ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পূর্বসূরী হকপন্থী আলেমদের অনুগামী ছিল। এটি ছিল দুই শহীদ হযরত

১. *সূরা আহযাব : আয়াত ২৩*

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর সাহচর্য ও প্রশিক্ষণের ফলাফল।

সর্বোপরি এ-রাজ্যটির এই মর্যাদাও অর্জিত ছিল যে, প্রথম দিন থেকে শুরু করে রাজ্যশাসনের বিলুপ্তির দিন পর্যন্ত এখানকার আদালতগুলো শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করত এবং এখানে ইসলামি আইন চালু ছিল, যার মুখপাত্র, ব্যাখ্যাকার ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণ।

স্থানগত এই নৈকট্য এবং এই প্রেক্ষাপট ছাড়াও এই সম্মেলন যথসময়ে যথাস্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার আরেকটি দলিল হলো, এটি এ-ই প্রথমবার এমন একটি ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার ইসলামের সেই বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক দাঈ ও রূহানি মুরুব্বীর সমাধি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত আছে, যাঁকে হিন্দুস্তানের ঈমানি ও রূহানি বিজেতার উপাধি দেওয়া যেতে পারে এবং যিনি হিন্দুস্তানের মাটি, অঞ্চল ও দেশকে ইসলামের করতলে নিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে তার অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন এবং তার বিশ্বাস, সমাজ, ও চরিত্রের ওপর সবচেয়ে বেশি গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন এবং ইসলামি বিজয়গুলোকে প্রকৃত অর্থেই ক্রিয়াশীল, গভীর ও অভঙ্গুর বানিয়েছিলেন। আমি যাঁর কথা বলতে চাচ্ছি, তিনি হলেন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরি (রহ.), যাঁর কবর এই রাজপুতানারই একটি শরহ আজমিরে অবস্থিত।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী!

এবার আমি মূল আলোচনায় আসতে চাই। সবার আগে বলব, ইসলাম আর অন্যান্য ধর্ম, সমাজ ও জীবনব্যবস্থাগুলোর মাঝে একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, ইসলামে দাম্পত্যজীবন, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন ও তার দায়দায়িত্ব, পরিবারের সদস্যবর্গের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য আসমানি ধর্ম ও আল্লাহর বিধানের একটি বিভাগ এবং দীনের একটি

অংশ, আসমানি নির্দেশনা, শরীয়তের আইন ও রাসূলের আদর্শ যার পথনির্দেশক ও নমুনা। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতাগুলোতে সেটি জীবনের একটি প্রয়োজন, একটি মানবীয়, বংশগত, সভ্যতাগত, কখনও ইচ্ছাকৃত, কখনও অনিচ্ছাকৃত এবং কখনও (আমাকে ক্ষমা করুন) বিনোদনগত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণটি হলো, তার আসমানি গ্রন্থে নারী ও স্ত্রীজাতিকে একটি অনুকম্পা, পুরুষদের জন্য প্রশান্তির উপকরণ, সম্প্রীতি ও মমতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

'তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই থেকে যুগল সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার আর তোমাদের মাঝে তিনি পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।'[১]

এর সঙ্গে আছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াত এবং তাঁর সীরাত ও নমুনা, যার দ্বারা আমরা দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন যাপনের দিকনির্দেশনা লাভ করি এবং জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা ও তার হক সম্পর্কে অবগত হই। এখানে আমি কয়েকটা হাদীছ উল্লেখ করছি।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

'তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো সেই লোক, যে তার পরিবারের লোকদের চোখে ভালো। আর আমি আমার পরিবারের লোকদের চোখে সবচেয়ে ভালো।'[২]

---

১. *সূরা আর রূম : আয়াত ২১*

২. *ইবনে মাজা*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত দ্বারা এর সত্যায়ন পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'নিজের পরিবারের লোকদের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক মমতাময় ও দয়ালু আমি আর কাউকে দেখিনি।'[১]

আমর ইবনুল আহওয়াস জুশামি বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি খুতবায় হামদ-ছানা ও যিকির-নসীহতের পর বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদের সাথে ভালো আচরণ করো। কারণ, তারা তোমরাদের জীবনে তোমাদের সহায়ক ও জীবনসঙ্গিনী। তোমাদের ওপর তাদের হক আছে। তাদের ভালো খাবার খাওয়াও, ভালো পোশাক পরাও।'[২]

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো। আর তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর চোখে সবচেয়ে ভালো।'

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়াটা হলো একটা পান্থশালা। এখানকার সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো নেক স্ত্রী।

দাম্পত্য সম্পর্কের এই গুরুত্ব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বিয়ের খুতবা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেখানে শুরুতেই তিনি সূরা নিসার প্রথম আয়াতটি পাঠ করেছেন, যেখানে মাবনবংশের সূচনার আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.) নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন। পরে আল্লাহ তাঁকে একজন জীবনসঙ্গিনী দান করলেন। এই দুজনের ঔরসে আল্লাহ মাবনবংশ সৃষ্টি করলেন এবং মানুষ দ্বারা এই পৃথিবীটাকে ভরে দিলেন।

---

১. *মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও সহীহ মুসলিম*
২. *তিরমিযি*

এই দুজন ব্যক্তির মাঝে আল্লাহ এমন প্রেমপ্রীতি এবং তাদের সম্পর্কে এমন বরকত দান করলেন যে, আজ পৃথিবী তার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। তো আল্লাহর জন্য এটি কোনো কঠিন কাজ নয় যে, আজকের দুজন নারী-পুরুষের দম্পতি দ্বারা একটি পরিবারকে আবাদ ও সুখময় করে দেবেন।

আয়াতে তারপর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবকে লজ্জা করো, যার নামে তোমরা একজন অপরজনের কাছে প্রার্থনা করে থাক। বাস্তবতাও এটিই যে, মানুষের গোটা জীবনটাই প্রার্থনার একটা বহিঃপ্রকাশ ও নমুনা। এটিই সভ্যতার সারকথা। এই বিবাহ জিনিসটা কী? এটিও একটি সুসভ্য ও বরকতময় প্রশ্ন। একটি ভদ্র পরিবার আরেকটি ভদ্র পরিবারের কাছে প্রার্থনা জানায়, আমার ছেলের জন্য একজন জীবনসঙ্গিনী দরকার। তার জীবন অসম্পূর্ণ। তুমি তাকে পরিপূর্ণ করে দাও। অপর পরিবার এই প্রার্থনা সাদরে বরণ করে নিল। তারপর দুজন মধ্যখানে আল্লাহর নাম নিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। যে-দুজন মানুষ এই গতকাল পর্যন্ত একজন অপরজনের বেগানা ছিল, তার পরস্পর এগানা হয়ে গেল।

যে-দুজন মানুষ একজন আরেকজন থেকে দূরে ছিল, তারা পরস্পর এত কাছাকাছি হয়ে গেল যে, এর চেয়ে আর ঘনিষ্ঠতা দুনিয়ার জীবনে আর হতে পারে না। একজনের ভাগ্য আরেকজনের সাথে জড়িয়ে গেল। একজনের জীবনের সুখ-আনন্দ অপরজনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। এসবই আল্লাহর নামের কারিশমা, যিনি হারামকে হালাল, না-জায়েযকে জায়েয, পাপকে পুণ্য বানিয়ে দিয়েছেন এবং জীবনগুলোতে বিরাট এক বিপ্লব সাধন করে দিয়েছেন। তো আল্লাহ বলছেন, এখন তোমরা এই নামের লাজ রক্ষা করে চলো। আমার নামকে মধ্যখানে এনে নিজেদের কাজ উদ্ধার করে নেওয়ার পর যদি পরে তা ভুলে যাও, তা হলে তা বড়ই স্বার্থপরতা ও নিমকহারামি হবে।

তারপর বলেন, তবে হাঁ, পুরনো আত্মীয়তার প্রতিও লক্ষ রেখো। নতুন এই আত্মীয়তার কারণে তোমাদের পুরনো আত্মীয়তাগুলো রহিত হয়ে যায়নি। কারও মনে যদি প্রশ্ন আসে, এতকথা, এতগুলো বিষয়ের কে তত্ত্বাবধান করবে? তা হলে উত্তর হলো :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'

তার বিপরীতে বিভিন্ন সনাতন ধর্ম এবং নতুন-পুরাতন সভ্যতাগুলোতে নারীকে কী মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে গভীর মনোযোগ ও সাহসিকতার সাথে ধর্ম ও সভ্যতাগুলো নিয়ে তুলনামূলক পড়াশোনা করতে হবে।

এ পর্যায়ে আমি ইসলামের পারিবারিক আইন ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে কয়েকজন অমুসলিম পণ্ডিত ও আইনবিদের স্বীকারোক্তি ও বিশ্লেষণ উপস্থাপনের অনুমতি চাচ্ছি। কতক মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও অদূরদর্শী মুসলিম লেখকের লেখনি ও ঘোষণাত্রের ফলে হিন্দি ও ইংরেজি প্রচারমাধ্যমগুলোতে ইসলামের পারিবারিক আইন ও তার দাম্পত্যবিধান এবং ইসলামে নারীর মর্যাদার বিষয়টি রীতিমতো অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ও হাসি-মশকরার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে আমি তিন-চারটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হব। একটি সাক্ষ্য হলো একজন পশ্চিমা পণ্ডিতের, যিনি ভারতবর্ষে একটি প্রশিক্ষণ ও সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি যার কথা বলছি, তিনি হলেন মিস্টার আন্নি বিসনত। তিনি বলেছেন :

'আমাদের মনে রাখা দরকার, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের আইনগুলো এই সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও ইংল্যান্ডে গ্রহণ করা হতো। এটি পৃথিবীর অন্যসব

আইনের তুলনায় সবচেয়ে সুবিচারমূলক আইন ছিল। সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও তালাকের ব্যাপারে এটি পাশ্চাত্য থেকে খানিক অগ্রসর ছিল এবং নারী-অধিকারের প্রহরী ছিল। এক স্বামী ও বহুবিবাহ শব্দগুলো মানুষকে বিমোহিত করে তুলেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যে নারীর এখন কোনো মর্যাদা নেই। মন ভরে উপভোগ করে নারীকে এখন মানুষ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে এবং পরে আর তাকে সাহায্য করার মতো কেউ থাকে না।'[১]

মিস্টার এন জে কলসন লিখেছেন :

'নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদার ব্যাপারে, বিশেষ করে বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে কুরআনের আইনগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আইন আছে, যেগুলোর সাধারণ লক্ষ্য নারীদের মর্যাদায় উন্নতি সাধন করা। এই আইন আরবের আইনের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। তালাকের বিধানে কুরআন সবচেয়ে বড় যে-পরিবর্তনটা সাধন করেছে, তা হলো, এর মাঝে ইদ্দতের অন্তর্ভুক্তি।'[২]

ধর্ম ও চরিত্রবিষয়ক বিশ্বকোষের নিবন্ধকার লিখেছেন :

ইসলামের নবী নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদাকে তার চেয়েও বেশি উন্নত করেছেন, যেটি তার প্রাচীন আরবে অর্জিত ছিল। বিশেষ করে নারী মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির পশু থাকল না। বরং খোদ ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গেল এবং একজন স্বাধীন ব্যক্তির মতো তাকে পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করার সুযোগ রহিত হয়ে গেল। তালাকপ্রাপ্তা হলে স্বামীর জন্য অপরিহার্য হয়ে গেল, তাকে সেই সবগুলো জিনিস দিয়ে দাও, যেগুলো সে বিয়ের সময় লাভ করেছিল।...

---

১. *Annie Besnt. The Life And Teaching Of Mohammad, Madras. 1932. p. 3*
২. *N. J Counsol. Islamic Surveys : A History Of Islamic Law. Edinburg 1971, P. 14*

'তা ছাড়া উঁচু স্তরের নারীরা বিদ্যা ও কাব্যের স্বাদ উপভোগ করতে লাগল। কেউ-কেউ তো আবার শিক্ষকের মর্যাদাও লাভ করল। সাধারণ শ্রেণির নারীরা আপন ঘরে রানির মর্যাদায় স্বামীর উৎসব-আনন্দ ও শোক-দুঃখে অংশীদার হতে শুরু করল। তারা মায়ের মর্যাদা পেতে লাগল।'[১]

প্যারিসে অনুষ্ঠিত তুলনামূলক আইনের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের এশীয় আইন অধ্যয়ন শাখা – যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আইনবিদগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন – ৭ জুলাই ১৯৫১-এর রেজুলেশনে বলেছে, 'ইসলামি আইনের ওপর সপ্তাহব্যাপী চলমান আলোচনাগুলো দ্বারা প্রতিনিধিদের সামনে প্রতিভাত হলো যে, ইসলামি আইনের মূলনীতিগুলোর উপকারিতায় কোনো সংশয় নেই। আইনের এই মহান শাখাটিতে সেই সমস্ত মূলনীতি ও কর্মনীতি বিদ্যমান, যে কিনা তাকে নবজীবনের প্রয়োজনগুলো পূরণ করার যোগ্য বানিয়ে দেয়।'[২]

সুধীমণ্ডলী!

দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে যারা পত্রপত্রিকা পড়েন এবং দেশে চলমান আন্দোলন ও তৎপরতাগুলোর ওপর চোখ রাখেন, তাদের জানা আছে, যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে (যেখানে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আজীবন খোরপোশ দেওয়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল) মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নির্দেশনা ও প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে-আন্দোলন এতটাই ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল যে, মুসলমানদের প্রতিটি গোষ্ঠী, দল-সংগঠন এই আন্দোলনের পক্ষে একাকার হয়ে গিয়েছিল, যার নজির খেলাফত আন্দোলনের পর দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যায়

---

১. *Encyclopedia Of Relligion And Ethics. NewYork. 1912. Vol. V. P. 271*
২. *Islamic Studies Quarterly. Vol. XX 111 No. 4*

না। সে-সময় ভারতের অমুসলিম সাংবাদিক, পণ্ডিত ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে এমন প্রতিক্রিয়া, জোশ, ঘৃণা ও ভয়ের প্রকাশ ঘটেছিল যে, মনে হচ্ছিল, বোধহয় দেশের ওপর কোনো বৈদেশিক আক্রমণ হতে যাচ্ছে কিংবা বজ্রপাত বা ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। অথচ, রায়টা ছিল সেই বাস্তবতা ও অনুপাতের পরিপন্থী, যার ওপর জীবনের ব্যবস্থাপনা চলছে।

কোনো একটা বিষয় যতখানি মনোযোগ, চিন্তা অস্থিরতার অধিকারী, তাকে ততটুকুই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং তার মাঝে ততখানিই শক্তি ব্যয় করা আবশ্যক। সরিষার পর্বত গড়ে তোলা না সুস্থ বিবেকের দাবি, না বাস্তবতার দাবি। আমরা সবাই জানি, এদেশে কাঙ্ক্ষিত যৌতুক না আনার কারণে নববধূ ও নিষ্পাপ কিশোরীদের আগুনে পোড়ানো হয়। এমন ঘটনা দেশে হাজারে-হাজারে ঘটছে। জাতীয় দৈনিক 'কাওমী আওয়ায' দিল্লি ১০ জুন ১৯৮৪ সংখ্যার একটি প্রতিবেদন মোতাবেক 'শুধু দিল্লিতে প্রতি বারো ঘণ্টায় একজন করে নববিবাহিতা বধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।' এ মুহূর্তে আমরা যে-মাটিতে সমবেত আছি, এর আশপাশে সতিদাহের প্রথা এখনও চালু আছে এবং এর অসংখ্যা ঘটনা হরদম ঘটছে। এমনি পরিস্থিতিতে অনুপাত অনুভূতি, সুস্থ বিবেক ও মানবীয় সহমর্মিতা বরং আপন গোষ্ঠীর সঙ্গে ভালোবাসার দাবি এটা ছিল না যে, সেই অবিচারগুলোর প্রতি মনোযোগ এর চেয়ে খানিক বেশি দেওয়া হবে, যেগুলো মুসলমানদের নিজস্ব পারিবারিক আইনের সুরক্ষার দাবি ও ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরোধিতায় করা হচ্ছে, যার ফলে দেশে প্রকৃত ঐক্য সৃষ্টির আশা রাখা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা, পৃথিবীর ঘটনাবলি ও বিগত দুটি মহাযুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিপন্থী, যেগুলো সেই একই পারিবারিক আইন ও সিভিল কোডের অনুসারী দুটি প্রোটেস্টেন্ট খ্রিস্টান জাতি ও দেশের মধ্যখানে সংঘটিত হয়েছিল।

তারপর এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রাখা দরকার ছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সমাজে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর নিজের বংশ, পিতামাতা ও ভাইদের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না এবং তালাকপ্রাপ্তা মুসলমান নারী তালাকের পর একদম লা-ওয়ারিশ হয়ে যায় না, ভিক্ষা করে বেড়াতে কিংবা নিজের নিজের জীবনের অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়ে পড়ে না। বিবাহ ও তালাক উভয় অবস্থাতেই সে পরিবারের একজন সদস্যা, পিতামাতার (যদি তারা জীবিত থাকেন) কন্যা ও ভাই-বোনদের বোন থাকে। সে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সেই পুরো অংশের অধিকারী হয়, যা ইসলামি শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে যার আলোচনা ও তাগিদ বিদ্যমান।

তার বিপরীতে হিন্দুসমাজে নারী বিয়ের পর পরিবার, পিতামাতা ও ভাই-বোনদের থেকো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার প্রতিপালনের দায়িত্ব সবটুকুই স্বামীর ওপর গিয়ে বর্তায় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী একদম লা-ওয়ারিশ ও নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি আর এই প্রথা-ই প্রাচীন কালে (যার ঐতিহাসিক সীমারেখা নির্ধারণ করা দুষ্কর) মহিলাদের যে-শ্রেণিটা বৈধব্যের জীবন যাপনে বাধ্য ছিল, তাদের সতিদাহের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, যেটি এই অসহায়ত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে বিবেচিত ছিল।

সুধীমণ্ডলী!

সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল হওয়া এবং পার্লামেন্টে অসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে পার্সোনাল ল বোর্ডের দাবি এবং মুসলমানদের গণরায়ের পক্ষে বিল পাশ হওয়ার পরও মুসলমানদের পারিবারিক আইন নিয়ে আমরা যারা কাজ করেছি, তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। পার্লামেন্টে বিল পাশ হওয়ার পরও দেশের কোনো-

কোনো রাজ্যে এবং কোনো-কোনো অঞ্চলের আদালতে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক রায় অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আজীবন খোরপোশ দেওয়ার পক্ষে রায় দিচ্ছে, যা কিনা পরিষ্কার আইনি স্ববিরোধিতা, বরং প্রকৃতপক্ষেই একটি পাশকৃত আইনের সঙ্গে বিদ্রোহের শামিল, যেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পাশকৃত অবশ্যপালনীয় বিধান।

এর জন্য বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও তার আইনবিদ সদস্যগণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। আইনের মাধ্যমে কিংবা ক্ষমতাবলে এই ধারা বন্ধ করে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংজির সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলেন এবং এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি ওয়াদাও দিয়েছিলেন। কিন্তু না তাঁর শাসনামলে এদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, না তাঁর পরবর্তী কোনো সরকারের এ ব্যাপারে টনক নড়েছে। আমি এর মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের অবমাননা অনুভব করছি। এর প্রতি আমাদের পুরোপুরি সতর্ক থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আইনিভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় এ কাজে আমরা যত যা পরিশ্রম করেছি, সব লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে।

২. বোর্ডের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো সমাজসংশোধনের কাজ। এ ক্ষেত্রে চেষ্টা চলছে। সমাবেশ হচ্ছে। সফর হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ সালের ১ মার্চ পাটনায় গান্ধী মাঠে। এত বড় ও সফল সমাবেশ নিকট ও দূর অতীতে আরেকটি খুঁজে পাই না। কিন্তু প্রয়োজন হলো, এর জন্য অল্প কদিন পরপর সারা দেশে সফর করা এবং বড়-বড় সমাবেশের আয়োজন করা। দীনি জলসা ও মসজিদের ওয়াযগুলোতেও একে

আলোচনার বিষয় বানিয়ে নেওয়া দরকার, যাতে সাধারণ জীবনের ওপর এর প্রভাব পড়ে।

৩. আমি দীর্ঘদিন যাবতই অনুভব করছিলাম যে, ইসলামি পারিবারিক আইনের ওপর একটি নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত গ্রন্থ প্রস্তুত করা দরকার, যেটি স্বাধীন ও শরয়ী বিচারালয় থেকে শুরু করে সরকারি আদালতগুলোতে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। ইংরেজরা তাদের শাসনামলে মোহামেডান ল-এর ওপর মুসলমান আইনবিদদের দ্বারা একাধিক গ্রন্থ লিখিয়ে নিয়েছিল, যেগুলোর মাঝে জাস্টিস সাইয়িদ আমীর আলী ও জাস্টিস আবদুর রহীমের গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং উকিল ও জজগণ সেগুলোর ওপর নির্ভর করে আইনি কার্যক্রম চালিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ছিল অধিকতর মেহনত, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে নির্ভরযোগ্য আলেম এবং ফেকাহ ও হাদীছশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ লোকেরা এ-কাজটি আঞ্জাম দেবেন এবং একটি নতুন গ্রন্থের বিন্যাস জনসম্মুখে এসে হাজির হবে, যেটি দলিল ও সনদের কাজ দেবে।

এই প্রয়োজনটি সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা আমীরে শরীয়ত মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রহমানি সাহেব, যাঁকে আল্লাহপাক দূরদর্শিতা, মস্তিষ্কের প্রখরতা, সঠিক ও বাস্তব বিষয়টি বুঝবার জ্ঞান এবং সমস্যা ও বিপদ সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করার সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই মেধা, বিচক্ষণতা ও আল্লাহর তাওফীক তাঁর দ্বারা অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। নিজের তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় মোঙ্গেরে এই কাজটি শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করার আগেই তাঁর পরপারে পাড়ি জমানোর সময় এসে পড়েছিল।

কিন্তু মাওলানার মৃত্যুর পরও বোর্ড ও ইমারাতে শরইয়্যা কাজটি অব্যাহত রাখে এবং দেশের নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট আলেমে দীন, ফেকাহ্‌বিদ ও সম্মানিত মুফতীগণ আপন-আপন জায়গা থেকে সফর করে মোঙ্গের ও পাটনায় ১৪১৪ হিজরির রবিউল আউয়ালে মহান আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেন, যাকে আপাতত 'ইসলামের পারিবারিক আইনের দফাওয়ারি সংকলন' নাম দেওয়া যেতে পারে।[১]

এই ইংরেজি অনুবাদও বাজারে আসা দরকার, যাতে উকিল-বিচারপতিগণও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন এবং পুরাতন মোহামেডান ল-এর গ্রন্থগুলোর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী!

এবার আমি দীনের একজন প্রতিনিধি দাঈ এবং 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর একজন দায়িত্বশীল হিসেবে আপনাদের উদ্দেশে ঈমানি ও কুরআনি জবানে কিছু কথা বলতে চাই যে, আপনারা আমাকে যে-মর্যাদা দান করেছেন এবং এই যে মূল্যবান সময়গুলো এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করে দিয়েছেন, কথাটি না বললে তার হক আদায় হবে না এবং ভয় আছে, আল্লাহর দরবারেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। এখানে আমি সেই নিবেদনটি পুনর্ব্যক্ত করব, যেটি আমি দিল্লির ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ সালের সভায় ব্যক্ত করেছিলাম।

---

১. *আইনের এই সংকলন ও জনগুরুত্বপূর্ণ এই ইলমি কাজে যাঁরা সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন এবং এর স্থায়ী সদস্য ছিলেন, তাঁদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মুফতী নেয়ামতুল্লাহ (মুফতী, ইমারাতে শরইয়্যা), মাওলানা বুরহানুদ্দীন সাহেব সম্ভলি (দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা), মুফতী আহমাদ আলী সাঈদ (দারুল উলূম ওয়াক্‌ফ), মাওলানা যফীরুদ্দীন (দারুল উলূম দেওবন্দ) ও মাওলানা নাসরুল্লাহ (মুফতী, ইমারাতে শরইয়্যা)। যারা আংশিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা হলেন মাওলানা কাজী মুজাহিদুল ইসলাম (কাজী, ইমারাতে শরইয়্যা), মাওলানা ওলী রহমানি (সাজ্জাদানশিন, খানকা রহমানিয়্যা) প্রমুখ।*

চিন্তা করে দেখুন, আপনারা কুরআনের সমাজবিধান কতখানি মান্য করেন? তার ওপরে পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রথা-প্রচলনকে কতখানি প্রাধান্য দেন? তার সঙ্গে সেই বিষয়গুলোকে যোগ করুন, যেগুলো আপনার স্বদেশিদের কাছ থেকে শিখেছেন। যৌতুকের দাবি আমাদের মাঝে কোথা থেকে এল? মক্কা-মদীনা থেকে এসেছে? কুরআনের পথে এসেছে? কোথা থেকে এসেছে এই অভিশাপ? আপনারা যখন এসে গ্রহণ করছেন, তখন শাস্তি হিসেবে আপনার জাতীয় মর্যাদাবোধকে, আপনার জাতীয় অস্তিত্বকে বারবার নিশানা বানানো হচ্ছে।

কিন্তু আমি যখন সরকারের বিরুদ্ধে, দেশি ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব না কেন? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব, তার আঁচল ধরে ফেলব। কিন্তু আপনার ধরব কলার। আর সেই হাত আমার হাত হবে না। সেটি হবে দীনি জবাবদিহিতার হাত। সেটি হবে শরীয়তের হাত, যে কিনা আপনার কলার ধরে ফেলবে এবং বলবে, আগে তুমি নিজের আঁচলে মুখ রেখে দেখো, এই আইনের ওপর নিজে কতখানি চলছ, তোমার চোখে এই আইনের কতটুকু মর্যাদা আছে? যেখানে তুমি এই আইন প্রয়োগ করতে পারছ, সেখানে প্রয়োগ করছ কিনা? নিজের ঘরে এই আইন প্রয়োগ না করে যদি সরকারের কাছে দাবি জানাও, তা হলে সরকার তোমাদের কথা শুনবে না।

এখান থেকে প্রতিজ্ঞা করে যান, এখন আমরা নিজেরা শরীয়তের ওপর চলব। যৌতুক একটা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। বরের পক্ষ থেকে দাবিদাওয়ার লম্বা-চওড়া একটা তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। নানা শর্ত আরোপ করা হয়। সেগুলো পূরণ না হলে নিরপরাধ মেয়েগুলোকে পুড়িয়ে মারা হয়। দেশে এমন হাজার-

হাজার ঘটনা ঘটছে। সৃষ্টিকর্তার (নারী ও পুরুষ উভয়ই যার সৃষ্টি) কি এ বিষয়টি সহ্য হতে পারে? এমন নিপীড়ন সহ্য করে কোনো দেশ, কোনো সমাজ বাঁচতে পারে কি? আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের অধিকারী হতে পারে কি? আপনি রহমতুল্লিল আলামীনের উম্মত। আপনি আছেন বলে অন্যরা একাজে সাহস না করার কথা ছিল। আমি দিল্লির একটি সমাবেশে বলেছিলাম, আল্লাহপাক বলেছেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

'আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। আবার আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর তিনি তাদের শাস্তি দানকারী হবেন।'[১]

আপনি রহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মত। আপনি থাকতে ভারতীয় সমাজে এই অবিচার চলবে, বিবেক এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আপনি আছেন বলেই এটা না হওয়া উচিত ছিল; কাজটা আপনার হাতে ঘটবে তো দূরের কথা। প্রতিজ্ঞা নিন, আজ থেকে ইসলামি তরিকায়, ভদ্রসুলভ মানবীয় পদ্ধতিতে বিয়ের পয়গাম দেব। আপনি কনে চাইবেন, নিজের জন্য জীবনসঙ্গিনী তালাশ করবেন, ছেলের জন্য প্রস্তাব পাঠাবেন; কিন্তু যৌতুকের কোনো দাবি থাকবে না যে, এটা দিতে হবে, ওটা দিতে হবে। আমাদের প্রত্যয় নিতে হবে, সমগ্র দেশ থেকে আমরা এই কুপ্রার বিলুপ্তি ঘটাব।

অনুরূপ তরকাও শরয়ী পদ্ধতিতে বন্টিত হওয়া দরকার। বিবাহ শরয়ী পদ্ধতিতে হতে হবে। তালাকের সুন্নত তরিকা জেনে নিতে হবে। তারপর বুঝতে হবে কীভাবে

---

১. *সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩*

তালাক দিলে তালাক হয়ে যায় আর কীভাবে হলে তালাক হয় না। তালাকে রজয়ী তালাকে বায়েন, তালাকে মুগাল্লাযা কাকে বলে জানতে হবে। তারপর আপনাকে এটাও জানতে হবে যে, তালাক হলো সবচেয়ে খারাপ জায়েয কাজ। আল্লাহর রাসূল বলেছেন তালাক দেওয়া জায়েয। তবে একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জায়েয। এটা খুবই অপারগতার ব্যাপার। একান্ত বাধ্য হলেই মনের ওপর পাথর রেখেই তবে তালাকের পথ অবলম্বন করতে হয়। তালাক কোনো ফ্যাশন নয়। এই যে মানুষ আমাদের তিরস্কার করছে, এর জন্য আমাদেরও কিছুটা ত্রুটি আছে। অবশ্য ভর্ৎসনা যতখানি করে, আমরা ততখানির অধিকারী অবশ্যই নই।[১]

সুধীমণ্ডলী!

এই মুহূর্তে জেপুরের 'জামেয়া হেদায়াত'-এর ছায়ায় যে-মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে বিদায় নিয়ে আপনারা যার-যার জায়গায় ফিরে যাবেন। ফেরার সময় একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়াতের বার্তা নিয়ে যাবেন। এই মাহফিল না শুধু আপনার পারিবারিক পরিমণ্ডলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন কাটানোর, পাওনাদারের পাওনা আদায় করার এবং একটি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সুন্নতের অনুসারী সমাজের নমুনা-ই পেশ করার কারণ হবে; বরং আপনার মাধ্যমে আপনার স্বদেশি ও প্রতিবেশী মুসলমানরাই নয়; বরং অমুসলিমদেরও সামনে ইসলামি পারিবারিক জীবন ও সুস্থ সমাজের একটি নমুনা সামনে চলে আসবে, যার ফলে তাদের মনে না শুধু ইসলামের মর্যাদা-ই সৃষ্টি হবে; বরং তার প্রতি তাদের আকর্ষণও সৃষ্টি হবে।

---

১. মুসলমানদের মাঝে তালাকের যতখানি বিস্তারের কথা বলা হচ্ছে, তাতে বাড়াবাড়ি ও রংচড়ানোর ব্যাপার আছে। যতখানি বলা হচ্ছে, আমরা ততটুকু খারাপ নই। তবে কিছু অসাবধানতা আছে বটে।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে বড় একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মাওলানা শাহ আবদুর রহীম – যিনি এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ও প্রকৃত মেজবান ছিলেন – গুরুতর অসুস্থ হয়ে বোম্বাই চলে গিয়েছিলেন। ফলে সম্মেলন তাঁর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য ও সাহসী পুত্র মৌলভী ফজলুর রহীম নদবি ও মৌলভী জিয়াউর রহীম নদবি স্বনামধন্য পিতাজির পুরোপুরি স্থলাভিষিক্তি করেন এবং সম্মেলকে সফল করে তুলতে এমন চেষ্টা চালান ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেন যে, (হযরত শাহ সাহেবের স্বশরীর উপস্থিতির বরকত ও তাঁর সান্নিধ্য ছাড়া) কোনো শূন্যতা ও অপূর্ণতা অনুভূত হয়নি। খোদ জেপুরবাসী এই দীনি ও জাতীয় সম্মেলনটিকে সফল বানাতে এবং জেপুরের নাম উজ্জ্বল করতে এমন সহযোগিতা করেছে, যার দৃষ্টান্ত কমই চোখে পড়েছে। জামেয়া হেদায়াতের সুপরিসর ও শানদার ভবন – যেটি শহর থেকে খানিক দূরে অবস্থিত – প্রতিনিধি, বোর্ডসদস্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অতিথিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা, আগতদের মেহমানাদারি ও আরাম-আয়েশে কোনো ত্রুটি বা অবহেলা অনুভূত হয়নি। মজলিসে আমেলার বৈঠক, সাধারণ সভার বৈঠকও অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

তারপর ১০ অক্টোবর রাতে জেপুরের রাম লীলা গ্রাউন্ড মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিপুল লোকের সমাগম ঘটে। অনেকের ধারণা, এই সভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটেছিল। আমিও সেখানে ভাষণ দান করি, যার শিরোনাম ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

(আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। যেলোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে পরিষ্কার পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।[১])

---

১. *সূরা আহযাব : আয়াত ৩৬*

এই আয়াতের আলোকে পুরো শরীয়তের ওপর আমল করার এবং তার বিপরীত আইন ও প্রথা-প্রচলন থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই মাহফিল থেকে যদি আপনারা এই একটি বার্তা নিয়ে ফিরতে পারেন, তা-ই যথেষ্ট। যদি সম্ভব হতো, তা হলে কথাটি এক টুকরা কাগজে লিখে বা কপালে খোদাই করে দিয়ে আপনাদের ফেরত পাঠাতাম।

টুঙ্ক সফর

পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে ১১ অক্টোবর আমি টুঙ্ক-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। টুঙ্ক ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি ও হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের পর থেকে আমাদের বংশের একটি ঠিকানা হয়ে গেছে। প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত আমাদের বংশ কুতবি আলামুল্লাহর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখানে বাস করে আসছে এবং এখানে একাধিক বিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি এখানকার প্রথম সফরটি করেছিলাম আমার ওস্তাদ ও শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খাস সাহেব (ওস্তাদ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা)-এর সঙ্গে ১৯৩৬ সালের মে মাসে। সেখানেই একদিন প্রত্যুষে বেনাস নদীর কূলে (যেখানে মুজাহিদীনে ইসলাম বহুবার উজু করে থাকবেন) বসে নদীতে পা ফেলে সূর্যোদয়ের আগে পরিকল্পনাধীন গ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর ভূমিকা লিখেছিলাম (যেটি গ্রন্থটির সপ্তম মুদ্রণের ৫৫ পৃষ্ঠা থেকে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসেছে) এবং যেটি গ্রন্থটির একটি শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল অংশ।

তারপর নিজের আত্মীয়স্বজন ও দাদার বংশের লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের উদ্দেশে এবং মনের টানে কয়েকবারই ওখানে যাওয়া হয়েছে এবং বেশ কদিন থাকা হয়েছে। তারপর যখন এই বংশটিকে খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং কিছু ভুল সংবাদ ও গুজবের ওপর ভিত্তি করে ১৯২০-১০২১ সালে রাজ্যের আদেশে ভিটেমাটি ছাড়তে হলো, তখন প্রায় এই পুরো বংশটি নিজের পুরাতন মাতৃভূমি রায়বেরেলিতে চলে এল, যেখানে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা ছিল। তারপর ১৯৯৩২ সালে তার বড় একটি অংশ টুঙ্ক ফিরে এল। ১৯৪৭ সালের পর যখন পাকিস্তান গঠিত হলো, তখন বংশের অবশিষ্ট লোকগুলো পাকিস্তান স্থানান্তরিত হয়ে গেল। কিন্তু এবার ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে যখন আমি টুঙ্ক গেলাম, তখন এখানে আত্মীয়দের

বাসস্থানের পরিবর্তে পেলাম কবরস্তান। কাফেলা নামক মহল্লাটি যেখানে পুরোপুরি আমাদের বংশের আবাস ছিল, সেখানে এখন তাদের একজন লোকও পেলাম না। বড়-বড় হাবেলি ও বিশাল-বিশাল ভবনগুলোতে এখন অন্যরা বাস করছে, যাদের কেউ-কেউ আবার অমুসলিম।[১] আমি বাইরে থেকে তাদের প্রতি চোখ তুলে তাকালাম। আমার পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। হৃদয়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলাম। এবার আর আত্মীয়দের সাক্ষাৎ, তাদের সালাম জানানো ও দু'আ করার হলো না। কাফেলার বিখ্যাত ও সুবিস্তৃত কবরস্তানটা ছিল মোতিবাগে। এখানে রাজ্যপালের পরিবারের লোকজনও সমাধিস্থ আছে। আমার আত্মীয়দের মধ্যে আছেন আমার আপন ফুপি (আমার ওস্তাদ জনাব মাওলানা সাইয়িদ তালহা সাহেব হাসানি এমএ-এর স্ত্রী) ও চাচা সাইয়িদ ইসমাইল সাহেব (হযরত সাইয়িদ সাহেবের নাতি)সহ অনেকেই এখানে সমাধিস্থ আছেন। এই কবরস্তানে কোনো পাকা কবর নেই। সবগুলো কবরই কাঁচা। এমনকি রাজ্যের দ্বিতীয় গভর্নর নবাব উজিরুদ্দৌলা বাহাদুরের কবরও কাঁচা, যার গায়ে কোনো নেমপ্লেটও নেই। নেমপ্লেট বা কোনো পরিচিতি না থাকার কারণে আমি আমার কোনো আত্মীয়-বুযুর্গের কবর চিহ্নিত করতে পারিনি। শুধু আমার ওস্তাদ ও শায়খ হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেববের (ইমামে হাদীছ শায়খ হুসায়ন ইবনে মুহসিন আনসারি ইয়ামানি এবং খলীফা শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুজাজিদের মক্কী) কবরের ওপর একটি চিহ্ন থাকায় সেটি চিনতে পেরেছি এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করেছি। এটি সাইয়িদ সাহেবের দাওয়াত ও সুন্নতের অনুসরণের বরকত ছিল যে, এখানকার কবরগুলোর ওপর না কোনো গম্বুজ আছে, না কোনো এমারত, না এখানে কোনো ওরশ বা অন্য কোনো প্রথা পালনের রেওয়াজ আছে।

টুঙ্ক-এর দোরোজা অবস্থানে (যা কিনা হয়েছিল আমারই ওস্তাদ হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ফোরকানিয়ায়) দুটি মাদরাসা ও মারকাযে আমি ভাষণ প্রদান করি, যার মধ্যে একটি ছিল মাওলানা হাকীম বারাকাত আহমাদ সাহেবের মাদরাসায়ে খলীলিয়া। মূল ও

---

১. আমি একাধিক সূত্রে জানতে পেরেছি, অমুসলিমদের কাফেলায় বাস করা গাসহা হয়নি। যে-বাড়িগুলোতে এককালে তাওহীদের পতাকাবাহী ও সৈনিকরা বাস করতেন, সেগুলোতে যারা মূর্তিপূজা ও মোশরেকানা প্রথা পালন করতে চেয়েছিল, তারা এমনসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল, যার ফলে আর সেগুলোতে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের বেশিরভাগই বাড়িগুলো খালি করে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

শক্তিশালী ভাষণটি হয়েছিল কাফেলার মাদরাসায়, যেখানে পৌছামাত্র আমার মন-মস্তিষ্ক ও ইতিহাসের পুরাতন নকশাগুলো; বরং বলতে হয় পুরাতন ক্ষতগুলো তাজা হয়ে গেল যে, এটিই বালাকোটের মুজাহিদ ও শহীদদের সন্তানদের কেন্দ্রীয় মসজিদ। বলা হয়, এই মসজিদে তাহাজ্জুদের সময় এত বেশি মুসল্লীর সমাগম ঘটত, যতসংখ্যক হতো মাগরিবের নামাযে। সেখানে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

'মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ-কেউ শাহাদাত বরণ করেছে আবার কেউ-কেউ (শহীদ হওয়ার অপেক্ষায়) অপেক্ষমাণ রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো প্রকার রদবদল করেনি।'[১]

স্থান উপযোগী হওয়ার কারণে এবং বংশগত ও আবেগগত সম্পর্ক ছিল বলে এই ভাষণে এমন জযবা ও শক্তি ছিল, যেমনটি দীর্ঘ দিন যাবত কোনো ভাষণে সৃষ্টি হয়নি।

বংশগত সম্পর্কের কারণে টুঙ্কবাসী আমাকে নিষ্ঠাপূর্ণ সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল। তারা টুঙ্ক-এর প্রবেশদ্বার বেনাস নদীর কূলে বিপুলসংখ্যায় সমবেত ছিল। তারা তাদের নিষ্ঠা ও আনন্দ প্রকাশ করল। সৌভাগ্যক্রমে এই সফরে মুফতী আহমাদ হাসান সাহেবের সঙ্গও আমার অর্জিত ছিল, যিনি টুঙ্ক-এরই অধিবাসী এবং মাওলানা হায়দার হাসান সাহেবের বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছাড়াও উক্ত বংশের আরও কয়েকজন নদবি আলেম যেমন– মৌলভী মুহাম্মাদ ওমর নদবি ও তার ভাই মৌলভী মুহাম্মাদ আমের নদবি সঙ্গে থেকে আমার সফরকে সহজ ও অধিক লাভজনক করে তুলেছিলেন। শওকত আলী খান সাহেবের এক পুত্রের (প্রাক্তন পরিচালক, মাওলানা আযাদ এ্যারাবিক এন্ড ফার্সিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট) সাথে আমার আগে থেকেই পরিচিতি ছিল। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্নেহাস্পদ সাইয়িদ আহমাদ আলী হাসানি নদবি ও তার ছোট ভাই সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলীও (যে টুঙ্কেই একটি স্কুলের শিক্ষকতা করত)

---

১. *সূরা আহযাব : আয়াত ২৩*

আমাকে সঙ্গ দিতে রায়বেরেলি থেকে চলে এসেছিল। তাদের কারণে কাফেলায় আমার পুরাতন আত্মীয় বাসিন্দাদের চেনা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

একটা ফেতনা ও তার জবাব

জেপুরে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের সম্মেলন শেষে যে-কার্যক্রম ও তার মঞ্জুরকৃত প্রস্তাবাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের তার ওপর আমল করার আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও নগরে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর প্রস্তাব ছিল, যেখানে বিবদমান পারিবারিক সমস্যাগুলোর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া হবে এবং মুসলমানরা এজাতীয় বিবাদ ও সমস্যাবলি নিয়ে সরকারি বিচারালয়ে না গিয়ে এই কেন্দ্রগুলোতে চলে আসবে। এখানে বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ কুরআন-হাদীছ ও শরীয়তের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং বিবদমান উভয় পক্ষ শরীয়তের মর্যাদা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাহিদার ওপর আমল করবে এবং তাঁদের সামনে মস্তক অবনত করে দেবে।

এর জন্য বহু আগ থেকেই হিন্দুস্তান ও তার বাইরে 'দারুল কুজাত' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই প্রস্তাবে কারও কোনো আপত্তি ছিল না। প্রস্তাবের প্রচার ও কোনো-কোনো ভাষণে দারুল কুজাত-এর পরিবর্তে 'শরয়ী আদালত' বাক্যটি এসে পড়েছিল এবং দাবি উঠল, প্রতিটি জায়গায় শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা হোক। এই পরিভাষাটির কারণে ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকালোতে এবং কোনো উরদু পত্রিকাতেও এবং অমুসলিম অঙ্গনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। জনসাধারণকে বোঝানো হলো, মুসলমানরা এদেশে একটা সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা; যেন 'সরকারের মধ্যে সরকার' প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। তারা সরকারি আদালতের বিপরীতে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকাগুলোতে সমালোচনার ঝড় শুরু হয়ে গেল এবং কোনো-কোনো জাতিপূজারি অঙ্গনে কঠোর প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে গেল। এই ভুল বোঝাবুঝি নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই জরুরি হয়ে পড়ল, যাতে বোর্ডের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি স্পষ্ট হয়ে যায়।

অক্টোবরের ১৩ তারিখে লাখনৌতে আমার এক পুরাতন বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার একতেদার আলী খান সাহেবের স্ত্রীর (যিনি একজন সচেতন শিক্ষিতা মহিলা এবং পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেন) টেলিফোন এল। তিনি বললেন, এই পরিভাষাটির ফলে (শরয়ী আদালত) অনেক ভুল বোঝাবুঝি

সৃষ্টি হচ্ছে এবং কট্টরপন্থী অঙ্গনগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আমার এক জামাতা আছে তারেক হাসান। ও ইংরেজি পত্রপত্রিকা এবং প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার একজন স্বনামধন্য কলামিস্ট। আপনার অনুমতি পেলে আমি ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। ও আপনার সাথে কথা বলবে এবং তার আলোকে এই ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের চেষ্টা চালাবে।

আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম। তিনি ১৩ অক্টোবর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় এলেন। আমার কাছে তিনি প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আমি ব্যাখ্যা দিলাম, বোর্ডের আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনায় সাধারণত 'দারুল কুজাত' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হলো মুসলমানদের পারিবারিক, দাম্পত্যবিষয়ক, তালাক, উত্তরাধিকার ও সীমিত পরিসরে পারস্পরিক বিবাদের শরয়ী সমাধান দেওয়া, যেগুলো স্বামী-স্ত্রী ও তাদের উভয় পক্ষের মাঝে সংঘটিত হয়। তার একটি বড় উপকার হলো, বিবদমান উভয় পক্ষ সাধারণত ফয়সালাকে শ্রদ্ধার সাথে এবং ইসলামের বিধান মনে করে মেনে নেয় এবং বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের দীর্ঘসূত্রতা ও আপিলের ঝামেলা থেকে বেঁচে যায়। তারপর শরীয়তের ওপর আমল করার ফলে ছাওয়াবের অধিকারী হয় এবং শরীয়তের অনুসারী বলে প্রমাণিত হয়।

তারেক হাসান সাহেব কর্তব্যসচেতনতা ও কর্মতৎপরতার প্রমাণ দিলেন। পরদিনই 'দি টাইম্‌স্ অফ ইন্ডিয়া'র লাখনৌ সংস্করণ ১৪ অক্টোবরের প্রথম পাতায় আলোচনাটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হলো। তাতে 'দারুল কুজাত' ও 'কাজী'র পুরো ব্যাখ্যা ফুটে উঠল। আরও বলা হলো, কয়েক শতাব্দি যাবত হিন্দুস্তানে এই কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলো চালু আছে এবং তার ওপর কেউ কোনো দিন আপত্তি তোলেনি এবং তার দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হয়েছে। এই ইঙ্গিতও করা হলো যে, এর দ্বারা মিডিয়া আগামী নির্বাচনে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে। এই আদালতগুলো কাউকে শাস্তি প্রদানের এবং সরকারি আদালতগুলোর মতো শাসকসুলভ পন্থায় কাজ করার কোনো অধিকার সংরক্ষণ করে না।

১৫ অক্টোবর 'কাওমী আওয়ায'-এর প্রতিনিধি হুসাইন আমীন সাহেবও আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং এ বিষয়ে কথা বললেন। পরদিন ১৬ অক্টোবর ১৯৯৩ তার সাক্ষাৎকারটিও 'কাওমী আওয়ায'-এ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হলো। এই প্রতিবেদনে বাড়তি আরও কিছু কথা বলা হলো :

'বিভিন্ন রাজ্যে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে বিবাদ মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর উভয় পক্ষ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গেছে। বিহারে এমারাতে শরইয়্যা ব্যাপকভাবে দীর্ঘ দিন যাবতই কাজ করে যাচ্ছে এবং তার অধীনে বিপুলসংখ্যক 'দারুল কুজাত' আছে। উড়িষ্যা, বাঙ্গালোর এবং খোদ লাখনৌতেও দারুল কুজাত ও দারুল ইফতা আছে। মাওলানা বলেছেন, দারুল কুজাত অনেক কাজ দিচ্ছে। কারণ, দেওয়ানি আদালতগুলোর অনেক কম উকিলই শরীয় আইন জানেন। তিনি আরও বলেন, শরয়ী আদালতের ফয়সালাগুলোকে (বিশেষভাবে বিহারে) দেওয়ানি আদালতগুলোতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হচ্ছে। মামলাগুলো শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করার ফলে আদালতের দৌড়ঝাঁপ এবং অসহনীয় ব্যয় ও ঝামেলা ছাড়াই সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, মিডিয়ার কোনো-কোনো অঙ্গনে অহেতুক ও অকারণে দারুল কুজাত সম্পর্কে বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে এবং সরিষার পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে।'

সমরকন্দ ও বোখারা সফর

ইসলামি বিশ্বের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল হলো 'মা-অরাউন্নাহার'[১]। অনেক দামি-দামি ব্যক্তিত্ব তৈরি, ইসলামি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র হিসেবে অঞ্চলটি বিখ্যাত। তার ইতিহাস আমার জানা ছিল এবং আমার প্রতি তার যে অবদান, আমি তা তার প্রতি আমার স্বীকৃতি ছিল এবং তার

---

১. *ফারসিভাষী জাতিগোষ্ঠী ও তুর্কিদের মাঝে; তথা ইরান ও তুরানের মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল অক্সুস নদী (আরবিতে যার নাম জাইহুন)। এই নদীটার ওপারে উত্তরে যেকটি রাষ্ট্র ছিল, আরবরা সেগুলোকে বলত 'মা-অরাউন্নাহার'। আর যে-অঞ্চলগুলো তার পশ্চিমে ছিল, সেগুলোকে বলা হতো খোরাসান, যার প্রাণকেন্দ্র ছিল খাওয়ারেজম। 'মা-অরাউন্নাহার'-এর মাটি ছিল খুবই সবুজ-শ্যামল ও উর্বর। 'মা-অরাউন্নাহার'-এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হলো সিংকিয়াং, কাজাকিস্তান, কিরগিজিয়া, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও আজারবাইজান। দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলো হলো বোখারা, সমরকন্দ, ফারগানা, মুরগীনান, সুগুদ, নাসাফ, তিরমিয, ফারাব, শাশ, খাজান্দ, সাবাত, আবিজাব, আশরোসনা, ফারবার।*

নজিরবিহীন ব্যক্তিত্বদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। এমতাবস্থায় এটা মেনে নিতে পারছিলাম না, আমি ইউরোপ-আমেরিকায় বারবার সফর করব; কিন্তু 'মা-অরাউন্নাহার'-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডটির পরিদর্শন থেকে আমি বঞ্চিত থাকব, যে কিনা এক দিকে হাদীছশাস্ত্রে ইমাম বোখারি ও ইমাম তিরমিযি; ফেকাহশাস্ত্রে ফকীহ আবুল্লাইস, সমরকন্দি, শামুসল আয়িম্মা সারাখসি, আবুল হাসান আলী ইবনে আবুবকর মুরগীনানি, আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আশ-শাশী; কালামশাস্ত্রে প্রখ্যাত আলেম আবু মানসুর মাতুরীদিকে জন্ম দিয়েছে, অপরদিকে হেকমত ও বিজ্ঞানে আবুন নাসর ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো দুর্লভ ব্যক্তিত্বদের সৃষ্টি করেছে।

হাদীছ-ফেকাহর ইমাম এবং দার্শনিক-বিজ্ঞানীগণ ছাড়াও রূহানিয়াতের নেতা, তরিকতের প্রতিষ্ঠাতা, এখলাস ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সংস্কারক হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দি (নকশবন্দি সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতা) ও খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার-এর মতো মাখায়েখ; তাইমুরের মতো বিজেতা ও রাজা এবং মোগল সালতানাতের স্থপতি জহিরুদ্দীন বাবরের মতো ব্যক্তিরা এই ভূখণ্ডে জন্মলাভ করেছেন।

মহান আল্লাহ এই সফরের জন্য একটি গায়েবি ব্যবস্থা করে দিলেন এবং এর জন্য এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিলেন, যেটি এই ভূখণ্ডের শান ও মর্যাদার একেবারেই অনুকূল ছিল। সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তার বিগত এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি ইমাম বোখারির মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদের পাশে ইমামের স্মরণে এবং তাঁর নজিরবিহীন অমর কীর্তির পরিচিতির জন্য এযুগের দাবি অনুসারে একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবে। এই প্রস্তাবনায় ব্রুনাইয়ের প্রেসিডেন্ট সুলতান হাজী হাসানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা এবং তার শিক্ষামন্ত্রী পায়হান আবদুল আযীয-এর (যিনি সেন্টারের সদস্যও ছিলেন) আন্তরিকতা ও সহযোগিতা ছিল। সেন্টারের সর্বশেষ বৈঠকে এর জন্য ২৩ ও ২৪ অক্টোবর তারিখ নির্ধারিত হলো। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব বলে আমি ওয়াদা দিয়েছি এবং দৃঢ়ভাবে মনস্থও করেছি যে, এটি একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং জীবনের এটি একটি স্মরণীয় সফর হবে।

কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর তুরস্ক, ইউরোপ, আমেরিকা ও পবিত্র হেজাযের সফর থেকে যখন ফিরে আসি, তখন সফরের ক্লান্তি, ডাকের স্তূপ, লাখনৌ ও রায়বেরেলির অবস্থানের নানা ব্যস্ততা, নানা প্রয়োজন আমার এই পরিকল্পনা

ও সিদ্ধান্তে দ্বিধা তৈরি করে দিল। মধ্যবর্তী এই সময়টিতে আজমগড় জেলায় সফরের প্রয়োজন দেখা দিল, যেটি কারযোগে হয়েছে। ওখানে মুজাফফরপুরে অবস্থিত মৌলভী তাকিউদ্দীন নদবির প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার মাহফিলে অংশগ্রহণ করি, যেটি ছোট একটি কারের মাধ্যমে হয়েছিল। রাস্তা খুবই খারাপ এবং স্থানে-স্থানে ভাঙাচোরা ছিল। তারপর কারযোগে মিউ যেতে হলো, যেখানে চার-পাঁচটি প্রোগ্রামে অংশ নিতে হলো। ওখানে মৌলভী সাঈদুর রহমান নদবির সুবাদে চমৎকার একটা কার পেয়ে গেলাম। তারপর আজমগড়ে দারুল মুসান্নিফীন-এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের মিটিং-এর অংশ নিলাম এবং ওখান থেকেই কারযোগে রায়বেরিলি ফিরে এলাম। প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ কারযোগে যাওয়া; আবার দুশো কিলোমিটার কারযোগে আসা! তারপর রায়বেরিলি থেকে সুলতানপুর, সেখান থেকে জৌনপুর, সেখান থেকে আজমগড় গিয়ে পৌঁছতে হলো। মুজাফফরপুর পৌঁছে এমন ক্লান্তি বোধ করলাম যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই ডাকতে হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, রক্তচাপ কমে গেছে; বিশ্রাম প্রয়োজন। তারপরও যে-লক্ষ্যে সফর করা, তা পূর্ণ না হওয়ায় মনে-মনে লজ্জা পেলাম এবং মাগরিবের নামাযের পর জলসায় অংশও নিলাম এবং দীর্ঘ বক্তৃতাও করলাম।

তার দিনকতক পরই উজবেকিস্তান সফরের প্রোগ্রাম ছিল। সফর যদিও বিমানযোগে ছিল; কিন্তু প্রথমে আমাকে দিল্লি যেতে হবে। তারপর দিল্লি থেকে তাশকন্দ। স্বাস্থ্যের এই অবস্থা এবং নানা কাজের চাপের কারণে মনে খুব দ্বিধা তৈরি হয়ে গেল। চিন্তা করলাম, এই সফর বাদই দিয়ে দেব। কিন্তু হঠাৎ দিল্লি থেকে সংবাদ এল, বন্ধুবর মুহাম্মাদ ওছমান সাহেব হায়দরাবাদি শুধু আমার সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য আমাকে আরাম পৌঁছানোর লক্ষ্যে রিয়াদ থেকে সম্পূর্ণ নিজের খরচে দিল্লি চলে এসেছেন। আমি যদি সফর মুলতবি করে দেই, তা হলে তার এই আসা-যাওয়া একদম বেকার হয়ে যাবে। স্নেহাস্পদ মৌলভী রাবে নদবিরও আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। সেন্টারের সেই সভায়ই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ফলে হঠাৎ করেই সফর বহাল রাখার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম এবং দিল্লিতে নিয়ায আহমাদকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাদের তিনজনের জন্য (আমি, মুহাম্মাদ রাবে ও ভাই মুহাম্মাদ ওছমান সাহেব) ২২ অক্টোবর সকাল ১১টায় উজবেক এয়ারলাইনস থেকে তাশকন্দগামী বিমানে সিট বুকিং করিয়ে নিলেন।

তাশকন্দে

২২ অক্টোবর বেলা ১১টায় দিল্লি থেকে উজবেক এয়ারলাইনস-এ করে তাশকন্দের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিমানে প্রবেশ করে প্রফেসর খালীক আহমাদ সাহেব নেযামির ওপর চোখ পড়ল, যার ফলে মনে খুব আনন্দ পেলাম। জমিয়তুল উলামার সভাপতি মাওলানা সাইয়িদ আসআদ মাদানি ও তাঁর সহকর্মী মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরিকেও দেখতে পেলাম। জানানো হলো, বিমান তাশকন্দ পৌঁছতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু তিন ঘণ্টার ভ্রমণের পর আমরা তাশকন্দ গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে ভিসার কার্যক্রমে বেশ সময় লাগল। এই পুরো সফরে আমি একটা বিষয় অনুমান করলাম, এখানে প্রাচ্য মেজাজ কার্যকর এবং কাজকর্মে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো গতি নেই। তাশকন্দ পৌঁছে আমরা উজবেকিস্তান হোটেলে অবস্থান নিলাম। ১৫ তলাবিশিষ্ট একটি বিলাসবহুল হোটেল, বাইরে থেকে যাকে একটা জালের মতো দেখায়।

ধারণা করলাম, হয়তোবা রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সমরকন্দ যাওয়ার ঘোষণা এল এবং মাত্র ৪০ মিনিট সময়ে সমরকন্দগামী ফ্লাইটে সমরকন্দ পৌঁছে গেলাম। আমন্ত্রিতদের প্রায় সবাইকেই সমরকন্দ হোটেলে রাখা হলো। ডক্টর আবদুল্লার ওমর নাসীফ সাহেব (প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা), আমি এবং সঙ্গীদ্বয়কে রাখা হলো সরকারি গেস্টহাউজে।

২৩ অক্টোবর সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত উদ্‌বোধনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে সমরকন্দের গভর্নর, উপমুখ্যমন্ত্রী, ডক্টর আবদুল্লাহ নাসীফ, আমি, মুতামার ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারি হামেদ আল-গামেদ ও ইসলামিক সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সেক্রেটারি ফারহান নেযামি বক্তৃতা করি।

বক্তৃতা বেশিরভাগই উজবেক ও ইংরেজি ভাষায় হলো। ডক্টর আবদুল্লাহ নাসীফ আর আমি দেই আরবিতে। আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম, সভার ওপর সেই পরিবেশ বিরাজ করছে না, যেটি ইমাম বোখারির মতো একজন ব্যক্তিত্বের স্মরণ ও পরিচিতিসভায় বিরাজমান থাকা দরকার ছিল। আমি আমার বক্তৃতায় সেদিকে ইঙ্গিত করে বললাম, একজন বীর সেনানীর আলোচনাসভায় সেই ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং এমন ভাষণ দেওয়া হয়, যার ফলে শ্রোতাদের মাঝে বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জযবা জেগে ওঠে এবং পরিবেশের ওপর তার ছায়া পড়ে। একজন সাহিত্যিক ও কবির পরিচিতি ও

আলোচনার জন্য যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার ওপর সাহিত্য ও কবিত্বের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। ঠিক একই অবস্থা তৈরি হয় কোনো সংস্কারক ও দাঈর আলোচনার ক্ষেত্রেও।

কিন্তু আমি লক্ষ করছি, দীর্ঘক্ষণ যাবত ইমাম বোখারির পরিচিতি ও আলোচনা চলছে। অথচ, না তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর বৈশিষ্ট্য সভার ওপর ছায়াপাত করছে, না এমন কোনো বিষয়বস্তু ও গূঢ়তত্ত্ব সামনে আনা হয়েছে, যার মাধ্যমে জীবনের পথ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এবং তাকে নবুওত, রেসালাত ও হাদীছে নববির আলোকে অতিবাহিত করার জযবা তৈরি হবে। আর সে কারণেই আমি সহীহ বোখারির প্রথম হাদীছটি পাঠ করছি, যার চেয়ে উন্নত কোনো ভূমিকা কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের হতে পারে না এবং যার মাধ্যমে ইমাম বোখারি বলে দিয়েছেন, তিনি কোন লক্ষ্যে, কোন নিয়তে এই কিতাবটি সংকলিত করছেন এবং ছাত্ররা হাদীছ কোন উদ্দেশে চর্চা করবে, তাদের নিয়ত কী হতে হবে, লক্ষ্য কী হতে হবে। হাদীছটি হলো :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ নিয়ত যা করবে, ফলাফলও সেই অনুযায়ীই পাবে।'

এই হাদীছটিকেই আমাদের জীবনের দিকনির্দেশক ও মূলনীতি বানিয়ে নেওয়া দরকার যে, আমরা যা কিছু করব, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করব। যেকোনো কাজে আমাদের নিয়ত হবে ছাওয়াব। আর শেষে আমি সেই হাদীছটি পড়ব, ইমাম বোখারি যেটি দ্বারা তাঁর কিতাবের সমাপ্তি টেনেছেন। সেই হাদীছটি হলো :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

দুটি বাক্য আছে জিহ্বায় হালকা– পাল্লায় ভারী, আল্লাহর প্রিয়। তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

২৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে নটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত প্রবন্ধ পাঠের চারটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলোর একটাতে সভাপতিত্ব করে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদবি। যে-বৈঠকে আমি আমার প্রবন্ধটি পাঠ করি, তার

সভাপতিত্ব প্রখ্যাত আলেমে দীন ও হাদীছের ওস্তাদ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহ। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল الامام محمد ابن اسماعيل البخارى وكتابه صحيح البخارى مكانهما فى تاريخ الاسلام والدين والمكتبة الاسلامية العالمية (ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বোখারি ও তাঁর কিতাব সহীহ বোখারি : ইসলামের ইতিহাস, দীন ও আন্তর্জাতিক ইসলামি লাইব্রেরিগুলোতে দুয়ের মর্যাদা)। এই প্রবন্ধে আমি হাদীছের সংগ্রহ-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা, দীনকে বিকৃতি ও উম্মতকে পথচ্যুৎ হওয়া থেকে বাঁচানোর কাজে তার কৃতিত্ব, নির্ভুল ইসলামি ও দীনি পরিবেশ গঠন ও তার সুরক্ষায় হাদীছের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি এবং বলেছি, ইতিহাস সাক্ষী আছে, যে-যুগে ও দেশে হাদীছের চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে সুসম্পর্ক অবশিষ্ট থাকেনি, সেখানে বেদআত, সুন্নত ও শরীয়তপরিপন্থী কাজের প্রসার ঘটেছে, যাকে হাদীছ ছাড়া নির্মূল করা সম্ভব ছিল না। কেননা, হাদীছই করণীয় ও বর্জনীয় এবং সুন্নত ও বেদআতের মাঝে পার্থক্য তৈরি করে। আর এই যে যারা নিজেদের জীবনে পশ্চিমা সভ্যতাকে অবলম্বন করছে এবং একে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা হাদীছ ও সুন্নতকে নিজেদের প্রতিপক্ষ বানানোর এটাই রহস্য যে, হাদীছ ও সুন্নত তাদের পথে, তাদের লক্ষ্যের মাঝে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সেইসঙ্গে আমি ইমাম বোখারির স্বাতন্ত্র্য, কীর্তিমালা এবং সহীহ বোখারির বৈশিষ্ট্য ও উন্নত মর্যাদার ব্যাপারেও খানিক আলোকপাত করি।

আমার মনে একটা আশঙ্কা বিরাজ করছিল, ভারতবর্ষে ভালো মানুষদের কবরগুলোর ওপর যে-ধরনের ইমারাত নির্মিত হয়েছে এবং নানা প্রথা-প্রচলন শুরু হয়েছে, যেগুলো কিনা স্পষ্টতই সুন্নত, তাওহীদ, ইসলামি শিক্ষামালা ও সাহাবাদের আদর্শের পরিপন্থী, এখানে ইমাম বোখারির কবরেও সে-রকম কিছু শুরু হয়ে যায় কিনা। সেজন্য প্রবন্ধের শেষে আমি বোখারি শরীফের দুটি হাদীছ হুবহু উদ্ধৃত করি। একটি হলো :

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

'আল্লাহ ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি অভিসম্পাৎ করুন। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে।'[১]

---

১. *সহীহ বোখারি : কিতাবুল জানায়েয*

অপরটি হলো :

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا

'আমার কবরকে তোমরা উৎসবের জায়গা বানিয়ো না।'[১]

আলহামদুলিল্লাহ! শ্রোতারা আমার প্রবন্ধটি গভীর মনোযোগসহকারে শুনেছেন। ইমারাত ও ভবনাদির পরিকল্পনা ও নকশাগুলো দেখে জানতে পারলাম, পরিকল্পনায় এমন কোনো বিষয় নেই, যার ফলে কোনো 'দরগাহ ও ওরশের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। পরিকল্পনার বেশিরভাগই হলো মসজিদের সম্প্রসারণ আর একটি ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা।

বেশ কটি ঐতিহাসিক পরিদর্শন

২৪ অক্টোবর যোহরের সময় সমরকন্দের বাইরে কতগুলো ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শন ও ইসলামি ব্যক্তিত্বের কবরে ফাতেহা পাঠ করতে বের হলাম। এই সুবাদে আমর খরতঙ্গ যাওয়া হলো, যার অবস্থান সমরকন্দ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। ওখানে আমি ইমাম বোখারির কবরে ফাতেহা পাঠ করি। তারই সংলগ্ন কয়েক গজ দূরে ছোট একটি মসজিদ। হাদীছের ওস্তাদ ও বিজ্ঞ আলেমে দীন শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহও তখন ওখানে এসে পৌঁছান। কীভাবে এলাকাবাসী আমাদের আগমনের সংবাদ টের পেয়ে গেছে। মসজিদ কানায়-কানায় ভসে যায়। আমরা ওই মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। নামাযের পর উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণদান ও দু'আ করার সৌভাগ্যও নসিব হয়। শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহও বক্তৃতা করেন এবং দু'আ করেন। সে-সময় প্রখ্যাত আলেমে দীন, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষণ মৌলভী সাইয়িদ সালমান হুসাইনি নদবি, নদওয়াতুল উলামার হাদীছের ওস্তাদ মৌলভী নাসের আলী এবং আরও বেশ কজন বন্ধু-সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন। ভারতে থাকতে ধারণা ছিল না, ইমাম বোখারির কবর সমরকন্দের উপকণ্ঠে অবস্থিত। আমরা বোখারাতেই মনে করতাম। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম, তৎকালীন সরকার ও একদল আলেমের সঙ্গে বিরোধ থাকার

১. *সুনানে আবী দাউদ : কিতাবুল মানাসেক*

ফলে তাঁকে জন্মস্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল, যার ফলে সমরকন্দে তাঁর সমাধিস্থ হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়।

ওখানেই বড় একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার আয়োজন ছিল। আমরা দুপুরের খানা খেয়ে অবস্থানের জায়গায় ফিরে এলাম। আছরের নামাযের পর সমরকন্দের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনে বের হলাম। আলিগ বেগের মাদরাসার শানদার ইমারত দেখলাম। হযরত কাছাম ইবনে আব্বাস-এর মাজারটি দূর থেকে যিয়ারত করলাম, যিনি জিহাদ করতে সমরকন্দ এসেছিলেন এবং এখানেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তারপর খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার-এর মাজার ও মসজিদ দেখলাম এবং তাঁর কবরও যিয়ারত করলাম, যিনি নকশবন্দি সেলসেলার একজন মহান শায়খ এবং এই স্বর্ণশিকলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়া ছিলেন।

কনফারেন্স যথারীতি সমাপ্ত হলো। ২৫ অক্টোবর দিনটা খালি ছিল। মনে চিন্তা এল, এত দূরের এমন একটি দেশে এলাম, যার মর্যাদার সূত্রই হলো বোখারা-সমরকন্দ (বিশেষ করে বোখারা) আর আমি বোখারার দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকব এ তো হতে পারে না। এ অনেক বড় ক্ষতি ও অবমূল্যায়ন হবে। অগত্যা আমি বোখারা সফরের প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেললাম। জানতে পারলাম, তার অবস্থান এখানে তিনশো কিলোমিটার দূরে। বন্ধুবার মুহাম্মাদ ওছমান সাহেবের সুদৃষ্টি ও সহযোগিতায় বড়সড় এমন একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম, যার আসনও অনেকগুলো এবং জায়গাও বেশ খোলামেলা। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবুগুদ্দাহও সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি করুণাবশত নিজের আসন ছেড়ে আমার পাশের আসনে এসে বসলেন এবং পরম আন্তরিকতার সাথে ইলমি কথাবার্তা বলতে থাকলেন। আমার মুখ থেকে যদি অবস্থার অনুকূল কোনো আরবি কবিতা বেরিয়ে আসত, তা হলে পুত্র সালমানকে বলতেন, এটি লিখে নাও।

যোহরের সময় আমরা বোখারার সীমানায় প্রবেশ করলাম। বোখারা থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার আগে নকশবন্দিয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দির (৭১৩–৭৯১ হিজরি) মাদরাসা, মসজিদ ও মাজারের অবস্থান। চালক প্রথমে ওখানে গিয়ে থামল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে যোহরের নামায আদায় করলাম এবং খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দির

কবরে ফাতেহা পাঠ করলাম। কবরটা ছোট একটা হুজরার মধ্যে, যেটি চতুর্দিক থেকে বন্ধ। দরজা তো দূরের কথা; একটা জানালা, একটা ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই, যার মধ্য দিয়ে একটু উঁকি মেরে দেখা যেতে পারে।

আমার বংশ তিনশো বছরেরও অধিক কাল এই সেলসেলার সাথে সম্পৃক্ত। আমার বংশের পূর্বপুরুষ হযরত সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহ হাসানি নকশবন্দি (মৃত্যু : ১০৯৬) হযরত সাইয়িদ আদম বিন্নুরির মহান খলীফা ছিলেন, যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীর শীর্ষস্থানীয় খলীফা। শায়খুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব (রহ.) ও তাঁর বংশ এই সেলসেলারই বাহক ও প্রচারক ছিলেন। সর্বোপরি তরিকত, সংস্কার ও জিহাদের ইমাম হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এই সেলসেলারই শায়খ ও মুরশিদে কামেল। আমি নিজেও এই সেলসেলার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।[১] ওখানে হাজির হওয়ার পর আমার এই সম্পর্ক ও স্মৃতিগুলো তাজা হয়ে গেল। মসজিদের মাজারসংলগ্ন এক কোণে বসে আমি ফাতেহা পাঠ করি এবং ঈসালে ছাওয়াব করি।

ওখানে আমি বিশেষ এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করি এবং বিদআত ও শরীয়তের খেলাফ কোনো প্রথা বা কাজের কোনো আলামত চোখে পড়ল না। আর এটি এই সেলসেলার সনাতন বৈশিষ্ট্য।

হযরত খাজা নকশবন্দ-এর মাদরাসা ও মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা শহরের দিকে রওনা হলাম। পথে বিশাল একটা এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলাম, যার নাম বলা হলো 'মীর আরবের মাদরাসা'। কথিত আছে, ইমাম বোখারি এখানে হাদীছের দরস দিতেন। মীর আরব ইয়ামানের একজন সূফী বুযুর্গ ছিলেন এবং নাসীবানি বংশোদ্ভূত ছিলেন। ওখানে কিছু নাশতা খেয়ে এবং বিশ্রাম করে সমরকন্দের উদ্দেশে রওনা হলাম, যেখানে আমরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে উপনীত হলাম। রাতটা সমরকন্দ হোটেলে কাটালাম। ২৬ অক্টোবর সকালে তাশকন্দ যেতে বিমানবন্দর গেলাম। তাশকন্দে আগের সেই হোটেলেই অবস্থান নিলাম। ২৭ অক্টোবর বেলা ১১টায় দিল্লির ফ্লাইট ছিল। এখানেও বিমানবন্দরের

---

১. সেইসঙ্গে অপর তিন সেলসেলা কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়ার সাথেও আমার সম্পর্ক আছে এবং প্রতিটি সেলসেলার প্রতি আমার পুরোপুরি সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

কার্যক্রম সমাধা করতে এত বেশি সময় লেগে গেল, যেমনটা আসার সময় লেগেছিল। গেঁটে বাতের রোগী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে অনেকখানি পথ হাঁটতে হলো। ঘটনাক্রমে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্টেরও ঠিক একই সময়ে ফ্রান্সের সফর ছিল। সেজন্য বিমানবন্দরে কিছুটা কড়াকড়িও ছিল এবং তাঁর অপেক্ষার কারণে আমাদেরও বিমান ছাড়তে বিলম্ব হয়ে গেল। আড়াই ঘণ্টা পর দিল্লি এসে পৌঁছলাম। বিমান থেকে নেমেই আছর নামায আদায় করে লাখনৌগামী ফ্লাইটে চড়ে বসলাম, যার বুকিং ও যাবতীয় আয়োজনের কাজ স্নেহাস্পদ নিয়ায আহমাদ রায়বেরেলবি আগেই করে রেখেছিল। আল্লাহর মেহেরবানিতে ঠিক মাগরিবের সময় লাখনৌ বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। এই ঐতিহাসিক ইলমি ও রূহানি সফরটি সফলতার সাথে সমাপ্ত হলো।

উজবেকিস্তানের ওপর এক নজর

তাশকন্দ, সমরকন্দ ও বোখারা, যাতে উজবেকিস্তান বলা হয়, সত্তর বছর পর মস্কোর কম্যুনিষ্ট সরকারের শাসন ও গোলামি থেকে মুক্তি পেল, যেটি শুধু একটি সরকারব্যবস্থাই নয়; একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রবক্তা-প্রচারকই নয়; বরং মানুষের ওপর এই জীবনদর্শন চাপিয়ে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিও লালন করে, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, স্বাধীনভাবে ধর্মপালন, ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ এবং নতুন প্রজন্মকে সেই অনুসারে তৈরি করা, বহির্জগত, সমধর্মা ও সমজাতির সাথে সম্পর্ক রাখার কোনো অনুমতি ছিল না। এখানকার মুসলমানরা সাতটা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ছিল এবং তারা দীন ও শরীয়তের সঙ্গে শুধু সুসম্পর্কই বজায় রাখেনি; বরং কয়েকশো বছরের রেকর্ডও তারা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। বরং তারা এমনসব ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছিল, যাঁরা ইসলামি বিশ্বের সুদীর্ঘ ইতিহাস, সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এমন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার কোনো নজির নেই, যাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যার নাম উপরের লেখাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। এই দুঃস্বপ্ন যদিও অনেকখানি দূর হয়ে গেছে এবং কম্যুনিজমের পতন ঘটেছে, তারপরও (স্বভাবতই) তার ক্রিয়া (বিশেষভাবে শাসকগোষ্ঠী ও উচ্চতর শিক্ষিত শ্রেণিটির) চিন্তা-চেতনা থেকে দূর হয়নি। এই শরহগুলোতে মসজিদ আছে। কিছু আরবি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু তারপরও মনে হলো, এই ভূখণ্ডটিতে তার

অতীতের দিকে ফিরিয়ে সময়, সাহস, মানসিক পরিবর্তন, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, চিন্তানৈতিক বিপ্লব এবং সাধারণ-বিশিষ্ট উভয় অঙ্গনে দাওয়াতি ও তাবলীগি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আল্লাহ যদি তাওফীক দান করেন এবং এসব প্রচেষ্টা ও আন্দোলন বাস্তবতার মুখ দেখতে পায়, তা হলে এই ভূখণ্ড পুনরায় আগের মতো সোনার মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হবে।[১]

লাতুরের ভূমিকম্প

২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ৩টা ৫৫ মিনিটে লাতুর জেলায় কালারি নামক অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, যার ফলে এলকাটা পুরোপরি ধ্বংস হয়ে যায়। সংবাদটা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন অনেক লোক একে আসমানি গজব বলে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চল থেকে বাবরি মসজিদের দূরত্ব অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক অমুসলিম অধিবাসী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজে অংশ নিতে লাতুর থেকে অযোধ্যা গিয়েছিল এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে (বরং একে একটি পবিত্র ধর্মীয় কাজ মনে করে) এই খেদমতটি আঞ্জাম দিয়েছিল। শুনেছি, এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের অনুসারীদের অধিবাস থাকলেও ভূমিকম্পের প্রভাবের ক্ষেত্রে এই উভয় শ্রেণির মাঝে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা গেছে।

আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং মানবীয় মনস্তত্ত্ব, দীনি প্রভাব ও চেতনা অধ্যয়ন ও এসবের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী একজন মানুষ। ফলে হুট করে মানুষের কথার ওপর ভিত্তি করে ব্যাপারটাকে মূল্যায়ন করা সমীচীন মনে করিনি। প্রয়োজন বোধ করলাম, সেই এলাকার কিংবা তার আশপাশের একাধিক হৃদয়বান, পরহেযগার ও সতর্ক মানুষ থেকে বিষয়টি সত্যায়ন করে নিতে হবে।

মহান আল্লাহ তার ব্যবস্থাও একটা করে দিলেন। ১৯৯৩ সালের ১১ নভেম্বর খানিক বিশ্রাম এবং কিছু রচনার কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বোম্বাই অন্ধ্রপ্রদেশ ট্রান্সপোর্টের মালিক বন্ধুবর জনাব গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব

---

১. *উজবেকিস্তানের এই সফর ও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত জানতে মৌলভী রাবে নদবির 'সমরকন্দ ও বোখারা কী বাযিযাফত' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।*

(ওরফে মুহাম্মাদ ভাই)-এর বাড়ির উদ্দেশে বোম্বাই সফর করলাম এবং ওখানে দুই সপ্তাহ অবস্থান করলাম। এ-সময়ে আওরঙ্গবাদ, পুনা ও আশপাশের এলাকাগুলো থেকে একাধিক আলেমে দীন ও আস্থাভাজন বন্ধু-সুহৃদ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাদের থেকে আমি এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে আমার এমন দুজন আস্থাভাজন বন্ধুর দুটি লিখিত রিপোর্ট পেয়ে গেলাম, যাদের ব্যাপারে ভুল বর্ণনা, বাড়াবাড়ি ও ধর্মীয় বিরোধের সূত্রে সীমালঙ্ঘনমূলক কথা বলবে এমন কোনো সন্দেহ করা যায় না।

এসব রিপোর্ট থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়ে গেল, ভূমিকম্পটা খুবই শক্তিশালী ছিল। কালারিতে একটা ঘরও; এমনকি একটা ঘরের ছাদ-দেওয়ালও অক্ষত থাকেনি। কিন্তু তারই আশপাশের মসজিদগুলো যেমনটা তেমনই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকের ওপর রাখা কুরআনের কপিগুলো যেভাবে ছিল, সেভাবেই আপন জায়গায় নিরাপদ রয়েছে। অথচ, তারই সন্নিকটে একটা মন্দিরের শক্ত ইমারত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। একই রোডে একটি ব্যাংকের আরসিসির ইমারতটিও পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে শুধু এই এলাকাটা-ই নয়; বরং এরকম ৫২টা জনপদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য হিসাবমতে এই ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৭৭ হাজারেরও বেশি। তাদের মাঝে মুসলমানের সর্বমোট সংখ্যা ১০৮০।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে আরও জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ রাজ্যে যখন পুলিশি এ্যাকশন হয়, তখন এই অঞ্চলটিতে সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালানো হয়, সংখ্যালঘু লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং তাদের জমিজমা ও ভিটেমাটি দখল করে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রলংকর এই ভূমিকম্পের পরও এখানকার বহুসংখ্যক মসজিদ যেমনটা তেমনই অক্ষত থাকে। অথচ, মসজিদগুলোর দেওয়াল কাঁচা মাটির তৈরী আর ছাদ টিনের।

এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এই পুরোটা অঞ্চলকে বিজেপির দুর্গ মনে করা হতো। বাবরি মসজিদকে শহীদ করতে (বর্ণনাকারীর ভাষ্যমতে) এখান থেকে প্রায় সাতটা লরি ভরে করসেবক গিয়েছিল এবং রামমন্দিরের জন্য সোনার ইটও এখান থেকেই পাঠানো হয়েছিল। ওই করসেবকদের যাওয়ার আগে এবং ফেরার পরে তাদের বিপুল সংবর্ধনা জানানো

হয়েছিল। ভূমিকম্পে একশোরও বেশি গ্রাম কবলিত হয়। কোনো-কোনো হিংস্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে এলে এখানকার কোনোমতে বেঁচে-যাওয়া লোকগুলো অশ্লীল ভাষায় গালগালের মাধ্যমে তাদের বরণ করে। অনেকে কারও-কারও জামার কলার ধরে ফেলে। কলারি গ্রামের একমাত্র মসজিদটি অলৌকিকভাবে নিরাপদ থাকে। ভূমিকম্পের প্রথম দিন শিবসেনা ও পুলিশের লোকেরা লাশগুলোর শরীর থেকে অলংকার লুণ্ঠনের খুবই তৎপরতা দেখিয়েছিল এবং উভয় পক্ষে সংঘাত-সংঘর্ষেরও ঘটনা ঘটেছিল। ত্রাণসামগ্রী বণ্টনেও সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছিল। কলারি মসজিদের চার পাশের বাড়িগুলো মুসলমানদের। এগুলো আজও যেমনটা তেমনই নিরাপদ ও অক্ষত রয়েছে।

লাখনৌয়ে অনুষ্ঠিত 'সর্বভারতীয় ধর্মীয় শিক্ষা কনভেনশন'

ধর্মীয় শিক্ষা কাউন্সিল (প্রতিষ্ঠালগ্ন [১৯৫৯] থেকেই আমি যার সভাপতি)-এর সর্বভারতীয় ধর্মীয় শিক্ষা কনভেনশন লাখনৌয়ে ২ ও ৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রি. অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দেশের নানা উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতির ফলে (যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা) প্রোগ্রামটি সাময়িকের জন্য মুলতবি করে দিতে হলো। কিন্তু পরিস্থিতি ভালো হওয়ার পরিবর্তে দিন-দিন খারাপই হতে থাকল। কাউন্সিলের দায়িত্বশীলদের নানা ব্যস্ততা, কারও-কারও সফরের কর্মসূচি, কোনো-কোনো গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারের শারীরিক অসুস্থতা প্রোগ্রামটিকে এতটা-ই বিলম্বিত করে তুলল যে, ১৯৯২ সালের ২ ও ৩ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৯৯৩ সালের ২ নভেম্বরে করা সম্ভব হলো। শহরে বড় একটি সমাবেশের জন্য 'রাবিন্দারা' মাঠটি নির্বাচন করা হলো। কিন্তু কাছাকাছি সময়ে নগরপ্রশাসনের পক্ষ থেকে এর অনুমতি পাওয়া যায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে কনভেনশনটি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এর জন্য নদওয়াতুল উলামার লাইব্রেরির সুবিশাল ও জাঁকমজকপূর্ণ ভবনের নিচতলাটা বেছে নেওয়া হলো। সকাল ১০টা থেকে কনভেনশন শুরু হলো। সময়ের সংকীর্ণতা, দাওয়াত ও সংবাদ পৌঁছানোর জন্য অপর্যাপ্ত সময় ও উপকরণ সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি এসে

উপস্থিত হন। দূরদূরান্তের অনেক প্রদেশ থেকেও দায়িত্বশীল স্তরের লোকজন এসে কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। হল কানায়-কানায় ভরে যায়।

কুরআন তেলাওয়াতের পর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ জনাব সাইয়িদ হামেদ সাহেব (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়) তাঁর উদ্‌বোধনি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যেটি গভীর মনোযোগসহকারে শোনা হয়। এই নিবন্ধে তিনি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও আধুনিক বিষয়াদির (যেগুলো বর্তমান কালের প্রয়োজনাদি মেটাতে এবং অর্থোপর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে) সংযোগ ঘটাতে পরামর্শ দেন, যার ওপর পরে সমালোচনামূলক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ পর্যালোচনাও হয়। তারপর সেই বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করা হলো, যার শিরোনাম ছিল 'প্রাদেশিক সরকারের (ইউপি) সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলোর জাতীয় একমুখিতার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা'।

এ-বিষয়ের একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন কাউন্সিলের দায়িত্বশীল সদস্য হাবীবুল্লাহ আজমি সাহেব এম.এ, বি.টি আলীগ, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল। বইটি মুদ্রিত হয়ে সেদিন হলের বাইরে স্টলে রাখা ছিল। তরুণ পণ্ডিত ও ডিগ্রি কলেজ, লাখনৌয়ের প্রফেসর ডক্টর মাসউদ হাসান ওছমানি (ধর্মীয় শিক্ষা কাউন্সিলের প্রাক্তন মহাসচিব মাওলানা মাহমুদুল হাসান ওছমানির পুত্র) বইটির সারমর্ম ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো চিহ্নিত করেন। এই গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত সিলেবাসের এমন কিছু নমুনা ও কাটিং উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠ করলে একজন মুসলমানের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়, এই সিলেবাসের বিদ্যমানতায় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধর মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা বাস্তবতা ও যুক্তির পরিপন্থী। গ্রন্থটিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোর দীর্ঘ হিন্দি কাটিং ও ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসনামলের এমনসব ঘৃণ্য; বরং উত্তেজনাকর নমুনা ও ঘটনাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে সেই যুগ ও তার শাসকদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার চোখে দেখার মানসিকতা তৈরি হওয়া একদম স্বাভাবিক। গ্রন্থটিতে আমার সংক্ষিপ্ত; অথচ, স্পষ্ট ও শক্তিশালী একটি ভূমিকাও আছে।

এই গ্রন্থটির পরিচিতি, পর্যালোচনা ও তার কিছু নমুনা পেশ করার পর আমি আমার সভাপতির ভাষণ দিলাম। সেই ভাষণের শেষ কয়েকটা পৃষ্ঠা এখানে তুলে ধরলাম, যাতে সমকালের যারা এই পরিস্থিতির সঙ্গিনতা টের পাচ্ছেন না এবং ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণও এই অস্বাভাবিক, অবিচারমূলক, নির্বুদ্ধিতাসুলভ, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কর্মনীতি অনুমান করতে পারে।

'একজন মুসলমানের জন্য দীনি শিক্ষা ও দীন সম্পর্কে জানাশোনার গুরুত্ব তেমন, যেমন গুরুত্ব একজন মানুষের জন্য পানির। একজন মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে, মুসলমান পরিচয় ধারণ করতে; সর্বোপরি আখেরাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুখ দেখাতে ও মুক্তি লাভ করতে দীনি বোধবিশ্বাস জানা এমনই প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে পানির। কথাটায় এক বিন্দু বাড়াবাড়ি নেই। এটি সেই সম্পর্ক, যার ব্যাপারে হযরত ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর সময় নিশ্চয়তা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র ও নাতিপুতিদের সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? কথাটা তিনি কাদের জিজ্ঞেস করলেন? তাদের করলেন, যারা একজন নবীর সন্তান ছিল। নবীর ছেলে ছিল, নবীর পৌত্র ছিল, নবীর প্রপৌত্র ছিল। যেন তিনি ভাববাচ্যে বলছিলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কবরের মাটিতে শোব না, যতক্ষণ-না তোমরা আমাকে আশ্বস্ত করবে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না।

আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই প্রজন্মকে কীভাবে রক্ষা করা যাবে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায়, সরকারি শিক্ষানীতিতে সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি দীনি শিক্ষার একটি সমান্তরাল ব্যবস্থাও চালানো উচিত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দীনি শিক্ষা

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর দাওয়াত ও প্রচেষ্টায় হাজার-হাজার মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বর্তমান নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন, নির্বাচনি ফলাফল এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নানা ক্ষেত্র তৈরি হওয়া কিংবা তৈরি করে নেওয়ার ফলে এই ধর্মীয়, মানসিক ও সভ্যতাবিষয়ক বংশনিধনের আশঙ্কা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। এ সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারদাবি এবং তার জন্য কাজ করে যাওয়ার পাশাপাশি দীনি মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, মসজিদ ও ঘরে আবশ্যকীয় দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, দীনের প্রাথমিক বিষয়গুলোর শেখানোর উদ্যোগ, উরদু (যার-যার মাতৃভাষা) পড়া ও লেখার যোগ্যতা তৈরি করার মতো প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং এই কাজগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের সুরক্ষার একমাত্র পথ মনে করা।

স্বাধীন মক্তব-মাদরাসা, প্রভাতি ও নৈশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঘরের দীনি শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলামি রীতিনীতি ও আদর্শ-চরিত্রের পাবন্দি, সত্য বলা, সৎ পথে চলা এবং নবীর শিক্ষা ও আদর্শ অনুপাতে জীবন পরিচালনায় শুধু জাতিই উপকৃত হবে তা নয়; বরং এর মাঝে গোটা দেশেরও স্বার্থ নিহিত, যেটি কিনা খুবই দ্রুততার সাথে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মপূজা, অর্থপূজা, সাধারণ বিশৃঙ্খলা ও অপরাধপ্রবণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ইসলামি শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে বিপুলসংখ্যায় এমন একটি শ্রেণি জন্ম নেবে, যারা এতখানি বিত্তপূজারি হবে না, যতখানি হওয়ার ফলে দেশে এই মহামারিটা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কোনো-না-কোনো স্তরে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সামনে জবাবদিহিতার বিশ্বাস সেই পর্যন্ত পৌঁছা থেকে বিরত বিরত রাখবে, যেখানে নিরেট জাগতিক শিক্ষা পৌঁছিয়ে দিয়েছে। রহমতের নবীর উম্মতকে নিজের দেশ, পরিবেশ ও সমাজের জন্য রহমতের উম্মত এবং

তার নিমজ্জমান নৌকাটাকে রক্ষা করতে একজন কতর্বসচেতন, হৃদয়বান ও দক্ষ মাঝির ভূমিকা পালন করতে হবে, যার উপস্থিতিতে এই দেশটির ধ্বংস হওয়া, এই নৌকাটা নিমজ্জিত হওয়া উচিত নয়। সেজন্য এই কাজটি শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠীর নয়; গোটা দেশের স্বার্থে আঞ্জাম পাওয়া দরকার।

সুধীমণ্ডলী! এই শিক্ষাগত সমস্যাটিকে আপনারা নিজেদের ঈমান, প্রত্যয় ও প্রবল উদ্দীপনার সাথে সমাধানের চেষ্টা করুন। আপনারা যদি এই শর্তগুলো পূরণ করে দেন, তা হলে ধরে নেব, মুশকিল আসান হয়ে গেছে, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

পরদিন ৩ নভেম্বরও সভা অব্যাহত থাকে এবং উপস্থিতির সংখ্যা, আগ্রহ-উদ্দীপনাও আগের দিনকার মতোই অক্ষুণ্ন থাকে। কনভেনশন কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়।

নির্বাচন ও তার ফলাফল

সর্বভারতীয় ধর্মীয় শিক্ষা কনভেনশন থেকে অবসর হওয়ার পর আমি কিছু রচনামূলক কাজে ব্যস্ত থাকলাম। সেই কাজগুলোর ধারা লাখনৌ ও রায়বেরেলিতে চলছিল। কিন্তু এরই মধ্যে নির্বাচনি ঝড় গোটা দেশে আছড়ে পড়ল। সেই নির্বাচনের সূত্রে আমার (সাধ্য ও উপকরণের সীমানা পর্যন্ত) এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকল যে, যেসব রাজনৈতিক দল দেশ ও তার অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ, শান্তিময় ও প্রধান দুটি ধর্মগোষ্ঠীকে দেশের গঠন ও উন্নয়নে পরস্পর সহযোগী ও পরমতসহিষ্ণু হিসেবে দেখতে চায়, সাম্প্রদায়িক বিরোধকে ঘৃণা করে, তারা যেন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। দেশটা সে-সময় যেন অগ্নিগিরির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। তদুপরি সামাজিক অবক্ষয়, ঘুসখুরি, বিত্তপূজা ও স্বজনপ্রীতির তখন যৌবনকাল চলছিল।

এ বিষয়ে চোখ বোলালে আমার তিনটি দলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো। সমাজবাদী, বহুজন সমাজ ও জনতা পার্টি। এই তিনটি দলের নেতাদের সাথে আমি আলাদা-আলাদা কথা বলেছি এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্লাটফর্মে কাজ করতে এবং দেশ ও সমাজকে এই সর্ববিদ অধঃপতন

থেকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করেছি, যেমনটা ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ, সাম্রাজ্য ও সমাজে ঘটেছে এবং যে কিনা বিশাল-বিশাল রাজত্ব ও সভ্যতার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। এই প্রচেষ্টায় আমি আন্তরিকতার কোনোই ত্রুটি রাখিনি।

সর্বোপরি আমার বড় একটি লক্ষ্য ছিল, বিজেপি যাতে কোনোভাবেই কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নানা পরিকল্পনা ও ঘোষণার কথা পেছনে আলোচিত হয়েছে, যাদের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হলো মুসলমানদের আদর্শিক, চিন্তানৈতিক, ভাষাগত ও সভ্যতাগতভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। এক কথায় তাদের সর্বাত্মক পরিকল্পনা হলো এই দেশটাকে স্পেনে পরিণত করা।

কিন্তু এই প্রচেষ্টায় আমি সফল হলাম না। দলগুলো নিজেদের আলাদা-আলাদা পতাকার নিচেই নির্বাচনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। আমি চিন্তা করলাম, নির্বাচনের এই প্রবল ঝড়ের মাঝে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের কাজের ব্যস্ততা নিয়ে বসে থাকা কঠিন হবে। আমার নাম ও সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হবে। কাজেই আমাকে এমন একটা জায়গায় চলে যাওয়া দরকার, যেখানে কেউই আমাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না।

এখানে একটা বাস্তবতার প্রকাশ ও স্বীকৃতি প্রদান নৈতিক কর্তব্য মনে করছি যে, পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার ঝোঁক ছিল শ্রী মোলায়েম সিং ইয়াদুজি ও তার দল সমাজবাদীর প্রতি। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন রামজন্মভূমি বিতর্কের একটি দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছিলে এবং নিজের মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' চতুর্থ খণ্ডে নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছি। আমার সেই মূল্যায়নটিকে কোনো এক ভক্ত ছবিসহ প্রকাশ করে মানুষের মাঝে বিতরণ করেছেন এবং তার থেকে আমার ভক্ত-অনুসারীরা আমার ঝোঁক অনুমান করে নিয়েছিল।

এরই ওপর ভিত্তি করে ৯ নভেম্বর শ্রী মোলায়েম সিং চকমন্ডির কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং নিজের প্রতিক্রিয়া ও ধন্যবাদ জানাতে নদওয়া এসেছিলেন। তখনও মনে হচ্ছিল, নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত এবং জয়ের ব্যাপারে তিনি একশো ভাগ নিশ্চিত।

এ-নির্বাচনগুলো হওয়ার কথা ছিল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল ও রাজস্থান এই চারটি প্রদেশে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, লাখনৌ ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো হবে এই নির্বাচনি ভূমিকম্পের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং আমি পক্ষপাতিত্ব থেকে নিরাপদ থাকতে পারব না। ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম, নির্বাচনের এই সময়টায় দূরে কোথাও চলে যাব, যেখানে প্রশান্ত মনে লেখালিখি ও অধ্যয়নের কাজে নিয়োজিত থাকব। অগত্যা ১১ নভেম্বর ১৯৯৩ বোম্বাই চলে গেলাম। ওখানে বন্ধুবর মুহাম্মাদ ভাইয়ের কাছে দু-সপ্তাহ অবস্থান করলাম। সেখানে আমি এই নির্বাচনি যুদ্ধের কবল থেকে নিরাপদ থাকলাম। কারণ, মহারাষ্ট্রে তখন নির্বাচন ছিল না।

২৫ নভেম্বর আমি আপন ঠিকানায় ফিরে এলাম। ২৭ নভেম্বর যখন গণনা শুরু হলো, তখন শ্রী মোলায়েম সিং ইয়াদুজি পুনরায় দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি খুবই প্রশান্ত, হাসিখুশি ও ফুরফুরে ছিলেন। আমার বন্ধুমহল থেকে পরোক্ষভাবে তিনি যে-সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তার জন্য তিনি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। লাখনৌ পৌঁছে একটি সংবাদ শুনে আমি বেশ আনন্দিত হলাম যে, বহুজন সমাজ এবং জনতা পার্টিও তাকে নৈতিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছে এবং কংগ্রেসও বিজেপির বিরুদ্ধে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে তাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

২৯ নভেম্বর ফলাফল ঘোষিত হলো এবং তারই প্রেক্ষিতে ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইয়াদুজি শপথ গ্রহণ করেন এবং ২৭ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলেন। একটা ব্যাপারে খুবই আক্ষেপ হলো যে, তিনি পশ্চিম ইউপিতে সেই বিজয় পাননি, যেমনটা পেয়েছেন পূর্ব ইউপিতে। তার কারণ ছিল, ওখানে জনতা পার্টি থেকে কয়েকজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন এবং বেশ কজন মুসলমান প্রার্থীও নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন, যার ফলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে গেছে এবং ফাঁকে দিয়ে বিপেজির কয়েকজন প্রার্থী জিতে গেছে।

এ হলো লেখাটা তৈরি করার সময় পর্যন্তকার বৃত্তান্ত। সামনে আল্লাহই জানেন, বিজয়ী দলটি নিজেদের নীতির ওপর কতখানি ঠিক থাকে, প্রদেশটির নানা শ্রেণির অধিবাসীদের মাঝে আস্থা ও কল্যাণকামিতার চেতনা সৃষ্টির কাজে কী পরিমাণ নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়,

নাগরিকদের প্রতিটি শ্রেণি ও গোষ্ঠীকে আপন-আপন বৈধ অধিকার দিতে, তাদের ধর্ম, সভ্যতা, শিক্ষা ও ভাষার সুরক্ষায় কী পরিমাণ আয়োজন করে এবং প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করার কাজে কতখানি সফল হয়।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড তার জেপুরের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ডিসেম্বরের ৩ তারিখে (শুক্রবার) সারাদেশে দু'আ দিবস পালন করা হবে, বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলমানদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ৬ ডিসেম্বর নরসীমা রাওজির সঙ্গে বোর্ড সদস্যদের বড়সড় একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষা' করবে, তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের উদ্‌বেগ ও বিষয়টির ওপর তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত করা হবে।

এ-লক্ষ্যে আমি ৫ ডিসেম্বর সহকর্মী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক ও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যকরী পরিষদের সদস্য মুহতারাম মাওলানা বুরহানুদ্দীন সাহেব ও স্নেহাস্পদ আবদুর রায্‌যাককে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি চলে গেলাম। তথ্য পেয়েছি, তিনি ৬ তারিখ সকাল ১০টায় সাক্ষাতের জন্য সময় দিয়েছেন। কিন্তু দিল্লি স্টেশন গিয়ে জানতে পারলাম, এ সময়ে তিনি সাক্ষাৎ দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে সন্ধ্যা সাতটায় সময় দিয়েছেন। অনেক সদস্যের মনে সন্দেহ জেগে গেল, এই সময়টাও তিনি রাখেন কিনা কে বলবে; নাকি শেষ মুহূর্তে এসে এটিও বাতিল করে দেন।

কিন্তু তা হলো না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্সোনাল ল বোর্ডের দায়িত্বশীল ও সদস্যবর্গ – যাদের সংখ্যা ছিল ৫১ জন -- প্রথমে শ্রদ্ধেয় ইবরাহীম শেঠ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে সমবেত হয়। পরে আমরা ওখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওনা হই। আমরা গিয়ে বসার খানিক পর তিন-চারজন সহকর্মীর সঙ্গে (খুবসম্ভব যাদের মাঝে একজন ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার চোহান) বেরিয়ে এলেন। সভাপতি হওয়ার সুবাদে আমি আলোচনার সূত্রপাত করলাম এবং বললাম, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিকভাবে তো আনন্দিত তখন হতাম, যদি আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারতাম যে, সমস্যাটার সমাধানে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদেরকে আজ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে অভিযোগ জানাতে আসতে হলো যে, আজও অবধি এ ব্যাপারে কিছুই হলো না।

ভূমিকাস্বরূপ আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর ইংরেজিতে লেখা সেই পত্রটি পাঠ করে শোনানো হলো, যেখানে পরিষ্কার ভাষায় এই সমস্যার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার অভিযোগ ছিল এবং মুসলমানদের (সর্বসম্মত) দাবির কথা উল্লেখ ছিল। তার উত্তরে নরসীমা রাওজি তার উত্তরে সংক্ষিপ্ত কথা বললেন, যার স্পষ্ট কোনো ফলাফল বের করা সম্ভব নয়। বরং তা ছিল এক ধরনের অপারগা প্রকাশ ও কালক্ষেপণের প্রয়াস। প্রতিনিধিদলের একাধিক সদস্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় কথা বলেছেন এবং মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারপর প্রতিনিধিদল হতাশ মনে ফিরে এল এবং ধরে নিল, প্রধানমন্ত্রী আসলে কিছুই করবেন না।

নরসীমা রাওজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও কার্যকরী পরিষদের একটি সভা রাতে অনুষ্ঠিত হয়। আরেকটি হয় ইবরাহীম সুলায়মান শেঠ সাহেবের বাড়িতে পরদিন বিকালে। মন ভালো না থাকায় এবং শরীরটা ক্লান্ত হওয়ায় প্রথম সভায় আমি উপস্থিত হতে পারিনি। প্রেস কনফারেন্সেও অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নরসীমা রাওজির সঙ্গে আমাদের এই সাক্ষাৎ টিভিতে দেখানো হয়েছিল। রেডিওতেও প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এর থেকে অবসর হয়ে আমি ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ লাখনৌ ফিরে এলাম।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার জন্য দায়ীদের ব্যাপারে কয়েকজন আইনবিদের একটি সাক্ষ্য ও বিবৃতি

বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। এ নিয়ে বিবাদ চলছে। প্রশ্ন আসে এর জন্য দায়ী কে বা কারা। ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর বেশ কজন খ্যাতনামা আইনবিদের একটি বিবৃতি ইংরেজি ও উরদু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবৃতিটি এখানে উল্লেখ করা আমি সমীচীন করছি, যাতে পাঠকবর্গ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন এবং তথ্যটি সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে সাক্ষ্য বা দলিলরূপে কোথাও কাজে লাগানো যায়।

'নতুন দিল্লি ১৩ সেপ্টেম্বর। তিনজন নেতৃস্থানীয় আইনজ্ঞের নেতৃত্বাধীন এক নাগরিক ট্রাইব্যুনাল তার

রায়ে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্ঘপরিবারের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অভিযুক্ত করেছে।

৮২ পৃষ্ঠার এই রায়ে – যা আজ এখানে প্রকাশ করা হলো – জাস্টিজ অচনিয়া রেডি ও জাস্টিজ ডি এস তেওয়াতিয়া বলেছেন, সঙ্ঘপরিবারের নেতাদের একটা সংগঠিত চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত হওয়ার অপরাধে অপরাধী পাওয়া গেছে। রায়ে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অপরাধমূলক উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে এবং সরকার হিসেবে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজের দায়িত্ব পালন থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

বিচারকগণ ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে গত বছর প্রস্তুতকৃত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করেছে। এর মধ্যে বিহারের প্রাক্তন সেক্রেটারি কমলা প্রসাদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশনের গঠনও অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশন গত বছর ডিসেম্বরে সংঘটিত অযোধ্যার ঘটনাবলির আগে, ঘটনা ঘটার সময় ও পরে সরেজমিন তদন্ত ও গণশুনানির পর রিপোর্ট পেশ করেছে।

বিচারকগণ তাদের রায়ে বলেছেন, ৬ ডিসেম্বরের তিন-চার দিন আগ থেকে অযোধ্যায় যা কিছু হচ্ছিল, তার ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং ও ফয়জাবাদের জেলা অফিসারগণ কোনোই ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।'

ট্রাইব্যুনাল মসজিদ ধ্বংসের জন্য লাল কৃষ্ণ আদভানি, মোরলি মোহর জোশি, অশোক সঙ্ঘল, বিজেরাজে সিন্ধিয়া, বিনে কটিয়ার, উমা ভারতি, সাধ্বী রথম্বরা, মিস্টার এইচবি শিশাদরি, মিস্টার মদমহাজন, মিস্টার বিএল শর্মা, মিস্টার মরিশুর সাবে, আচারিয়া ধরিন্দর, মিস্টার কেএস সুদর্শন ও মিস্টার চম্পত রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

রায়ে বলা হয়েছে, উল্লিখিত নেতাগণ ৫ ডিসেম্বর রাতে মিস্টার কটিয়ারের বাসভবনে এবং ৬ ডিসেম্বর রাম কথাকুঞ্জে অবস্থানরত ছিলেন।

বিচারকগণ বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার জেনেবুঝে সম্ভাব্য ফলাফল জানা থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাদের মতে সরকার এই যে নিজেকে দায়মুক্ত প্রমাণিত করার লক্ষ্যে স্বেতপত্রে বলেছে, 'মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটা আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে এবং কাজটা পরিকল্পিত ছিল না।' এটা ভুল কথা। পাশাপাশি উক্ত স্বেতপত্রে একথাটা বলা হয়নি যে, সরকার সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবেলায় কী-কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

রায়ে বলা হয়েছে, ৬ ডিসেম্বরের আগে সুসংগঠিত প্রচারণা, জনমত গঠন, সংগঠিতভাবে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পাদন, অবকাঠামোটি গুঁড়িয়ে দিতে রশি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যথাস্থানে মজুদ থাকা, যে-গতিতে মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে সেখানে মন্দির নির্মাণ এসবই পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে এটা একটা গভীর ও সুসংগঠিত চক্রান্তের ফল ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে বিচারকগণ বলেছেন, 'সে সময়মতো যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অপরাধে অপরাধী।' আইনের ৩৫৫, ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা এবং সপ্তম সিডিউলের দফা ২/এ-এর অধীনে সংঘাত-সহিংসতা প্রতিরোধে প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের অধিকার সংরক্ষিত। তারা বলেছেন, কেন্দ্র তার এসব অধিকার প্রয়োগ করতে পারত এবং এটা তার করা উচিত ছিল। রায়ে বলা হয়েছে, ধর্মকে সরকার, রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা হোক। রায়ে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করারও সুপারিশ করা হয়েছে। তাতে এই দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে যে, এমন রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করা হোক, যেগুলোর নামের সাথে কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর নাম যুক্ত আছে।[১]

একটা গুরুতর বেদনাদায়ক ঘটনা

আমার পুরনো সহকর্মী, একনিষ্ঠ বন্ধু, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মুহতামিম মুহতারাম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব লারি নদবি এমএ (আলীগ) দীর্ঘদিন যাবত রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু এই অসুস্থতা সত্ত্বেও দারুল উলূমের পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করে আসছিলেন। বিকালের আসরে যখন মেহমানখানার সামনে কতগুলো চেয়ারে দারুল উলূমের ওস্তাদদের উল্লেখযোগ্য একটা সংখ্যা, অপরাপর

১. *'কাওমী আওয়ায' লাখনৌ : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩*

আলেম ও কোনো-কোনো সম্মানিত অতিথির সঙ্গে আমার বৈঠক হতো, তখন তিনি নিজের বাসগৃহ থেকে (যেটি দারুল উলূমের সীমানার অভ্যন্তরেই ছিল) খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে স্বয়ং কিংবা কারও সহায়তায় এসে হাজির হতেন আবার আমিও মাঝেমধ্যে বাসায় গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম এবং অবস্থাদির খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতাম। তাঁর পাকস্থলিতে সমস্যা ছিল এবং প্রচণ্ড দুর্বলতার অভিযোগ ছিল। একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েও চিকিৎসা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি এবং দুর্বলতা বেড়েই চলছিল। হাতে তীব্র স্কম্প পক্ষাঘাতের সমস্যা ছিল। খাবার খেতেন নামমাত্র।

কিন্তু আকিস্মকভাবে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন এমন ধারণা কারুর ছিল না। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে আমি দু-তিনটা দিন লাখনৌ অবস্থান করে বেরেলি এসেছিলাম। হঠাৎ নভেম্বরের ২৯ তারিখ সকাল আটটার দিকে স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবির টেলিফোন এল, মুহতামিম সাহেব এন্তেকাল করেছেন এবং মাগরিবের নামাযের পর দাফন।[১] খবরটা আমার মন ও মস্তিষ্কের ওপর বজ্রের মতো আঘাত হানল। সুদীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। পুরনো বন্ধু। একসঙ্গে লেখাপড়া। দারুল উলূমের খেদমত ও ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতা; সর্বোপরি চরিত্র, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও দীনদারি! এমন একজন মানুষের মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ সহ্য করে নেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

খবরটা পাওয়ামাত্র আমি একটা কার নিয়ে দারুল উলূমে এমনভাবে পৌঁছে গেলাম যে, যোহরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করলাম এবং মাওলানার পুত্রের কাছে শোক জ্ঞাপন করলাম। মাগরিবের নামাযের পর জানাযা হলো। জানাযার ইমামদের খেদমতটুকুও এই গুনাহগারের পালন করতে হলো। তারপর ডলিগঞ্জের কবরস্তানে তাঁর চিরনিদ্রায় শায়িত করা হলো, যেখানে আরও বেশকজন নদবি আলেম ও ঘনিষ্ঠজন শায়িত আছেন। যেমন– জামেয়া ওছমানিয়া হায়দরাবাদের দর্শন বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল বারী সাহেব নদবি, দারুল উলূমের সাবেক মুহতামিম মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান সাহেব নদবির পিতা হাফেয মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ আসবাত সাহেব, মাওলানা নুরুল হাসান সাহেব ও মৌলভী আবদুন্নুর সাহেব প্রমুখ। কবরস্তানে গিয়ে আমি তাঁর দাফনে অংশগ্রহণ করি। জানাযার সঙ্গে কবরস্তানে যাওয়া লোকদের

---

১. মৃত্যুর সময় মাওলানার বয়স ছিল ৮৬ বছর। জন্ম ১৯০৭ খ্রি. আর মৃত্যু ১৯৯৩ খ্রি.

এত ভিড় বোধহয় বিগত কয়েক বছরে আমি আর দেখিনি। বিশিষ্ট নাগরিক ও আত্মীয়-বন্ধুদের ছাড়াও দারুল উলূমের সমস্ত শিক্ষক-ছাত্র – যাদের সংখ্যা কমপক্ষে দু-হাজার – জানাযার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব নদবি আমার দরসে হাদীছ ও দারুল উলূমের শেষ স্তরের সহপাঠীদের একজন ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী, গম্ভীর ও লেখাপড়ায় মনোযোগী ছাত্রদের একজন ছিলেন। দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপণের পর তিনি আলীগড় চলে যান এবং ওখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেন। তিনি আলীগড় থাকাবস্থায় আমার ওখানে বেশ কবার যাওয়া হয়েছিল। সে-সময় তিনি এবং আমার ও তাঁর আরেক সাথী মৌলভী মুস্তফা করীম সাহেব নদবিও ওখানে এমএ পড়ছিলেন। দুজনই আফতাব হলে থাকতেন। আফতাব হলের অবৈতনিক ইমামও ছিলেন। ওখানেও তাদের চালচলন, আমল চরিত্র, বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এমনও শুনেছি, আলীগড়ের কোনো-কোনো ছাত্র সে-সময় কম্যুনিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার কথাবার্তা ও আলোচনা-পর্যালোচনার ফলে ওরা সঠিক পথে ফিরে এসেছিল এবং তার বিপরীতে তাদের মাঝে ধার্মিকতার ঝোঁক তৈরি হয়েছিল।

আলীগড় থেকে শিক্ষাসমাপণের পর তিনি লারের অধিবাসী ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রে কানপুরে ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি মন বসাতে পারেননি। ফলে দারুল উলূমের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে নিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি দারুল উলূমের মুহতামিম পদে নিযুক্ত হলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরম আস্থা, সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

একটা কষ্টদায়ক বাস্তবতা ও তার নিরসনে সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা

যেসব পাঠকের ইসলামি রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি আছে, সরাসরি ওখানে সফর করার এবং একটা উল্লেখযোগ্য সময় অবস্থান করার সুযোগ ঘটেছে কিংবা ওখানকার পত্রপত্রিকা, ওসব দেশ থেকে প্রকাশমান লিটারেচারের ওপর তাদের ধারাবাহিক ও গভীর নজর আছে এবং সেইসঙ্গে দেশগুলোর প্রশাসন ও শাসক গোষ্ঠী ও আইন রচনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতিগতি, পদক্ষেপ, ঘোষণাপত্র, পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও প্রত্যয় সম্পর্কে অবগতি লাভের সুযোগ ঘটে, তারা জানেন, এই দেশগুলোর ক্ষমতাসীনরা (এবং একটা সীমানা পর্যন্ত চিন্তাশীল ও যাদের হাতে কোনো-না-কোনো ধরনের

নেতৃত্ব আছে, তাদের মাঝে বেশ কিছু কাল যাবত 'ইসলামি শাসনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা'র প্রতি এক ধরনের ভীতি ও সংবেদনশীলতা বিরাজ করছে, যাকে আমি ভদ্রতার খাতিরে 'সংশয়বাদিতা' না-ও যদি বলি, অন্তত 'চুলকানি' তো বলতে হবে, যার ইংরেজি নাম 'এ্যালার্জি' আর আরবিতে বলে حساسية زائدة ।

এই চিন্তারীতি ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বাড়তে-বাড়তে এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তারা শুধু ইসলামি দণ্ডবিধি চালু করার দাবি, সমাজকে ইসলামে ধাঁচে ঢেলে সাজানো, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম ও আইন রচনাকে শরীয়তের অনুগামী বানানোর আন্দোলন ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ভয় পেয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না; কোথাও-কোথাও সাধারণ দীনদারি, গুরুত্বের সাথে ইসলামি বিধিবিধানের অনুসরণ, পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকে অপছন্দ করা এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি প্রতীককে মর্যাদাদানের দাবিকেও সীমাহীন ভয় পেতে শুরু করেছে। এই বাস্তবতার সাক্ষী কোনো-কোনো আরব দেশের সেইসব ঘোষণা ও পদক্ষেপ, যেগুলোর আলোচনা মুখে আনতে অনুশোচনা ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আছে। সেইসঙ্গে এই ভয়ও তাড়া করে ফিরে যে, তার ফলে হয়তো অমুসলিম দেশগুলো, বিশেষ করে ভারতে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।

এই অস্বাভাবিক ও শরীয়তপরিপন্থী পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান, যার কয়েকটা এখানে উল্লেখ করছি।

১. প্রথমত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, যার ফলে বিশেষ করে ওপরের স্তরগুলোতে শিক্ষা গ্রহণকারী যুবকদের মাঝে (যাদের হাতে ভবিষ্যতে দেশের ক্ষমতা আসবে এবং সাধারণত তারা-ই ক্ষমতার চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়) আপন দীন, শরীয়ত, সভ্যতা ও ইতিহাসের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা জন্ম নেয়, যা কিনা শিক্ষাসিলেবাস, পশ্চিমা লিটারেচার ও প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাদির (যেগুলোকে উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যয়নের অপরিহার্য উপাদান মনে করা হয়) অনিবার্য ফলাফল। এই পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামি প্রাচ্যে চরম ক্ষতিকর; বরং ঘাতকের ভূমিকা পালনের এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না যে, এক পশ্চিমা পণ্ডিত লিখেছেন :

'প্রাচ্য দেশীয় একটা গল্প অসতর্ক বিদেশি শিক্ষা-উপদেষ্টাদের থেকে বেরিয়ে আসা ভুলগুলোর পুরোপুরি চিত্র অঙ্কন করছে। কোনো কালে প্রলয়ংকর একটা বন্য হয়েছিল। বন্যায় একটা বানর আর একটা মাছ ফেঁসে গেল। বানরটা ছিল খুব চালাক ও অভিজ্ঞ। সে একটা গাছে উঠে নিরাপদ একটা জায়গায় গিয়ে বসল। এবার সে নিচের দিকে তাকাতে দেখল, মাছটা উত্তাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। তার মনে খুব দয়া জাগল, আহা! আমি তো গাছে উঠে নিরাপদ হয়ে গেলাম; কিন্তু মাছ বেচারার কী উপায় হবে। ও তো বানের পানিতে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরেই যাবে। বানর সহমর্মিতা ও সেবার মানসিকতা নিয়ে আস্তে-আস্তে নিচে নেমে এল এবং মাছটাকে ধরে পানি থেকে বের করে ডাঙায় তুলে আনল। তারপর কী হলো সে তো সবাই বুঝতেই পারছেন।'[১]

এই দৃষ্টান্ত প্রাচ্যীয় ও ইসলামি দেশগুলোর ওপর পুরোপুরিই খাটে, যারা পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন এবং পশ্চিমা শাসন ও মানদণ্ডকে গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃত বাস্তবতায় পরিণত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, উচ্চতর শিক্ষিত শ্রেণিতে ইসলামের প্রতিটি যুগেই নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি, তার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের বরং হৃদয়গ্রাহী বানানোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ দেশে এবং অধিকাংশ আয়ুষ্কালে পরিকল্পিত, চিন্তাবিদসুলভ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। সংক্ষেপে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণিতে ইসলামের টিকে থাকার যোগ্যতা এবং প্রতিটি যুগে তার প্রয়োজনীয়তার ওপর উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রেণিটির আস্থা বহাল করার সুসংগঠিত, কার্যকর, বয়স, প্রতিভা ও বুঝবার যোগ্যতা অনুসারে সাধারণ কোনো ক্রিয়াশীল আন্দোলন বা দাওয়াত চালানো হয়নি। কিছু ব্যক্তিগত ও ভাসাভাসা চেষ্টা হয়েছেমাত্র এবং কিছু সীমিত ও স্বল্পসংখ্যক লিটারেচার অস্তিত্বে

---

১. *বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ইসলামিয়াত ও মাগরেবিয়াত কী কাশমকাশ*

এসেছে (যার মূল ও গুরুত্ব অস্বীকার যায় না)। কিন্তু তাকে দাওয়াতের একটি সাধারণ ময়দান ও কার্যকর প্রচেষ্টার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য বানানো হয়নি।[১], যার ফলে শাসক শ্রেণি, লেখকদের বড় একটি সংখ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ, প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর প্রভাবশালী মেধাগুলো ইসলামের পুনর্জাগরণ ও তার নেতৃত্বের যোগ্যতা বরং টিকের যোগ্যতার ব্যাপারেও যদিচ হতাশ নন, দ্বিধান্তিত ও সংশয়প্রবণ হয়ে উঠেছে অবশ্যই। আর যখন এই শ্রেণিটা নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রপরিচালার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান এবং ক্ষমতা ও সরকারের অস্তিত্বের একমাত্র গ্যারান্টি মনে করতে শুরু করে। বর্তমানে এই ঝোঁকটা-ই বহুসংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্র এবং কয়েকটি আরব দেশেও কাজ করছে।

৩.. একটি সত্যের স্বীকৃতি, বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ এবং একজন ঐতিহাসিক ও সমালোচকের নিরপেক্ষ পর্যালোচনার দাবিতে এই সত্যটিও ব্যক্ত করতে হচ্ছে যে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া, শাসক, আইন রচনাকারী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণিগুলোর দীনি ও দাওয়াতি আন্দোলনসমূহ এবং ইসলামি জাগরণের দাওয়াত প্রদানকারীদের প্রতি ভীত ও সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে এরও দখল দখল আছে যে, অভিজ্ঞতা সামনে এসেছে, সেসবের অনেকগুলো আন্দোলন, বিশ্বাস ও আমলের সংশোধন, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, শরীয়তের বিধিবিধানকে আঁকড়ে ধরা ও দীনের ওপর আমলের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিন পর তারা রাজনীতির ময়দানে চলে এসেছেন এবং (নেক নিয়তে বটে) সরকার, ক্ষমতা ও দেশের বাগডোর হাতে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। ফলে সরকারগুলোর সঙ্গে তাদের সংঘাত বেঁধে গেল।

---

১. *বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ইসলামিয়াত ও মাগরেবিয়াত কী কাশমকাশ*

এ হলো সেই ভুলের ফল, যার বিবরণ আমি আরবিতে লেখা আমার সফরনামায়ে ইয়ামানে একজন ইয়ামানি আলেমের ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছি :

'পথ দুটি। একটি হলো, ঈমান চেয়ারওয়ালাদের (ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ) কাছে পৌঁছে যাবে এবং তারা দেশ ও সমাজে দীনের প্রতিনিধিত্ব করবে, ইসলামি জীবন তৈরির চেষ্টা চালাবে, শরীয়তের বিধিবিধান চালু করবে এবং দীনদার ও আলেমশ্রেণি তাদের সহায়তা করবে এবং এবং তাদের জন্য দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তারা ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো চেষ্টা চালাবে না। দ্বিতীয় পথটি হলো, ঈমানদারগণ (দীনি দাওয়াত ও ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ) খোদ চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং সরকার ও ক্ষমতার বাড়ডোর তাদের হাতে চলে আসবে।...

'প্রথম পন্থাটি ইতিবাচক ফলাফল সৃষ্টিকারী এবং দীনদার ও ক্ষমতাসীনদের সরাসরি সংঘাত থেকে রক্ষাকারী। দ্বিতীয়টি নানা সমস্যা ও সংকটের জনক। এই পদ্ধতিতে ক্ষমাতসীনদের সঙ্গে শুধু দীনদারদেরই নয়; বরং দীনেরও সংঘাত বেঁধে যাওয়া নিশ্চিত। এর ফলে ক্ষমতাসীনরা ভীত ও অনীহ হয়ে যেতে বাধ্য।'

তিনি বললেন, 'আপনার গ্রন্থাদি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি প্রথম কর্মরীতিকে (ঈমানের ক্ষমতার চেয়ারের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণিটিকে দীনের সাহায্য ও সহায়তা করার ওপর উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা) অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় সমস্যা ও দীনের সঙ্গে সরকারের সংঘাতে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষাকারী মনে করছেন। আর দ্বিতীয় পন্থাটিকে হাজারো সমস্যা এবং এমন একটি সংঘাতময় পরিস্থিতির জনক বলে বিশ্বাস করছেন, যার মাঝে শক্তি ও সময় নষ্ট এবং দীনি ভবিষ্যতকে সংশয়যুক্ত বানানোর উপাদান বিদ্যমান।'

আমি বললাম, হ্যাঁ; আমার অভিমত এমনই। এটিই আমার চিন্তাধারা। ভারতবর্ষের মহান সংস্কারক

মুজাদ্দিদে আলফেছানি হযরত শায়খ আহমাদ সেরহিন্দির (মৃত্যু : ১০৩৪ হিজরি) কর্মরীতিও এটিই ছিল, যিনি ভারতবর্ষের মোগল বংশে বিপ্লব তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং সুলতান জালালুদ্দীন আকবর (মৃত্যু : ১০১৪ হিজরি) থেকে শুরু করে (যিনি ভারতবর্ষকে প্রকাশে ব্রাহ্মণ্যবাদ, হিন্দুসভ্যতা ও ইসলাম পরিপন্থী বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন) সুলতান মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলমগির (মৃত্যু : ১১১৮ হিজরি) পর্যন্ত (যাঁকে অনেকে 'ষষ্ঠ খালীফায়ে রাশেদ' উপাধিতে স্মরণ করেছেন) অব্যাহতভাবে বিপ্লব আসতে থাকে এবং ক্ষমতাসীন প্রতিজন ব্যক্তির পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত তাঁরও চেয়ে ভালো হতে থাকেন। এমনকি ভারতবর্ষ সেই গণধর্মত্যাগের শঙ্কা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, যার ভয় আকবরের পদক্ষেপ, বিধিবিধান ও প্রত্যয়-পরিকল্পনাগুলো থেকে জন্ম নিয়েছিল।[১]

একটি সত্যপকাশ ও আত্মসমালোচনার তাগিদে বলতে হচ্ছে, অনেকগুলো দীনি দাওয়াত ও আন্দোলন এ-ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে এবং সেগুলোর নেতৃবৃন্দের কোনো-কোনো পদক্ষেপ, ঘোষণা এবং তার চেয়ে বেশি তাদের অনুসারী ও মুখপাত্ররা অকারণে কোনো-কোনো ইসলামি সরকারকে নিজেদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। কোনো-কোনো ইসলামি ও আরব দেশে এ বিষয়টি-ই ইসলামি জাগরণ এবং ইসলাম ও দীনের নামে দলগঠন তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল, যার ক্রিয়া ও প্রভাব সেই দেশগুলোতে দিন-দিন বাড়তে থাকে। এমনকি ইসলামি দলকে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং তার সদস্যদের ধরপাকড়ের ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানের নিয়তে আমি বলতে পারি, এ-ক্ষেত্রে সেই দলগুলো ও তাদের নেতৃবৃন্দের ত্রুটি কম এবং সরকারের লোকদের সংশয় বেশি কার্যকর ছিল। কিন্তু ব্যাপার যা-ই হোক, এই অভিজ্ঞতা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করা আবশ্যক এবং তার আলোকে অপ্রয়োজনীয় সংকট

১. *বিস্তারিত জানতে 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' চতুর্থ খণ্ডটি পড়ুন*

সৃষ্টি হওয়া বরং সরকারগুলোকে ইসলামের প্রতিপক্ষ, দীন ও শরীয়তের ন্যূনতম প্রয়োগের বিরোধিতা এবং দাওয়াত ও এসলাহের কাজকে স্বাধীনভাবে আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা অনুচিত।

৪. সরকারগুলোর ইসলামি জাগরণ, দীন ও শরীয়তের প্রচার-প্রসারে প্রতিবন্ধকতা, ইসলামভীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঝোঁক তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নানা প্রচেষ্টারও বিরাট দখল রয়েছে। রুশবিপ্লব ও কম্যুনিজমের পতনের পর সে ইসলামকেই একমাত্র প্রতিপক্ষ এবং নিজের বিশ্বনেতৃত্বের পথে সবচেয়ে বড় ভয় ও বাঁধা মনে করে নিয়েছে এবং অপরাপর প্রচারমাধ্যম ও নানা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পর এবার ইসলামের বিরুদ্ধে মৌলবাদের নামে বিশ্বময় প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য তারা এমনসব ভাষা-পরিভাষা ব্যবহার করছে, যার প্রত্যাশা কারুর ছিল না।

এবার আমি 'মুক্তমনা' ও 'প্রগতিবাদী' ইসলামি দেশগুলোর কর্ণধার ক্ষমতাসীন লোকদের বলতে চাই, 'মৌলবাদ' নামে ইসলামের এই বিরোধিতার ফলাফল খোদ আপনাদের ও আপনাদের দেশ ও সমাজের পক্ষেও খুবই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। আপনারা অনেক বড় একটি শক্তি ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন এবং কতগুলো অকারণ সমস্যা, সংকট ও বিপদের মধ্যে ফেঁসে যাবেন।

১. প্রথম ও মৌলিক বিষয়টি হলো, আপনারা মহান আল্লাহর সেই সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, যেটি দীনের নুসরত ও আল্লাহর বাণীর সমুন্নতির সাথে শর্তযুক্ত। আল্লাহ বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧

'ও হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তা হলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলোকে দৃঢ় করে দেবেন।'[১]

১. সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ৭

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

'আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করে।'[১]

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ

'অনেক ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের ওপর জয়লাভ করেছে আল্লাহর আদেশে।'[২]

আপনাদের দেশ ও শাসনবলয় এই সর্ববৃহৎ শক্তি ও সম্পদটি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, যে সংখ্যার স্বল্পতা ও উপকরণহীনতা সত্ত্বেও পৃথিবীর নকশা বদলে দিয়েছিল। বাজিন্তিনি সাম্রাজ্যের বাতি এক দিকে আর সাসানি রাজত্বের বাতি অপর দিকে নিভিয়ে দিয়েছে। কত-কত রাজ্য, যাদের হাজারো বছরের সভ্যতা, সামরিক অভিজ্ঞতা ও সমরোপকরণ ছিল; তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়ে গেছে। তাদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছে। ওখানকার ভাষা ও সভ্যতাকে ইসলামি ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে এবং তারপর শত-শত বছর পর্যন্ত তাদের ওপর শাসন চালিয়েছে এবং আজও বহু দেশের ওপর শাসন চালাচ্ছে। সেটি হলো ঈমানের সম্পদ, শাহাদাতের স্পৃহা, জিহাদের জযবা ও দীনি মর্যাদাবোধ, যার উৎস ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর ওপর বিশ্বাস, আখেরাতের ওপর ঈমান ও জান্নাতের আগ্রহ। নিচের আয়াতটিতে যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে :

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

'শত্রুর সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও, তা হলে তারাও তো কষ্ট পায় যেমন তোমরা কষ্ট পাও। অথচ, তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর

১. *সূরা হজ : আয়াত ৪০*
২. *সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯*

আশা রাখ, যার আশা তারা রাখে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১]

আর তাতে এমন একটা শূন্যতা তৈরি হয়ে যাবে, যা কোনো কিছুতে পূর্ণ করতে পারবে না। আপনারা এমন একটি ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবেন, কোনো প্রতিরক্ষাশক্তি, আধুনিক কোনো অস্ত্র এবং বড়-বড় রাষ্ট্রগুলোর পৃষ্ঠপোষকতাও তার প্রতিকার করতে পারবে না। এ এমন একটা ক্ষতি, যার বড় আর কোনো ক্ষতি নেই।

২. এই ধর্মহীনতার ঝোঁক, দীন ও দীনদারদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা; বরং বিদ্বেষপরায়ণতা, আপন দেশ ও জাতির সামনে (ওমর ইবনে আবদুল আযীয, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ও আওরঙ্গজেবের মতো না হোক) একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান, শরীয়তের অনুসারী শাসক এবং দীন ও দীনদারদের মূল্যায়নকারী হিসেবে না আসার কারণে তারা আস্থা ও আন্তরিকতার, আবেগ ও চেতনার সেই উপকারিতা ও শক্তি অর্জন করতে পারছে না, যেটি এ জাতীয় শাসকদের অর্জিত হয় এবং যার ফলে তারা বড়-বড় সমস্যাকে কাবু করে ফেলেন এবং তাদের জন্য অবলীলায় জীবন দিয়ে দেন।

৩. আল্লাহ্ বলছেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ অবশ্যই (সৃষ্টির অন্তরে) তাদের ভালোবাসা তৈরি করে দেবেন।'[২]

তাদের বিপরীতের দেশে নানা ষড়যন্ত্র হবে। তাদের ব্যর্থ করতে গোপন পরিকল্পনা প্রস্তুত হবে। তাদের শক্তির বৃহৎ অংশ ও সময় ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধবাদীদের সন্ধান খুঁজে বের করা, তাদের আটক ও দেশান্তর করার কাজে ব্যয় হবে।

এখন আমাদের জাগ্রতমস্তিষ্ক ও বাস্তববাদী শাসকমণ্ডলী, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ এবং দেশ ও সমাজের ভাগ্যনির্ধারণকারীদের চিন্তা করতে হবে,

---

১. *সূরা নিসা : আয়াত ১০৪*

২. *সূরা মারয়াম : আয়াত ৯৬*

বিপরীতমুখী এই দুটি পথের মধ্য থেকে কোনটি বেশি উপকারী হবে। সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, ঈমান, ইসলামি মর্যাদাবোধ, ইসলামি আইনের প্রতিষ্ঠা, নতুন প্রজন্মকে ইসলামি চিন্তাধারা ও আদর্শ-চরিত্র অনুসারে গড়ে তোলার কাজ? নাকি তার বিপরীতে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, নিঃশর্ত মুক্তমনা, প্রগতিবাদ, পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং বড় কোনো শক্তি ও দেশের তল্পিবহন?

এ হলো কতগুলো বাস্তবতা, যেগুলো ইসলামি দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়ক, ইসলামি শিক্ষা ও চিন্তার পতাকাবাহী, প্রচারমাধ্যমগুলোর দায়িত্বশীলবর্গ এবং সাহিত্য ও গবেষণার ঠিকাদারদের পর্যন্ত পৌঁছানো জরুরি। এটি সময়ের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, ইসলামি ও আরব দেশগুলোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেবা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সবচেয়ে বেশি কার্যকর বিভাগ। একে উপেক্ষা করলে, এর গুরুত্ব না বুঝলে ভয় আছে, এই দেশগুলো ধর্মহীনতা ও প্রকাশ্য ধর্মত্যাগের (বিশ্বাসগতভাবে না হলেও চিন্তাগত ও সভ্যতাগত তো বটেই) সীমানায় পৌঁছে যাবে, যার পরম ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশগুলোর ব্যাপারে যার প্রত্যাশা করা যায় না। আমি মহান আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি তাদেরকে এই বাস্তবতাগুলো বুঝবার তাওফীক দান করবেন, ইসলামের মর্যাদা দান করবেন। তারপর তাদেরকে সোজা পথ ও মহান পূর্বসূরীদের আদর্শ নমুনার দিকে আসতে হবে এবং এ যুগে সেই ভূমিকা পালন করবে, যেটি পূর্বসূরীরা পালন করেছেন, এ সময়ে যার তীব্র প্রয়োজন এবং এটি-ই এ কালের সবচেয়ে বড় শূন্যতা। আল্লাহ বলছেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

'আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবার নন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু।'[১]

এই বাস্তবতাগুলো যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোন অবস্থায় ইসলামি ও আরব দেশগুলোর নেতৃবর্গ, লেখক ও চিন্তাবিদগণের কাছে পৌঁছে যাওয়া আবশ্যক।

– ৫ম খণ্ড সমাপ্ত –

১. *সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩*